বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ
আহমেদ মাওলা

লোককবির গানে বঙ্গবন্ধু
কাজল চন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্গবন্ধুর "সোনার বাংলা": জাতীয় সংগীত প্রসঙ্গ
ফজলে এলাহি চৌধুরী

শহীদুল জহিরের কথাসাহিত্যে বঙ্গবন্ধুর ছায়াসন্ধান
মাওলা প্রিন্স (মো. হাবিব-উল-মাওলা)

***লিপিমিত্য* পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ**
মাসুদ রহমান

শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী: বাঙালি জাতির আত্মকথন
মোহসিনা হোসাইন

অসাম্প্রদায়িকতা: বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও বিবৃতি
মো. আল-আমিন

বঙ্গবন্ধুর জবানিতে "শহীদ সাহেব": যুগলবন্দির অনন্য নজির
শামসুজ্জামান মিলকী

পিতার প্রতিশ্রুত ভূমি ও আমার সোনার বাংলা
সোয়াইব আহমেদ (সোয়াইব জিবরান)

সংযুক্তি
রুদ্র-মঙ্গল: গবেষণা-প্রবন্ধ পাঠানোর নিয়মাবলি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪, বাংলাদেশ

রুদ্র-মঙ্গল
মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা ▸ ১৪২৭-১৪২৮ ▸ ২০২০-২০২১ ▸ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

ISSN 2415-4695

রুদ্র-মঙ্গল

মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা

শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক গবেষণাপত্র

১৪২৭-১৪২৮ ▪ ২০২০-২০২১

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪, বাংলাদেশ

ISSN 2415-4695

রুদ্র-মঙ্গল

শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক গবেষণাপত্র
(Double blind peer reviewed)

মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা ॥ ১৪২৭-১৪২৮ ॥ ২০২০-২০২১

সম্পাদক
অধ্যাপক আহমেদুল বারী পিএইচ.ডি.

নির্বাহী সম্পাদক
ড. তৃপ্তি সরকার

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪, বাংলাদেশ

ISSN 2415-4695

রুদ্র-মঙ্গল

(শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক গবেষণাপত্র)
(Double blind peer reviewed)

মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা ॥ ১৪২৭-১৪২৮ ॥ ২০২০-২০২১
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪, বাংলাদেশ
www.jkkniu.edu.bd, jkkniubangla.com

সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদক
অধ্যাপক আহমেদুল বারী পিএইচ.ডি.

নির্বাহী সম্পাদক
ড. তৃপ্তি সরকার

সদস্য
ড. মার্জিয়া আক্তার
জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস
ড. কল্পনা হেনা রুমি

প্রচ্ছদ
রাশেদ সুখন

বর্ণবিন্যাস ও মুদ্রণ
মেঘদূত, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
meghdut.kalidas@gmail.com

মূল্য
৩০০ টাকা [সর্বজন]
২৫০ টাকা (নিজ শিক্ষার্থী]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪-এর পক্ষ থেকে অধ্যাপক আহমেদুল বারী পিএইচ.ডি. কর্তৃক প্রকাশিত।

Rudra-mangala ISSN 2415-4695 (A Yearly Research Journal of Art and Literature). Mujibbarsha Special Issue, 1427-1428 ॥ 2020-2021. Cover Design: Rashed Sukhon. Edited and Published by Professor Ahmedul Bari Ph.D. Department of Bangla Language and Literature. Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, Trishal, Maymensingh-2224, Bangladesh.

সম্পাদকের কথা

সমকালীন রাজনৈতিক ভূগোলে বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বাংলাদেশের স্থপতি তিনি। জাতির পিতাও তিনি। ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তাঁর জন্মশতবর্ষকে তাই "মুজিববর্ষ" ঘোষণা করে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নানা অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে পালনের আয়োজন করা হয়েছে। এই আয়োজনের অংশ হিসাবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে বিভাগ থেকে প্রকাশিত গবেষণাপত্র *রুদ্র-মঙ্গল*-এর নিয়মিত সংখ্যার পাশাপাশি "মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা" নামে একটি সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এ সংখ্যার সবকটি লেখাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মবিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ। প্রারম্ভেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত সংযুক্ত হলো এ প্রত্যাশায় যে, জাতির পিতার পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ রচনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। আশা করি এই সংখ্যাটি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে পাঠকদের চিন্তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে।

গবেষণাপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা নিরন্তর শ্রমসাধ্যকর্ম এবং তা নিয়মিত নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগের দাবি রাখে। অতিমারী করোনার কারণে তা কিছুটা ব্যাহত হলেও সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্যের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। একারণে *রুদ্র-মঙ্গল*-এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই বিভাগীয় সকল সহকর্মী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীকে। এর মধ্যে গবেষণাপত্র *রুদ্র-মঙ্গল*-এর নিয়মিত ৫ম সংখ্যার সম্পাদক প্রফেসর ড. মো. সাহাবউদ্দিন মহোদয়ের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি নিরন্তর পরিশ্রম ও সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া বিভাগীয় সেমিনার সহকারী আসাদুজ্জামান নাইম সম্পাদনা সহযোগী হিসাবে সাধ্যমতো পরিশ্রম করেছেন; তাকেও সবিশেষ ধন্যবাদ।

গবেষণাপত্র *রুদ্র-মঙ্গল* বঙ্গবন্ধু সংখ্যার প্রাবন্ধিক সকলকেও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। তারা এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য সাধ্যমতো পরিশ্রম করে গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। প্রবন্ধগুলোতে প্রকাশিত

মতামত-অভিমত ও বক্তব্যবিষয় প্রবন্ধকারদের নিজস্ব। স্বাভাবিকভাবে এর সকল দায় তাঁদেরই।

এছাড়া দেশের যে ক'জন কৃতবিদ্য অধ্যাপক মূল্যায়নকারী হিসাবে অত্যন্ত নিপুণভাবে তাঁদের মূল্যায়নকর্ম সম্পাদন করে সহযোগিতা করেছেন; তাঁদের প্রতিও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও অভিবাদন। মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে সহযোগিতার জন্য *মেঘদূত* মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে প্রত্যাশা করি মুজিববর্ষ সফল হোক। বাংলাদেশ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হোক।

জয় বাংলা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিরজীবী চিরঞ্জীব।

আহমেদুল বারী পিএইচ.ডি.
সম্পাদক, *রুদ্র-মঙ্গল* বঙ্গবন্ধু সংখ্যা ও
অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(জন্ম: ১৭ মার্চ ১৯২০ ● মৃত্যু: ১৫ আগস্ট ১৯৭৫)

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

১৯২০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। শেখ লুৎফর রহমান ও বেগম সায়রা খাতুনের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান মুজিব। বাবা-মা আদর করে ডাকতেন খোকা বলে। খোকার শৈশবকাল কাটে টুঙ্গিপাড়ায়।

১৯২৭ ৭ বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন। নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। পরে তিনি স্থানীয় মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন।

১৯৩৩ পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের অভিপ্রায়ে ১৩ বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন্নেছার আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাঁরা দুই

কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেলের জনক-জননী।

১৯৩৪ মাদারীপুর হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৪ বছর বয়সে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। এসময় তাঁর পিতা উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতা নিয়ে যান।

১৯৩৬ জটিল চক্ষুরোগ গ্লুকোমায় আক্রান্ত হন। চিকিৎসায় দেরি হলে অন্ধ হয়ে যেতে পারেন চিকিৎসকের এই পরামর্শের পর পুনরায় কলকাতা গমন করেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুই চোখে অপারেশন করা হয় এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

১৯৩৭ চক্ষুরোগের কারণে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকায় লেখাপড়ায় সাময়িক বিরতি ঘটে। যেহেতু সহপাঠীরা পড়ালেখায় এগিয়ে গেছে, সেজন্য তাঁর পিতা তাঁকে পুরাতন স্কুল ছেড়ে নূতন বিদ্যাপীঠ গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করেন। এই কালপর্বেই তিনি স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রত্যহ স্বদেশী সভায় যোগদান করে ক্রমেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভক্তে পরিণত হন।

১৯৩৮ এ-বছর অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও শ্রম মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী গোপালগঞ্জে আসেন। কিশোর মুজিবের 'পরে অর্পণ করা হয়েছে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার ভার। দলমত নির্বিশেষে সকলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি অর্পিত দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেন। এ কে ফজলুল হক পাবলিক হল উদ্বোধনে এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব মিশন স্কুল পরিদর্শনে গেলে, মিশন স্কুলের ছাত্র হিসেবে কিশোর মুজিব তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কিশোর মুজিবকে কাছে টেনে আদর করে এলাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির খোঁজ-খবর করে, নোটবুকে নাম-ঠিকানা লিখে নেন এবং কলকাতা গেলে দেখা করতে বলেন।

মার্চ-এপ্রিল মাসে গোপালগঞ্জের স্থানীয় পর্যায়ের এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিশোর মুজিবের বন্ধু মালেককে কতিপয় লোক হিন্দু মহাসভার সভাপতি সুরেন ব্যানার্জীর বাড়িতে ধরে নিয়ে মারপিট করে আটকে রাখে। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে দলবল নিয়ে বন্ধুকে ছাড়িয়ে আনতে গেলে দু'দলে সংঘাত বাধে; উদ্ভূত পরিস্থিতি মামলা-মোকদ্দমার দিকে গড়ায় এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সাতদিন কারবাসের পর তিনি জামিনে মুক্ত হন। এটিই তাঁর প্রথম জেলজীবন।

১৯৩৯ কলকাতা ভ্রমণে যান। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। গোপালগঞ্জে মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগ গঠনের জন্য সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে প্রস্তাব করেন। এক বছরের জন্য বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র

ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তাঁকে গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়। গোপালগঞ্জ মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন ও সম্পাদক হওয়ার মধ্য দিয়ে সরাসরি রাজনৈতিক সংগঠনে যুক্ত হন।

১৯৪১ প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় শয্যাশায়ী থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং পাস করেন। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মানবিক বিভাগে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। ধর্মতলা স্ট্রিটের বেকার হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হয়। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের একান্ত সান্নিধ্যে রাজনীতিতে গভীরভাবে সক্রিয় হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন।

এবছরেই ফরিদপুর জেলা ছাত্র সংগঠনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর ও অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ। সভাস্থলে কর্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা জারি করলে হুমায়ুন কবীর সাহেবের বাড়িতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ছাত্রনেতা মুজিবের প্রস্তাবানুসারে রাজনৈতিক বিষয় পরিহার করে আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত হয়, "শিক্ষা ও ছাত্রদের কর্তব্য"। অনুষ্ঠানে কবি কাজী নজরুল ইসলাম সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

১৯৪২ ফরিদপুর জেলা ছাত্র সংগঠনে অভ্যন্তরীণ দলাদলি শুরু হলে তিনি ফরিদপুরে আসেন এবং "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হটিয়ে দেশ স্বাধীন করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী আদায় মূল লক্ষ্য"—সকলকে এ-কথা বুঝিয়ে কোন্দল নিরসনে সক্ষম হন।

এ-বছরই প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায়। সম্মেলন উপলক্ষে মিস্টার জিন্নাহ্ আসবেন। ফরিদপুর থেকে ছাত্রদের এক বিশাল কর্মীবাহিনী সংগঠিত করে সম্মেলনে যোগদান করেন।

১৯৪৩ কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদান এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতাস্থ ফরিদপুরবাসীদের একটি সংস্থা "ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনে"র সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এ-বছরেই বাংলার ভাগ্যাকাশে নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যা—"'৪৩-এর মন্বন্তর" নামে পরিচিত। এসময় সোহরাওয়াদী সাহেব অবিভক্ত বঙ্গের "সিভিল সাপ্লাই" মন্ত্রী ছিলেন। এ-সময় ক্ষুধার্ত অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে তিনি উদয়াস্ত কাজ করেন।

১৯৪৬ ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হন। '৪৬-এর কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান এবং ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করেন। ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে কলকাতায় দাঙ্গা প্রতিরোধ তৎপরতায় নির্যাতিত মুসলমানদের পাশে থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং ৪ জানুয়ারি "মুসলিম ছাত্রলীগ" প্রতিষ্ঠা করেন। ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখ পাকিস্তান গণপরিষদে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার আলোচনা চলছে। পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুর ভাষা বাংলা, এই যুক্তিতে কুমিল্লার কংগ্রেস দলীয় সদস্য বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি করেন বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে বলে ঘোষণা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিব এর প্রতিবাদ জানান। খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তিনি মুসলিম লীগের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য কর্মতৎপরতা শুরু করেন। ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন। ২ মার্চ রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবক্রমে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষা নিয়ে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ১১ মার্চ বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে সহকর্মীদের সাথে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় গ্রেফতার হন। তাঁর গ্রেফতারে সারা দেশে ছাত্র সমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে গ্রেফতারকৃত ছাত্র নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তিনি ১৫ মার্চ মুক্তিলাভ করেন। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র-জনতার সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। সভায় পুলিশ হামলা চালায়। পুলিশী হামলার প্রতিবাদে সভা থেকে ১৭ মার্চ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান। ১৯ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১১ সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৪৯ ২১ জানুয়ারি কারাগার থেকে মুক্তি পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ঘোষণা করলে এ ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানান। কর্মচারীদের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিকভাবে জরিমানা করে। তিনি এ অন্যায়

নির্দেশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হন। ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থী শামসুল হককে সমর্থন জানান ও তাঁর পক্ষে কাজ করেন। এপ্রিলে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার কারণে গ্রেফতার হন। ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় এ দলের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুন মাসের শেষের দিকে মুক্তিলাভ করেন। জেল থেকে বেরিয়েই দেশে বিরাজমান প্রকট খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে গ্রেফতার হন এবং পরে মুক্তি পান। অক্টোবরে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় নুরুল আমিনের পদত্যাগ দাবী করেন। এর অব্যবহিত পরে অক্টোবরের শেষে লিয়াকত আলী খানের কাছে একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে যাওয়ার জন্য মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে পুনরায় গ্রেফতার হন।

১৯৫০ ১ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আগমন উপলক্ষে আওয়ামী মুসলিম লীগ ভুখা মিছিল বের করে। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫২ ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। এর প্রতিবাদে বন্দী থাকা অবস্থায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস হিসেবে পালন করার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। ১৪ ফেব্রুয়ারি এ দাবিতে জেলখানায় অনশন শুরু করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর শহীদ হন। জেলখানা থেকে এক বিবৃতিতে ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। একটানা ১৭ দিন অনশন অব্যাহত রাখেন। জেলখানা থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে ঢাকা জেলখানা থেকে ফরিদপুর জেলে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন। একই বছরের ১ অক্টোবর চীনের বিপ্লব বার্ষিকী ও স্বাধীনতা দিবসে ২-১২ অক্টোবর চীনে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু অংশগ্রহণ ও মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেন।

১৯৫৩ ৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। আসন্ন নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী, এ কে ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে ঐক্যের

চেষ্টায় নিজকে নিয়োজিত রাখেন। এই লক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর দলের বিশেষ কাউন্সিল ডাকা হয় এবং এতে ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৫৪ ১০ মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৩টি আসন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গোপালগঞ্জের আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। ১৫ মে প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বনমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। ২৯ মে কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা জারি করে অন্যায়ভাবে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। ৩০ মে করাচি থেকে ঢাকায় ফিরে গ্রেফতার হন। ২৩ ডিসেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৫৫ ৫ জুন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। ২৩ জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। আগস্টের গণপরিষদে তিনি বলেন, আমাদের দাবি এ অঞ্চলের নাম "বাংলা" হবে। বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য দুই-ই রয়েছে। ২১-২৩ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ কাউন্সিলে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার এবং তাঁকে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

১৯৫৬ ৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খসড়া শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। ১৪ জুলাই আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আনেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। ৪ সেপ্টেম্বর তাঁর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করা হয়। চকবাজার এলাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে ৩ জন নিহত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৫৭ সংগঠনকে সুসংগঠিত করবার উদ্দেশ্যে ৩০ মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২৪ জুন থেকে ২৩ জুলাই সরকারি সফরে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে গমন করেন।

১৯৫৮ এপ্রিল মাসে "লিডারশিপ প্রোগ্রামে" যোগ দিতে দু'মাসের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের সামরিক প্রধান মেজর জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা দেন। ১১ অক্টোবর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। একের পর এক মিথ্যা মামলার দায়ে হয়রানি করা হয়। মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেটেই গ্রেফতার করা হয়। ৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৬০ ৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে মুক্তিলাভ করেন। সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতির লক্ষ্যে এসময় তিনি বিশিষ্ট ছাত্রনেতৃবৃন্দকে "স্বাধীন বাংলাদেশ বিপ্লবী পরিষদ" গঠনের নির্দেশ দেন।

১৯৬২ ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ২ জুন চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে ১৮ জুন মুক্তিলাভ করেন। ২৫ জুন জাতীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের 'মৌলিক গণতন্ত্র' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দেন। ৫ জুলাই পল্টনের জনসভায় আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর লাহোর যান, এখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। অক্টোবর মাসে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সারা সারাদেশ সফর করেন।

১৯৬৩ হোসেন শহীদ সোহওরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে অবস্থান কালে তাঁর সঙ্গে পরামর্শের জন্য তিনি লন্ডন গমন করেন। স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের দোসর মোনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা নিষিদ্ধ করলে এর প্রতিবাদে তিনি সোচ্চার হন। ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী নিঃসঙ্গ অবস্থায় বৈরুতে এক হোটেলে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৬৪ ২৫ জানুয়ারি ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। সভায় মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সভায় প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে "সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়। এবছর নারায়ণগঞ্জের আদমজীনগরে শ্রমিকদের মধ্যে পূর্বপরিকল্পিতভাবে বিহারী-বাঙালি দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করা হয়। যা পরবর্তী সময়ে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিকে গড়ায়। এর বিরুদ্ধে তিনি গর্জে ওঠেন। তাঁর নেতৃত্বে "দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি" গঠিত হয়। সভা-সমাবেশ, প্রতিবাদ মিছিল

সংগঠিত করে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও।" দাঙ্গার পর আইয়ুব বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৫ ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মিস ফাতেমা জিন্নাহ'র পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এবছরের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কালপর্বে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তান ছিল অরক্ষিত এবং অসহায়। বিষয়টি তাঁকে চরমভাবে ব্যথিত করে। এ-সময় তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে তিনি কারামুক্ত হন।

১৯৬৬ ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরের বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবী পেশ করেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ। ১৮ থেকে ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কউন্সিল অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন এবং দলীয়ভাবে ৬ দফা দাবী কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হয়। ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ শুরু করেন। এ সময় তাঁকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেফতার করা হয়। এ বছর প্রথম তিন মাসে আটবার গ্রেফতার হন। ৮ মে নারায়ণগঞ্জে পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ৭ জুন তাঁর ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গিতে পুলিশের গুলিতে শ্রমিক মনু মিয়াসহ ১১ জন শ্রমিক শহীদী মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৬৮ জানুয়ারির ৩ তারিখে পাকিস্তান সরকার তাঁকে এক নম্বর আসামী করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য" তথা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৮ জানুয়ারি প্রথম প্রহরে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেট থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে তাঁকে আটক রাখা হয়। "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য" মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে মামলার আসামিদের বিচারকার্য শুরু হয়।

১৯৬৯ ৪ জানুয়ারি ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জাগ্রত ছাত্রসমাজ সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং ৫ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী তুমুল ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়।

পরে ১৪৪ ধারা ও কার্ফ্যু ভঙ্গ, পুলিশ-ইপিআর-এর গুলিবর্ষণ, বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে ২৪ জানুয়ারি পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে এবং সর্বাত্মক গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রেণের বাইরে চলে যাচ্ছে ভেবে আইয়ুব সরকার ১ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানায় এবং তাঁকে প্যারোলে মুক্তিদান করা হবে বলে ঘোষণা দেয়। তিনি প্যারোলে মুক্তিদান প্রত্যাখ্যান করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি সংগ্রামী ছাত্র-জনতার অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে তাঁকে সহ সকল রাজবন্দীকে মুক্তিদানে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে মুক্তমানব শেখ মুজিবের গণসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০ লক্ষাধিক মানুষের গণমহাসমুদ্রে তৎকালীন ডাকসু ভিপি, সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র তোফায়েল আহমেদ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে সভার সভাপতি হিসেবে বাংলার মানুষের নয়নমণি, বাঙালির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ককে বাঙালি জাতির পক্ষে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করেন। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ভাষণে ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের ৬ দফাসহ ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবি উপস্থাপন করে বলেন, "গণঅসন্তোষ নিরসনে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ছাড়া আর কোন বিকল্প নাই।" পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীতিবিদরা বঙ্গবন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করলে ১৩ মার্চ তিনি গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগ করেন এবং ১৪ মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন। ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন। ২৫ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তিন সপ্তাহের সাংগঠনিক সফরে লন্ডন গমন করেন। ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের নামকরণ করেন "বাংলাদেশ"। তিনি বলেন, "আমাদের আবাসভূমির নাম আজ থেকে পূর্ব পাকিস্তান নয়, বাংলাদেশ।" স্বকণ্ঠে স্লোগান দেন, "তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ।"

১৯৭০ ১ এপ্রিল আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪ জুন অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের অষ্টম কাউন্সিলে পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। "ছয় দফা দিবস" পালন উপলক্ষে আয়োজিত ৭ জুন রেসকোর্সের জনসভায় ৬ দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১৭ অক্টোবর আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে "নৌকা" প্রতীক নির্বাচন করেন এবং ঢাকার ধোলাইখালে প্রথম নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু

করেন। ২৮ অক্টোবর জাতির উদ্দেশ্যে বেতার-টিভি ভাষণে ৬ দফা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান। ১২ নভেম্বরের ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় এলাকায় ১০ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটলে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে দুর্গত এলাকায় চলে যান এবং আর্ত-মানবতার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি উপদ্রুত মানুষের ত্রাণের জন্য আহ্বান জানান। ৭ ডিসেম্বর ও ১৭ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি (সংরক্ষিত নারী আসনসহ) আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি (সংরক্ষিত নারী আসনসহ) আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে ভূমিধ্বস বিজয় অর্জন করে।

১৯৭১ ৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি অনুগত থাকার শপথ গ্রহণ করেন। সেদিনের বক্তৃতায় তিনি বলেন, "যদি কেউ ৬ দফার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে বাংলার মানুষ তাকে জ্যান্ত কবর দেবে।" জাতীয় পরিষদ সদস্যদের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২৮ জানুয়ারি জুলফিকার আলি ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। তিনদিন বৈঠকের পর আলোচনা ব্যর্থ হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক ভাষণে ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। একই তারিখে ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। ১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে ভুট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "ভুট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ব বাংলার জনগণ।"

১ মার্চ এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান আকস্মিকভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ২ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হবার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি জানান।

৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।" ঐতিহাসিক এই ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, "রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। ...প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।" বঙ্গবন্ধু সারা দেশে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। শুরু হয় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন।

১৬ মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টো ঢাকায় আসেন। ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া-ভুট্টো গোপনে ঢাকা ত্যাগ করে। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ধানমণ্ডির ৩২ নং স্থিত বঙ্গবন্ধুর বাসভবন, পিলখানা রাইফেল সদর দফতর ও রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার। বঙ্গবন্ধু মধ্যরাতের পর ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে রাত ১২-২৫ মিনিটে গ্রেপ্তার হওয়ার প্রাক্কালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঘোষণায় তিনি বলেন, "এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারীর মোকাবিলা করার জন্যে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।"

হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক যোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বান বেতার যন্ত্র মারফত তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারাদেশে পাঠানো হয়। রাতেই এই বার্তা পেয়ে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচার করা হয় গভীর রাতে। পাকিস্তান বাহিনী ১টা ১০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমণ্ডির ৩২ নং বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে তাঁকে বন্দী অবস্থায় পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত "স্বাধীনতার ঘোষণা" পাঠ করেন। সারা বাংলায় শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ।

১০ এপ্রিল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ গণপরিষদ' এবং এই গণপরিষদ ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক "স্বাধীনতার ঘোষণা" অনুমোদন করে এবং এই ঘোষণার ভিত্তিতে প্রণীত হয় "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র" যা ছিল যুদ্ধকালীন সংবিধান। এরই ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলাকে "মুজিবনগর" নামকরণ করে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঘোষণা করে গঠিত হয় প্রথম বাংলাদেশ সরকার। ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি তথা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। সরকারের পরিচালনায় সফল মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় অর্জিত হয়। তার আগে ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের লায়ালপুরের মিয়ানওয়ালী কারাগারে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার শুরু হয়। তথাকথিত বিচারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানায়। ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। ভারতসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, তিনি বাংলাদেশের স্থপতি।

১৯৭২ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও বিশ্ব জনমতের চাপে পাকিস্তান সরকার ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেদিনই বঙ্গবন্ধু ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডন যাত্রা করেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ অবকাশকালীন ছুটি বাতিল করে তাঁর দপ্তর ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে ছুটে আসেন এবং বঙ্গবন্ধুকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। লন্ডনে দু'দিন যাত্রা বিরতির পর ঢাকা আসার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লিতে যাত্রা বিরতি করেন। বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছেন। ঢাকায় তাঁকে স্মরণকালের অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লাখো জনতার সমাবেশ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এরপর

প্রথমে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং পরদিন ১১ জানুয়ারি "অস্থায়ী সংবিধান আদেশ" জারি করে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ১২ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভারত সফরে যান। ২৪ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাঁর আজীবন সদস্যপদ প্রদান করে। ১ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান। ১২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর শেষ ট্রুপস বাংলাদেশ ত্যাগ করে। ১৭ মার্চ মহান মুক্তিযুদ্ধের পরমমিত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেন। ১৯ মার্চ মুজিব-ইন্দিরা ২৫ বছরের বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ব্যাংক, বীমা, পাট, বস্ত্র, চিনি ও জাহাজ শিল্পসহ ভারী শিল্প জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১০ এপ্রিল "বাংলাদেশ গণপরিষদ"-এর অধিবেশন শুরু হয়। ১১ এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে "খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি" গঠন করেন। ১ মে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি ঘোষণা করেন। ৩০ জুলাই লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর পিত্তকোষে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর লন্ডন থেকে তিনি জেনেভা যান। ১০ অক্টোবর বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। মাত্র ৭ মাসেরও কম সময়ে ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান প্রণীত ও গৃহীত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ৭ মার্চ ১৯৭৩ ঘোষণা করেন। ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।

১৯৭৩ ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৩টি আসনে জয়লাভ করে। ৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে "ত্রি-দলীয় ঐক্যজোট" গঠিত হয়। ৬ সেপ্টেম্বর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু আলজেরিয়া যান। ১৭ অক্টোবর তিনি জাপান সফর করেন।

১৯৭৪ ১৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু সরকার ঢাকা পৌরসভাকে কর্পোরেশনে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মত অনুমোদনে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে এবং ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দেন।

১৯৭৫ ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ঐক্যের সরকার প্রবর্তন এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নূতন সরকারের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ। ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় দল "বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ" তথা "বাকশাল" গঠন করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি এই জাতীয় দলে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাঙালী জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে নূতনভাবে ঢেলে সাজান। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দেন—যার লক্ষ্য ছিল, দুর্নীতি দমন, খেতে-খামারে ও কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন। সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত করবার মানসে ৬ জুন বঙ্গবন্ধু জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চোরাকারবার বন্ধ হয়। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় চলে আসে। নতুন আশা-উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে।

কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৫ আগস্টের ভোরে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, ইতিহাসের মহামানব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিশ্বাসঘাতকের হাতে নিহত হন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল ও শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শিশু শেখ রাসেল, নবপরিণীতা দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা অফিসার কর্নেল জামিলসহ পরিবারের সর্বমোট ১৮ জন সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনকে ঘাতকরা নৃশংসভাবে হত্যা করে।

(বাংলাদেশ গণপরিষদের কার্যবিবরণী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, [সম্পা.] আবুল খায়ের ২০২০: ১১-২০)

ISSN 2415-4695

রুদ্র-মঙ্গল

(শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক গবেষণাপত্র)
(Double blind peer reviewed)

মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা ॥ ১৪২৭-১৪২৮ ॥ ২০২০-২০২১
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪, বাংলাদেশ
www.jkkniu.edu.bd, jkkniubangla.com

প্রবন্ধসূচি

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ ২১-৩৪
আহমেদ মাওলা

লোককবির গানে বঙ্গবন্ধু ৩৫-৫৪
কাজল চন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্গবন্ধুর "সোনার বাংলা": জাতীয় সংগীত প্রসঙ্গ ৫৫-৬৮
ফজলে এলাহি চৌধুরী

শহীদুল জহিরের কথাসাহিত্যে বঙ্গবন্ধুর ছায়াসন্ধান ৬৯-৮৫
মাওলা প্রিন্স (মো. হাবিব-উল-মাওলা)

***লিপিমিতা* পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ** ৮৭-১০২
মাসুদ রহমান

শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*: বাঙালি জাতির আত্মকথন ১০৩-১১৬
মোহসিনা হোসাইন

অসাম্প্রদায়িকতা: বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও বিবৃতি ১১৭-১৪০
মো. আল-আমিন

বঙ্গবন্ধুর জবানিতে "শহীদ সাহেব": যুগলবন্দির অনন্য নজির ১৪১-১৫৫
শামসুজ্জামান মিলকী

পিতার প্রতিশ্রুত ভূমি ও আমার সোনার বাংলা ১৫৭-১৬৫
সোয়াইব আহমেদ (সোয়াইব জিবরান)

সংযুক্তি
***রুদ্র-মঙ্গল*: গবেষণা-প্রবন্ধ পাঠানোর নিয়মাবলি** ১৬৭-১৬৮

রুদ্রমঙ্গল
মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা ॥ ১৪২৭-১৪২৮ ॥ ২০২০-২০২১ ॥ ISSN 2415-4695
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

আহমেদ মাওলা*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) কেবল একজন ব্যক্তি মাত্র নন, মহৎ, বৃহৎ অবিস্মরণীয় এক নেতা। যিনি বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত একটা জাতিকে জাতীয়তাবাদী মহৎ মন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির আলো দেখিয়ে ছিলেন। এনে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার সূর্য। তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করছে জাতি। তাঁকে নিয়ে বহুমাত্রিক মূল্যায়ন হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু-চর্চার একটা নতুন উৎস-মুখ খুলে গেছে। এই গৌরবের অংশ হিসেবে আলোচ্য প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের নানা পর্যায়কে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর নীতি-আদর্শ, আত্মত্যাগের নমুনা উপস্থাপিত হয়েছে। বিশ্লেষিত হয়েছে তাঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের শব্দ-বাক্য-বক্তব্য। এই বিশ্লেষণে আবেগকে সবসময় নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। কেননা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন এক ব্যক্তি, এমন এক নেতা, তাঁকে নিয়ে লিখতে গেলে, ভাবতে গেলে বাঙালিমাত্রই আবেগায়িত না হয়ে পারে না। প্রবন্ধের যুক্তির শৃঙ্খলা মেনেই জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে এটি রচিত। "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অভিন্ন একসত্তা" এটাই তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অবিস্মরণীয় এক নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। তাঁকে ঘিরেই সমস্ত আলোড়ন, বিচ্ছুরণ, ঘটে এই বঙ্গীয় ব-দ্বীপের আকাশে বাতাসে। বাঙালিদের মধ্যে তিনিই সমস্ত ক্ষুদ্র সীমানা অতিক্রম করে হয়ে উঠেছিলেন মহৎ, বৃহৎ "হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি"। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন—

সাতকোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি।

(*রবীন্দ্র-রচনাবলী* তৃতীয় খণ্ড ২০০৪: ৩৩)

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা

কবিগুরুর সেই বাণী মিথ্যা প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "আমি মানুষ" "আমি বাঙালি"। বাঙালির মুখে তিনি তুলে দিয়েছিলেন একটি অমর স্লোগান "জয় বাংলা"। তিনি বাংলা জয় করেছিলেন, বাঙালিদের তিনি এনে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা। মাত্র চুয়ান্ন বছরের (যার মধ্যে ১৩ বছর কেটেছে কারাগারে) একটা জীবনে এরচেয়ে আর বড় অর্জন, মহৎ সাফল্য আর কী হতে পারে? তিনি ঐন্দ্রজালিক যাদুকর, আমাদের তিনি যেমন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তেমনি একটি সরল রেখায় ঐক্যবদ্ধ, সঙ্ঘবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। বাঙালি এরপূর্বে কখনো ঐক্যবদ্ধ ছিল না। বাঙালি ছিল ভীরু, বিচ্ছিন্ন জাতি। সেই বিচ্ছিন্ন জাতিকে জাতীয়তার মহৎ মন্ত্রে উজ্জীবীত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এটা যুগান্তরের সাধনার কাজ, রাজনৈতিক প্রতিভা ও সৃষ্টিশীল চেতনার কাজ। হাজার বছরের দাসত্বের শৃংখল থেকে জাতিকে মুক্ত করার এষণা নিয়ে শেখ মুজিবের মতো একজন মহৎপ্রাণ মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এটা বাঙালির বহু জন্মের সৌভাগ্য। স্বাধীনতা সে তো অলৌকিক ব্যাপার, তা আকাশ থেকে ঝরে পড়া সোনা নয়, তিরিশ লক্ষ শহীদের তাজা প্রাণের রক্তলাল গোলাপের সৌরভ। "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" একেবল কথার কথা নয়, বাংলার মাটি সোনার ভারা, অমৃত ফলের অনন্ত উৎস। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছিলেন। সোনা ফলানোর কাজ ছিল আমাদের, আমরা তা পারিনি। বরং আমরা ব্যর্থ হয়েছি, দেশটিকে বিনষ্ট করেছি। কিছু দুর্বৃত্ত আর গুণ্ডা-মাস্তানদের হাতে দেশকে ছেড়ে দিয়ে, সোনার বাংলাকে আমরা দূষিত-দুর্গন্ধময় করে তুলেছি।

১৯৭২ সালে দেশে ফিরে ১২ জানুয়ারি তিনি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয় মুক্তিযুদ্ধের এক লড়াকু সেনানী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে। বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল বাঙালিকে একটি শাসনতন্ত্র বা সংবিধান উপহার দেওয়া। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধান গৃহিত হয়। ১৪ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে সংবিধান কার্যকর হয়। পৃথিবীর কোনো দেশে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এত স্বল্প সময়ের মধ্যে একটা সংবিধান প্রণয়নের নজির নেই। আমাদের সংবিধানের মূলনীতি চারটি— ১. গণতন্ত্র ২. সমাজতন্ত্র ৩. ধর্মনিরপেক্ষতা ৪. জাতীয়তাবাদ। সমাজতন্ত্র বা সামাজিক ন্যায়ের কথা ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে ছিল। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের দর্শনের উপর ভিত্তি করে। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি নেওয়া হয়েছিল ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের নির্মম অভিজ্ঞতা থেকে। ১৯৪৯ সালে গঠিত "আওয়ামী মুসলিম লীগ" থেকে ১৯৫৫ সালে সাম্প্রদায়িক চেতনা দূর করার জন্য "মুসলিম" শব্দটি বাদ দিয়ে "আওয়ামী লীগ" হওয়া, বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন এবং ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী অন্দোলন, ছেষট্টির ছয়দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি প্রেক্ষাপট থেকে "ধর্মনিরপেক্ষতা" কথাটি আমাদের সংবিধানে যুক্ত হয়। এই ইতিহাসের

সঙ্গে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতার একটা সংশ্লিষ্টতা আছে। সংবিধানে গৃহীত চার মূলনীতি এমনিতে যুক্ত হয়নি। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশের ইতিহাস কল্পনা করা যায় না।

বাঙালির ইতিহাসে দু'জন মানুষের নাম কেউ কোনোদিন মুছতে পারবে না—একজন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রবীন্দ্রনাথ নোবেল বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে বৈশ্বিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন। আর বাঙালি জাতিকে বঙ্গবন্ধু হাজার বছরের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির উল্লাস—স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন।

বাঙালি জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা

জাতীয়তাবাদ কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ইতিহাসের দিকে আমাদের ফিরে তাকাতে হয়। আমাদের জানা আছে যে, আমরা একাধিকবার উপনিবেশিত ছিলাম। আমাদের কোনো আত্মপরিচয় বা আইডেন্টিটি ছিল না। এনলাইটেনমেন্ট, ইংরেজ উপনিবেশায়নের ফলে, ইংরেজি শিক্ষা থেকেই আমরা জাতীয়তাবাদের ধারণা লাভ করেছি।

> জাতীয়তাবাদ আসলে একটা বিশেষ অনুভূতির নাম। তাতে দেশপ্রেম থাকে কিন্তু দেশপ্রম থেকে আবার তা স্বতন্ত্র, কেননা, প্রথমত দেশপ্রেমের তুলনায় জাতীয়তাবাদ অনেক বেশি রাজনৈতিক, দ্বিতীয়ত একটি জাতি কেবল একটি দেশে নয়, বিভিন্ন দেশে বাস করে। জাতীয়তাবাদের পেছনে দু'টি অকাঙ্ক্ষা প্রবল— ১. আত্মপরিচয় ২. সমষ্টিগত ঐক্য। একজন ব্যক্তি পরিচিত হয় তার নিজের ও পরিবারের এবং পেশা দ্বারা, সমষ্টিগত পরিচয়ের প্রশ্নটি আসে তখন, যখন বিদেশির পাশে নিজেকে দাঁড় করাতে হয়। সবমিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়ায় আত্মপরিচয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ। সে নির্ধারণের আবশ্যকতায় ব্যক্তি এটা বোঝে যে সে সমষ্টির অংশ, সমষ্টির গৌরব, গ্লানি, তারও গ্লানি। সে একা নয়, সমষ্টির অংশ,এই আত্মসচেতনতার অভিজ্ঞতা থেকেই ঐক্যবদ্ধ হবার আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। এই আকাঙ্ক্ষায় পারস্পরিক সহানুভূতি জাগায় এবং ওই সহানুভূতি যতটা গভীর হয় জাতীয়তাবাদ ততটাই সুদৃঢ় হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐক্যের ভিতটা কী? ভিতটা হচ্ছে সমস্বার্থবোধ। কাদের স্বার্থ? আত্মপরিচয়ের সূত্রটা কী? উপনিবেশিত ভারতে শাসক ছিল ইংরেজ, বিধর্মী। আমরা কী? আমরা কী ভারতীয়? আমাদের বৈশিষ্ট্য কোথায়, স্বতন্ত্র কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে ধর্মকে পাওয়া গেছে সহজে। শাসকগোষ্ঠি 'ডিভাইডেট এন্ড রুল' জারি করে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব-বৈরীতা ছুঁড়ে দিয়ে তাদের শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে। জাতীয়তাবাদ গঠনে ধর্ম মূখ্য হবার কথা নয়, একটা জাতির মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম থাকতে পারে, থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্ম জাতীয়তা পরিচয়ের সূত্র হয়ে ওঠায় সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দাঙ্গা, দেশভাগ হলো, সেটা ছিল বাঙালির ইতিহাসে কালো অধ্যায়। হিটলার, মুসোলেনি, ইজরাইলি জাতীয়তাবাদী আগ্রাসী, আক্রমণাত্মক, নিষ্ঠুরতা সভ্যতাকে কতটা কলঙ্কিত করেছে, সে ইতিহাস সবার জানা। তবে ভাষার ঐক্য অবশ্যই ধর্মের ঐক্যের তুলনায় অধিক ইহজাগতিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক।
>
> (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ২০০৭: অবতরণিকা)

বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হচ্ছে ভাষা, এই বোধ, চেতনা জাগ্রত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার পর জাতিকে সেদিকে পরিচালিত করেছিলেন তিনি। সেজন্যই যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর (১৯৫৫) "আওয়ামী মুসলীম লীগ" থেকে "মুসলীম" শব্দটি বাদ দিয়ে দলকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা থেকে বের করে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিকশিত করেন। এর মধ্য দিয়ে ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স জোরদার হয়, ঐক্যবদ্ধ হয় জাতি। জাতীয়তাবাদ হচ্ছে দাঁড়াবার নিজস্ব একটা জায়গা, লড়াই করার একটা শক্তি। বিশ্বায়নের এ যুগে যে কোনো আগ্রাসন, শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য শক্তিশালী জাতীয়তাবাদ খুবই প্রয়োজন। ছয়দফা অন্দোলন, ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতিকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর করে তুলেন বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক আঙুল। বাঙালিকে আত্মপরিচয়ে দৃঢ় ও জাতীয়তার সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করে দাঁড়াবার মাটি, বুকে বল, মুখে ভাষা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কৃতজ্ঞ বাঙালি তাই ভালোবেসে বঙ্গবন্ধুকে "জাতির পিতা"র মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু

ভাষা একটি জাতির আইডেন্টিটির প্রধান সূত্র, সংস্কৃতির মূল কাণ্ড। সেই ভাষাকে নিয়েই সর্বপ্রথম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাথে বাঙালিদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসা হয় একুশে ফেব্রুয়ারি রক্তাক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে। গুলি খেয়ে খুলি উড়ে যাওয়ার পর বাঙালি এই বোধে জাগ্রত হয় যে, "আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা"। বাঙালির অস্তিত্বের শেকড় আরব মরুভূমিতে নয়, বাংলার শ্যামল মাটির গভীরেই বাঙালিত্বের শেকড় প্রোথিত। জন্মের ছাপ মুছবে কীসে বাঙালি? চেহারা, কণ্ঠনিঃসৃত ভাষা হয়ে ওঠে তার অস্তিত্ব প্রকাশের প্রধান বাহন। দুঃখ পেলে বাঙালি "মা গো" বলে চিৎকার করে। মাতৃভাষা বাংলাই তার অস্তিত্বের ঘোষক, আত্মপরিচয়ের একমাত্র অবলম্বন। সংবিধানের প্রথম ভাগের ৩নং ক্লজে লেখা আছে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা"। এই স্বীকৃতির পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার ইতিহাস। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু লিখেছেন—

> যদি ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমাদের মুক্তি দেওয়া না হয় তাহা হলে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট করতে শুরু করব। দুইখানা দরখাস্ত দিলাম। আমাকে যখন জেল কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করল অনশন ধর্মঘট না করতে তখন আমি বলেছিলাম, ছাব্বিশ-সাতাশ মাস বিনাবিচারে বন্দি রেখেছেন। কোনো অন্যায়ও করি নাই। ঠিক করেছি জেলের বাইরে যাব, হয় আমি জ্যান্ত অবস্থায় না হয় মৃত অবস্থায় যাব। "Either I will go out the jail or my deadbody will go out." তারা সরকারকে জানিয়ে দিল। ... এদিকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদও গঠন করা হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি দিনও ধার্য করা হয়েছে। ... এবার আমার বিশ্বাস ছিল, জনগণ এগিয়ে আসবে। কারণ জনগণ বুঝতে শুরু করেছে যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করতে পারলে তাদের দাসত্বের শৃংখল আবার পরতে হবে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতি সহ্য করতে পরে না। পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ছাপ্পান্নজন বাংলা ভাষাভাষী হয়েও শুধুমাত্র বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা বাঙালিরা করতে চায় নাই। তারা চেয়েছে

> বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু বাঙালির এই উদারতাটাই অনেকে দুর্বলতা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ১৯৭-১৯৮)

> ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। ... ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেল গেটে এসেছিল। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', আরো অনেক স্লোগান। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২০৩)

> সকাল দশটার দিকে খবর পেলাম, আব্বা এসেছেন। ... আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, "তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে, তোমাকে আমি নিয়ে যাব বাড়িতে।" (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২০৬)

> একদিন সকালে আমি আর রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা' 'আব্বা' ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে "হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।" ... বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, "আমি তো তোমারও আব্বা।" (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২০৯)

এই স্মৃতিকথা পড়লে যে কোনো মানুষের চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। এটা কোনো গল্প নয়, বাস্তব জীবনেরই অংশ।

> বাংলা ভাষা শতকরা ছাপান্নজন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ১০০)

জেলে থেকেও বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলনের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। অনশন করেছেন, দীর্ঘদিন জেলে থাকার ফলে তাঁর পুত্র বাবাকে চিনতে পারছে না, এই আত্মত্যাগের কী কোনো প্রতিদান হয়? রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার নেপথ্যে জাতির জনকের এই অবদানের কী কোনো তুলনা হয়? প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বাঙালি নতুন করে পাকিস্তানি উপনিবেশায়নের শিকার হয়। বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে বাঙালিকে সংস্কৃতি শূন্য, ঐতিহ্য বিচ্যুত, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল। এটা উপনিবেশয়ানের একটি প্রক্রিয়া। উপনিবেশের চরিত্র এমন যে, তারা প্রথমে উপনিবেশিতের ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করে, আঠারো শতকে কলকাতায় ইংরেজেরা যেমন করেছিল, ভারতীয় সভ্যতার চাইতে ইংরেজ সভ্যতা উন্নত, ভালো, ইতিবাচক। এই "উপনিবেশিক মানসিকতা" থেকেই এদেশীয় পুরানো আচার, দৃষ্টি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, এমনকি ভাষা, পাল্টিয়ে ইংরেজ প্রবর্তিত কাঠামোর নয়া জামানার মানুষ হয়ে উঠে, গড়ে ওঠে 'বাবু কালচার'। বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ঘটেছে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-ইংরেজ সাহেবদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আঠারো শতকের শেষার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে। সেটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করে ফোর্ট উইলিয়াম

কলেজের পাঠ্যপুস্তক রচনার ভেতর দিয়ে। তেমনি পাকিস্তানিরাও মুসলমান বাঙালিকে ধর্মের কথা বলে উর্দুকে বাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। উর্দুভাষার সাথে ইসলাম ধর্মের অদৌ কী কোনো সম্পর্ক আছে? নেই। সেই সময় বাঙালির সচেতন অংশ ছাত্র-জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে না পারলে, বঙ্গবন্ধুর মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব না থাকলে হয়তো ইতিহাস অন্যরকম হয়ে যেতো। প্রথম প্রতিরোধ সফলভাবে করতে পেরেছিলেন বলেই বাঙালির জাতীয়তাবাদী জাগরণ সাংস্কৃতিক প্রবাহ নিয়ে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হতে পেরেছিল। সারাদেশের ছাত্র-শিক্ষক, লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাধারণ শ্রমিক-কৃষক সবাই ভাষা আন্দোলনের সূত্রে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং সেটি সম্ভব হয়েছিল বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য নেতৃত্বের ফলে।

> ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু 'পূর্ব পাকিস্তান ভাষা সংগ্রাম পরিষদের' আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে যে-প্রথম হরতাল আহ্বান করেন তার জন্য তাকে হরতালরত অবস্থায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয় হয় প্রায় ৭০ জন সহকর্মীসহ। সে-সময় তিনি কারাগারে ছিলেন পাঁচদিন। ১৯৪৮ সালের প্রথমার্ধে এই পাঁচদিনের কারাবাস দিয়ে তাঁর যে-কারাজীবন শুরু হয় 'বাঙালির অধিকার আদায়ের' জন্য, তা ১৯৫৩ সালের মধ্যেই তিন বছরব্যাপী দীর্ঘ হয়েছিল। এই তিন বছরে তিনি বারবার কারাগারে গেছেন। যেহেতু তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে কখনোই আপোষ বা নমনীয়তা দেখাননি, তাই পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি তাঁকে জেলের কুঠুরিতে রাখাই শ্রেণিস্বার্থের পক্ষে নিরাপদ মনে করছে। যেহেতু জনগণের স্বার্থকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের লক্ষ্য করেছিলেন, সেহেতু তাঁকে কমিনিস্ট আখ্যাও দেওয়া হয়েছিল। (অনুপম সেন *বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন ও অনশ্বর বঙ্গবন্ধু*, দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট ২০২০)

ভাষা আন্দোলন থেকেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু,কারণ একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল বাঙালি জীবনে প্রথম রক্তপাততারপর ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থনে শহীদ আসাদ মতিয়ুরের রক্ত। সেই জন্যই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে তাঁর মুখ থেকে অমোঘ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব, তবু এই বাংলাকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।" গণচীন সফরে গিয়ে সে দেশের সরকার ব্যবস্থা দেখে তিনি *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে লিখেছেন—

> আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২৩৪)

বাংলাদেশের সংবিধানে চার মূলনীতির মধ্যে সমাজতন্ত্র তথা সমস্বার্থ বিষয়টি যুক্ত হয়েছে এভাবে। রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি দৃঢ় অঙ্গিকারাবদ্ধ এক মহান নেতায় পরিণত করেছে। যুগস্রষ্টা, রাজনীতির কবির মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি বাংলাদেশের ইতিহাস ভূমিতে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ: তাৎপর্য বিশ্লেষণ

বাঙালি জাতীয়তাবাদ এদেশের সাধারণ মানুষের নানা গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাগ্রত ঐক্যের এক অভিন্ন জীবমন্ত্র। ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রায় দু'শত বছরের শাসন এবং উনিশ'শ সাতচল্লিশে ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কালোনিপ্রতিম পূর্ব বাংলার দলিত, দমিত, অধিকার বঞ্চিত মানুষের গণভিত্তিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান রাজনৈতিক নেতা ও মুখ্য চরিত্র করে তোলে। দেশের সার্বিক বাস্তবতা, গণমানুষের চেতনা, প্রাগাঢ় আস্থা ও বিশ্বাস, সময়োচিত জনগণের পালস্ বোঝার ক্যারিশম্যাটিক গুণই বঙ্গবন্ধুকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কে আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু কেবল যুগের সৃষ্টি নয়, বাঙালির জাতির পাললিক স্রষ্টাও।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ কেবল মুখনিঃসৃত শব্দরাজি নয়, প্রবঞ্চিত বাঙালি জাতির হাজার বছরের চাপা পড়া কণ্ঠস্বর একসঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে। এই ভাষণ পাকিস্তানি অন্যায়, অপশাসনের বিরুদ্ধে বজ্রবৃষ্টির মতো তীব্রভাবে অভিঘাত করেছে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীকে আর বাঙালিকে দিয়েছে পথের দিশা, যুদ্ধে যাওয়ার অমিত সাহসী প্রেরণা। তাই ৭ই মার্চের ভাষণের বহুমাত্রিক তাৎপর্য রয়েছে। কেউ কেউ এই ভাষণকে আব্রাহাম লিংকনের "গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস" (১৮৬৩) এবং মার্টিন লুথার কিং-এর "আই হ্যাভ এ ড্রিম" (১৯৬৩) ভাষণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই তুলনা যথার্থ বলে আমি মনে করিনা। কারণ, দু'টি ভাষণেরই প্রেক্ষাপট আলাদা। বঙ্গবন্ধু এবং তৎকালীন পূর্ব বাংলার আর্থসামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বঞ্চনাজনিত গণবিস্ফোরণ-উন্মুখ। জন প্রত্যাশার চাপ এবং শত্রুপক্ষের মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার সমূহ আশংকার মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে বিপুল জনতার সামনে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে হয়েছে। সাত কোটি মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তি এবং সংগ্রামী সাহসে আত্ম-শক্তিতে বলিয়ান হয়েই বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দিয়েছিলেন। কোন লিখিত বক্তব্য নয়, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ এবং কাঙ্খিত স্বপ্নকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই অব্যর্থ, যে কোন মারণাস্ত্রের চেয়েও অধিক শক্তিশালী।

ভাষণে উচ্চারিত শব্দমালা ও বাক্যের তাৎপর্য

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল ১৯ মিনিটের। সময়ের পরিমাপে এটি খুব স্বল্প কিন্তু তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে, বাঙালি জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ, অসামান্য এক সুবর্ণমুহূর্ত। জনতার সঙ্গে সরাসরি "সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট" বলা যায়। ১৯ মিনিটের ভাষণে বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করেছেন ১১০৯টি শব্দ, ৮৯টি বাক্য। "ভায়েরা আমার" সম্বোধন করেছে ২ বার। "আমি" শব্দটি ৭ বার, "আমার" শব্দটি ১৪ বার, "সংগ্রাম" শব্দটি ৫ বার, "মুক্তি" শব্দটি ২ বার, "মুক্ত" শব্দটি ১ বার, তারপর উচ্চারণ করেছেন বহুল কাঙ্ক্ষিত শব্দ "স্বাধীনতা" ১ বার এবং সর্বশেষ "জয় বাংলা" বলে ভাষণ সমাপ্ত করেছেন। শব্দ এবং বাক্যের এই পরিসংখ্যান থেকে বহুমাত্রিক তাৎপর্য অনুসন্ধান করা

যায়। আমরা লক্ষ করি "আমি" শব্দটি ব্যবহার করেছেন ১৬ বার এবং "আমাদের" শব্দটি ব্যবহার করেছেন ১১ বার– এটা থেকে বোঝা যায়, তিনি সামষ্টিক চেতনাকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রকৃত নেতা কখনো সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দেয়না। গণভিত্তি ও জনসমর্থনই বঙ্গবন্ধুকে অসীম উচ্চতায় উপনীত করেছে, অন্য কিছু নয়। তিনি "সংগ্রাম" শব্দটি ব্যবহার করেছেন ৫ বার। গাণিতিক হিসেবে ৫ অড বা অবিভাজ্য নাম্বার। চর্যাপদের কাহ্নপার একটি পদ—"কা-আ তরুবর পঞ্চবি ডাল/চঞ্চল চিএ পৈঠা কাল" "এদেহ যেন একটা বৃক্ষ, পাঁচটি তার শাখা/অস্থির চিত্তে সময় প্রবেশ করছে" তৎকালীন পূর্ব বাংলা পাকিস্তান উপনিবেশিত রাষ্ট্রে বাঙালির পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছিল যন্ত্রণাদগ্ধ, শোষণ-নির্যাতনে পর্যুদস্ত। "সংগ্রাম" শব্দটি ৫ বার উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেই পঞ্চ ইন্দ্রীয়ের যন্ত্রণাকে ইঙ্গিত করেছেন, "মুক্ত" শব্দটি ১ বার এবং "মুক্তি" শব্দটি ২ বার ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধু মূলত শোষণ-নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ভাষণের উপান্তের বাক্যটি উল্লেখ করতেই হয়—"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগাম।" অর্থাৎ এই পথেই "স্বাধীনতা"। চূড়ান্ত বিজয়। তাই উচ্চারণ করেছেন "জয় বাংলা"। বাংলার জয় হয়েছে, হানাদার অপশক্তি পরাজিত হয়েছে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের বীজমন্ত্র বলে। অন্য কোনো শক্তিতে নয়, মনোবল, দেহবল, সংঘবদ্ধ শক্তি আর গভীর দেশপ্রেমই ৭ই মার্চের ভাষণের জাদুকরি শক্তি।

বাক্য ও বক্তব্য

নেতৃত্ব, দায়িত্ব, অভিভাবকত্ব কাঁধে নিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছেন—

> 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে'
> 'আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে'
>
> 'ভাইয়েরা আমার'—
> 'আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার দেশের গরিব, দুঃখী, নিরস্ত্র মানুষের মধ্যে, আমার গরিবের উপর'
>
> 'আমার বাংলার মানুষের'
> 'আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে'
> 'আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে'
> 'আমার মানুষ কষ্ট না করে'
> 'আমার লোককে হত্যা করা হয়'

বাক্যগুলোর অন্তর্নিহিত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, বঙ্গবন্ধু "আমার" শব্দটি বাঙালি জাতির পক্ষে অভিভাবকত্বের জায়গায় দাঁড়িয়ে, নেতৃত্বের কর্তব্য থেকে উচ্চারণ করেছেন। "আমার" শব্দটি তখন ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমানকে বোঝাচ্ছেনা। মিন করছেন সামষ্টিক অর্থাৎ পুরো জাতির অর্থে। এটাই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য।

"কী অন্যায় করেছিলাম? কী পেলাম আমরা?" এসব প্রশ্ন করে তিনি বাঙালির প্রবঞ্চনার দিকগুলোকে সামনে এনে বলেছেন—"সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা

না।" এখানে "দাবায়ে" শব্দটি ফরিদপুরের আঞ্চলিক শব্দ হলেও এর অর্থ "দমন" বা "পশ্চাদপদ" করে রাখা। "আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।" অর্থাৎ অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। এরপর সেই অমোঘ বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন—"বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।" ৭ই মার্চে জনগণের প্রবল চাপ এবং প্রত্যাশা ছিল বঙ্গবন্ধু যেন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জনগণের মনের আকাঙ্ক্ষা তাই অত্যন্ত বিচক্ষণতা দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে চারটি দাবির কথা ভাষণে উল্লেখ করেন।

> আমার দাবি মানতে হবে ১. সামরিক আইন মার্শাল'ল উইড্র করতে হবে। ২. সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। ৩. যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। ৪. জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এই দাবিগুলোকে আসলে একজন সুদক্ষ সেনানায়কের রণকৌশল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এসব শর্তের একটা যৌক্তিকতাও রয়েছে। সেটা হচ্ছে বহিঃবিশ্বকে এই ধারণা দেওয়া যে, এই আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়। এই আন্দোলনের গণভিত্তি এবং জনসমর্থন রয়েছে। তাই সেই দিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমবেত প্রায় দশ লক্ষ লোকের জনসভায় বঙ্গবন্ধু সেই অমাঘ বাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন—"এবারের সংগাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এটাই ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা। পাক হানাদার গোষ্ঠী ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে নিরস্ত্র মানুষের উপর হামলা চালিয়ে সেই ৪টি শর্ত ভঙ্গ করেছিল। তাই ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার নতুন ঘোষণা আসে এবং কার্যকর হয়। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্ব তাই অপরিসীম, তাৎপর্য বহুমাত্রিক।

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা

২৫ মার্চ রাতে ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা অভিযান শুরু করলে গ্রেফতার হবার পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়্যারলেস যোগে আওয়ামী লীগের নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে একটি বাণী প্রেরণ করেন। ২৬ মার্চ অপরাহ্ন আড়াইটায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে সংসদ সদস্য ও চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল হান্নান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন। কিন্তু আবদুল হান্নানের এ ঘোষণা পাঁচ মিনিটের বেশি স্থায়ী হতে পারেনি চট্টগ্রাম বেতার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেইদিনই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে বেলার মোহাম্মদের নেতৃত্বে গঠিত হয় "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র" এবং সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে এই কেন্দ্র থেকে আবুল কাশেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে "নাসরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কাবীর" "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি"—সম্প্রচারের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়। ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মেজর

জিয়াউর রহমান বাংলা ও ইংরেজিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। দীর্ঘ নয়মাস সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, অজস্র মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর মধ্য দিয়ে, রক্তাক্ত বেদনা ও অশ্রু নিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ অর্জন করে তার বহুল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজী তার পঁচানব্বই হাজার সৈন্যসহ বাংলাদেশ-ভারত মিত্রবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক লে. জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমপর্ণের মাধ্যমে উদিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে ঠাঁই নিয়েছে বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ

"আদর্শ" শব্দের আভিধানিক অর্থ উন্নত অনুকরণযোগ্য, অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত, নমুনা। "'আদর্শবাদ' অর্থ উচ্চ নীতি দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করার মতবাদ।" (এনামুল হক [সম্পা.] ২০০৫: ১০৩) বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বলতে বোঝায়,তাঁর আচরিত জীবন ও কর্মকে অনুসরণ, নীতি ও নিয়ম, ভাষণ ও বুলিকে ধারণ, লালন ও পরিচর্যা করা। বঙ্গবন্ধু সাধারণ কোনো ব্যক্তি নন। মহৎ, মহান, নিষ্কলুষ, হিমালয় প্রতীম বাংলার শার্দূল। তাঁর সাথে তুলনীয় সমকালে কিংবা মহাকালে দুর্লভ। তাঁর আদর্শকে ধারণ করা খুব সহজ নয়। প্রাণোচ্ছল প্রকৃতির জনবহুল এই দেশের সহজ সরল মানুষের মাঝখান থেকে উঠে এসেছিলেন তিনি। এই মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর ছিল নাড়ির সম্পর্ক। আশৈশব লালিত স্বপ্ন তাঁর জীবনের কাজকে বরাবর মাটি ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ রেখেছিল। তাঁর স্বপ্ন ও কর্ম তাঁর ভাষণ ও সংগঠন, ত্যাগের মহিমা ও সাহসের দৃষ্টান্ত তাঁকে জনগণের মানসপটে ভাস্বর করে রেখেছে। এমন অমোঘ নেতৃত্বের প্রেরণা ও নির্দেশনা জাগ্রত জনতাকে উদ্দীপ্ত করেছে বাংলাদেশের মানচিত্রে। বঙ্গবন্ধুর আত্মবিশ্বাস, সাহস, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং ন্যায়পরায়ণতা ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মৃত্যুতে তাঁর বিনাশ নেই, তিনি অবিনশ্বর। পৃথিবীর ইতিহাসে শেখ মুজিবুর রহমান এক অবিস্মরণীয় দেশনায়ক। উচ্চশিক্ষিত নাগরিক কবি থেকে গ্রাম জনপদের দীন গায়েনের কণ্ঠে ও কলমে পংক্তি ও গীত রচিত হয়ে চলছে।

> তাঁর জন্মশতবর্ষে আমাদের কাছে দু'টি বিষয় প্রধান হয়ে উঠে— ১. গ্রামবাংলার এক গৃহস্থ পরিবারের সন্তান কীভাবে জাতির পিতা হয়ে উঠলেন এবং শতবর্ষ পরেও প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকলেন? ২. যে দেশটির ধাত্রী তিনি, সেই বাংলাদেশ তাঁর অবর্তমানে কোন পথে যাচ্ছে? (আবুল মোমেন দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট ২০২০)

বঙ্গবন্ধুর জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই,ছাত্রজীবন থেকে তিনি ছিলেন, পরোপকারী, মানব দরদী, ন্যায়বোধ ও অধিকার আদায়ে অটল, দৃঢ় সাহসী। তাই স্বভাবতই কর্ম ক্ষেত্র হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন রাজনীতি। রাজনীতিতে যোগ দিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, উপমহাদেশের মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে

তাদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি সময়ের দাবি। সেজন্য তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। স্বপ্নের পাকিস্তান সৃষ্টির পর তরুণ মুজিব দেখলেন, পাকিস্তানের স্রষ্টা মোহাম্মদ আলী জিন্নাসহ মুসলীম লীগের কোনো নেতাই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রাপ্য মর্যাদার কথা ভুলে জোতদার-জমিদার, ব্যবসায়ী, নবাব, এলিটদের লক্ষ্য পূরণে ব্যস্ত। সেজন্যই তিনি ১৯৪৯ সালে "আওয়ামী মুসলীম লীগ" গঠনে উদ্যোগী হন। বায়ান্নর ফেব্রুয়ারির ঘটনায় ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মূল কথা হচ্ছে—

এক. মা-মাটি-মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা।
দুই. শোষণ, নির্যাতন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
তিন. পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি ও অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম।
চার. দুঃখি মানুষের সেবা এবং দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো।
পাঁচ. ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ও সাংগঠনিক দক্ষতা।
ছয়. চরম মুহূর্তেও ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা।
সাত. বুদ্ধি, মেধা সততা ও সাহস ছিল তার নেতৃত্বে প্রধান ভিত্তি।

বঙ্গবন্ধুর যদি স্বাভাবিকভাবে প্রয়াত হতেন, তাহলে তাঁর দান অবদান অন্যভাবে মূল্যায়ন হতো, বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা হতো স্বর্ণের অক্ষরে। তাঁর হত্যাকারী দল তাঁকে হত্যা করে শুধু ব্যক্তি মুজিবকে হত্যা করেনি, একটি জাতির সমস্ত স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-সম্ভাবনাকেও হত্যা করেছে। মুজিবের দিকে নিক্ষিপ্ত ঘৃণিত শত্রুর বুলেটের আওয়াজ থেকে মুহূর্তে জন্ম নিয়েছে লক্ষ মুজিব। আজ তাঁর জন্মশতবর্ষে আমাদের শপথ নেওয়ার দিন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও জাতির প্রতি আঙ্গীকার পূরণে আমরা কখনো লক্ষচ্যুত হবো না।

উপসংহার

পল্লীবাংলার সবুজ প্রকৃতি, শ্যামল নিসর্গের কোলে শেখ মুজিবুর রহমান "খোকা"র জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। তাঁর শৈশব-কৈশোরের বেড়ে ওঠার দিনগুলোর দিকে তাকালে কয়েকটি দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি যেন রাজনীতির কবি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। কবিতার মতো ছন্দে ছন্দে তাঁর জীবন বিকশিত হয়। দেশ-জাতি-জনগণ তাঁর কাব্যের অনন্য বিষয়। বাংলা নামের এই ভূখণ্ডে সকল প্রান্তের সব মানুষের বুকের আশা এবং মুখের হাসি ফোটাতে তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। শেখ হসিনা বাবার স্মৃতিচরণ করতে গিয়ে লিখেছেন—

> আমাদের পূর্বপুরুষরা টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জমি-জমা ক্রয় করে বসতির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রি এনে দালান-বাড়ি তৈরি করেন। যা সমাপ্ত হয় ১৮৫৪ সালে। এখনও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭১ সালে যে-দুটো দালানে বসতি ছিল, পাকিস্তান হানাদার বাহিনি আগুন দিয়ে সে দুটো জ্বালিয়ে দেয়। এই দালানকোঠায় বসবাস শুরু হবার পর ধীরে ধীরে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে অর আশপাশে বসতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এই দালানেরই উত্তর-পূর্ব কোণে টিনের চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আব্দুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমান এই বাড়িতেই সংসার গড়ে তোলেন। আর

> এখানেই জন্ম নেন আমার বাবা। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। আমার বাবার নানা শেখ আব্দুল মজিদ আমার আব্বার আকিকার সময়ে নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার দাদীর দুই কন্যা সন্তানের পর প্রথম পুত্র সন্তান আমার আব্বা। আর তাই আমার দাদীর বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দাদীকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান,'মা সায়রা তোর ছেলের এমন নাম রাখলাম যে-নাম জগৎ জোড়া খ্যাত হবে। (শেখ হাসিনা ২০১৬: ৩৫-৩৬)
>
> আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠো পথের ধুলোবালি মেখে। বর্ষার কাদা পানিতে ভিজে। বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙা কিভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা—এসব ছিল তার আগ্রহের বিষয়। দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার বাবাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামের ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে করে মাঠে ঘাটে ঘুরে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে বেড়াতে তার ভাল লাগত। ছোট্ট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিস দেওয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন, তারা তার কথামতো যা বলতেন তা করতেন। আবার এগুলোর দেখাশোনার ভার দিতেন ছোট বোন হেলেনের উপর। এ পোষা পাখি জীবজন্তুর প্রতি এতটুকু অবহেলা তিনি সইতে পারতে না। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা সরু খাল চলে গেছে, যে-খাল মধুমতি ও বাইগার নদীর সংযোগ রক্ষা করে। এই খালের পাড়েই ছিল বড় কাছারি ঘর আর এই কাছারি ঘরের পাশে মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলভী সাহেবদের থাকার ঘর ছিল। এরা গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিল এবং তাঁদের কাছে আমার বাবা আরবি, বাংলা, ইংরেজি ও অংক শিখতেন।
>
> আমাদের পূর্ব পুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। তখন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে প্রায় সোয়া কিলো মিটার দূর। আমার আব্বা এই স্কুলেই প্রথম লেখপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এরপর আমার দাদী তাঁকে ঐ স্কুলে যেতে দেন নি। তাঁর একরত্তি ছেলে চোখের মনি গোটা বংশের আদরের দুলাল তার এতটুকু কষ্ট যেন সকলেরই কষ্ট। সেই স্কুল থেকে নিয়ে এসে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। গোপালগঞ্জ ছিল আমার দাদার কর্মস্থল।... আমার আব্বার শরীরর ছিল বেশ রোগা। তাই আমার দাদী সবসময় ব্যস্ত থাকতেন কীভাবে তার খোকার শরীর ভালো করা যায়। দাদীর আফসোসের সীমা ছিল না, যে কেন তাঁর খোকা একটু নাদুসনুদুস হয় না। আদর করে দাদা-দাদীও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাই বোন গ্রামবাসির কাছে ছিলেন 'মিয়া ভাই' বলে পরিচিত।... খাবার বেলায় খুব সাধারণ ভাত, মাছের ঝোল, সবজিই তিনি পছন্দ করতেন। খাবার শেষে দুধ-ভাত-কলা ও গুড় খুব পছন্দ করতেন।...একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি ছিলেন। সেই সময়ে আমাদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে আমার মা দাদা-দাদীর কাছে থাতেন। একবার একটা মামলা উপলক্ষে আব্বাকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়। কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে। কিন্তু আব্বাকে কখনো দেখেনি। আমি যখন বারবার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি, আব্বা আব্বা বলে ডাকছি ও শুধু অবাক হয়ে দেখছে।...ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'হাসু আপা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি?' (শেখ হাসিনা ২০১৬: ৩৬-৩৯)

এই স্মৃতি যে কোনো পাঠকের চোখে কান্না বয়ে দেয়। অশ্রুসিক্ত চোখে কেবল প্রশ্ন জাগে, দেশের জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকারেছেন শেখ মুজিবুর রহমান? তাঁর জীবনে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ এবং বাক্যের মধ্যে ছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার স্বপ্নময় বাণী। বাবার স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে শেখ রেহানা লিখেছেন—

> বাবার স্মৃতি বলে কি শেষ করা যায়। বাবা সবাইকে ভালোবাসতেন।
>
> ভাইবোনদের মধ্যে আমি ছিলাম তাঁর খুব কাছের।...তিনি ভোরবেলায় নিয়মিত হাঁটতেন বত্রিশ নম্বর রোডে। আমি তাঁর সাথে অত জোরে জোরে হাঁটতে পারতাম না। কিন্তু গেটে দাঁড়িয়ে থাকতাম। বাড়ির কাছাকাছি এলে আমি দৌড়ে তাঁর কাছে চলে যেতাম।...আবার তাঁর রাত করে ফেরাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারতাম না। রাগ করে বলতাম 'পলিটিক্স করো না কেন?' বাবা বলতেন 'তুই এমন কথা বলিস কেন, আমার কাছে তুইও যা সাড়ে সাত কোটি মানুষও তা!' (শেখ রেহানা ২০১৬: ৪০)

এই একটি মাত্র বাক্যের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম মানব প্রেম, স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার পরিচয় স্পষ্ট। বাংলা-বাঙালিকে এমন করে আর কে ভালোবাসতে পেরেছিলেন? ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই। বঙ্গবন্ধুর পূর্বসূরি নেতাদের মধ্যে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন কৃষকের পক্ষের সংগ্রামী নেতা। জমিদারী প্রথা বিলোপ এবং ঋণ শালিসি বোর্ড গঠন করে তিনি বাংলা কৃষককে মুক্তি দিয়েছিলেন। মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী চাইতেন ধনি-গরীবের বৈষম্য দূর করতে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সংগ্রাম করে গেছেন গণতন্ত্রের জন্য। ধনি পরিবারের মানুষ হয়েও অর্থ-সম্পদের পেছনে না ছুটে তিনি গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করতে গিয়ে অনেক দুঃখকে বরণ করে নিয়েছেন। আইনজীবী হিসেবে তাঁর উপার্জন ভালোই ছিল কিন্তু উপার্জিত অর্থ তিনি গণমানুষের কল্যাণে ব্যয় করে গেছেন। বাংলার মানুষকে স্বাধীনতা দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু জীবনের ১৩টি বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাঠিয়েছেন। বাঙালির জন্য এনে দিয়েছেন হাজা বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন স্বাধীনতা। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, বাংলাদেশ। কবি নির্মলেন্দু গুণের ভাষায়—

> একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
> লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
> ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে
> 'কখন আসবে কবি?'
> এই শিশুপার্ক সেদিন ছিল না,
> এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না
> এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
> অথচ তখন প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেছে যখন গম্ভীর মুখে
> কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
> ... শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
> অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
> তখন পলকে দারুন ঝলকে তরীতে উঠিল জল
> হৃদয় লাগিল দোলা
> জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা
> কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
> গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি
> 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
> এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

> সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের।
> (নির্মলেন্দু গুণ *নির্বাচিতা* ২০১৬)

বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্ব কেবল একটি ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার দেয়া ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে। সারা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে এই ঐতিহাসিক ভাষণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
> আমি তোমাদেরই লোক।
> (*রবীন্দ্র-রচনাবলী* একাদশ খণ্ড ২০০৪: ১৫৫)

রক্ত আর অশ্রু অবিনশ্বর নয়, কিন্তু বাঙালি এই করুণ-কোমল অশ্রুবিন্দু আর রক্তের লাল ফোঁটাকে করেছে অবিনশ্বর। বায়ান্ন আমাদের প্রথম অশ্রুবিন্দু,একাত্তর আমাদের বিশাল এক রক্তের ফোঁটা। রক্ত আর অশ্রু নিয়েই লাল-সবুজের বাংলাদেশ। যার স্থপতি,রূপকার,স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই মহান নেতার প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা। আসুন আমরা জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে যে যেখানে আছি, নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করি,দায়িত্ব পালন করি। গড়ে তুলি স্বপ্নের বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

তথ্যসূত্র

অনুপম সেন (২০২০), *বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন ও অনশ্বর বঙ্গবন্ধু*, প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট, ঢাকা।

আবুল মোমেন (২০২০), প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট, ঢাকা।

নির্মলেন্দু গুণ (২০১৬), স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো, *নির্বাচিতা*, অনন্যা, ঢাকা।

বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৪), *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, *চৈতালী*, 'বঙ্গমাতা' ঐতিহ্য সংস্করণ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৪), *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, *সেঁজুতি*, 'পরিচয়' ঐতিহ্য সংস্করণ, ঢাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১৭), *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা।

শেখ হাসিনা (২০১৬), শেখ মুজিব আমার পিতা, *বঙ্গবন্ধু নানা বর্ণে নানা রেখায়*, (সম্পা. শামসুজ্জামান খান), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শেখ রেহানা (২০১৬), বাবাকে মনে পড়ে, *বঙ্গবন্ধু নানা বর্ণে নানা রেখায়*, (সম্পা. শামসুজ্জামান খান), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০০৭), *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ঢাকা।

রুদ্রমঙ্গল
মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা ॥ ১৪২৭-১৪২৮ ॥ ২০২০-২০২১ ॥ ISSN 2415-4695
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

লোককবির গানে বঙ্গবন্ধু

কাজল চন্দ্র রায়*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম, একটি জাতিগোষ্ঠী, একটি দেশ, একটি মানচিত্র। তাঁকে নিয়ে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী গীত ও সাহিত্য রচনা করবেন—এটাই স্বাভাবিক। তিনি যখন আমাদের আন্দোলনের প্রতিকৃত কিম্বা অসাম্প্রদায়িক চেতনার জ্বলন্ত উদাহরণ তখন তাঁকে নিয়ে একটা শিল্প দাঁড়িয়ে যায়। মুজিব জাগিয়ে তুলেছিলেন বাঙালির বিবেককে, ফলে মাঠে ঘাটে কৃষকের ফলা থেকে, নৌকার মাঝির কণ্ঠ থেকে উঠে এসেছিল গান।

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন বাঙালি জাতির জীবনে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। যে জাতি পৃথিবীর বুকে একটি স্বতন্ত্র মানচিত্র পেয়েছে, যে জাতি আন্দোলন সংগ্রামে একটি ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে, যে জাতি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন স্বনির্ভর জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে—সে জাতির ভাগ্যলিখনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানই মুখ্য। সেজন্যেই তিনি আমাদের জাতির পিতা। সারাটা জীবন তিনি উৎসর্গ করে গেছেন এই জাতির কল্যাণে। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের একটি দিনও আয়েস করে কাটাতে পারেননি। কাটাতে পারেননি স্ত্রী-পুত্র-স্বজনের সঙ্গে। জেল-জুলুম আর নির্যাতনের মধ্যে তাঁর সময় কেটেছে। তবুও তিনি একদিনের তরে আত্মবিক্রি করেননি, প্রলোভনে পড়েননি—এমনকি নির্যাতনের ভয়ে আপোষ করেননি।

বাঙালির এই মহানায়ককে নিয়ে লোককবির রচনা জেগে উঠবে বা গ্রামীণ জনপদ জাগিয়ে তুলবে তা আর বিচিত্র কী! তাঁর বিস্তারিত কর্মযজ্ঞ নিয়ে রচিত হয়েছে লোককবিগণের বহু গান। এর মাত্র গোটা কয়েক গান নিয়ে এই প্রতিপাদ্য রচনা। মনে করি, এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা প্রয়োজন।

বঙ্গবন্ধু আমাদের চেতনার বাতিঘর।

স্বপ্নের পথে হেঁটে হেঁটে তুমি
কাণ্ডারী হলে জনতার
কোন লোকগাঁথা নয় কোন কবিতাও নয়
জননেতা তুমি শাশ্বত বাংলার ॥

* সাম্মানিক শিক্ষক, রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরা, ঢাকা

বাঙালি জাতি হিসেবে আজ এক অনন্য মাত্রায় আসীন। পৃথিবীর সকল প্রান্তে বাংলা নামের এই দেশটির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯১৩ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল বিজয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির প্রথম পরিচয় ঘটে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগ ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বতন্ত্রতা দান করে এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষাকে আত্মমর্যাদায় বলীয়ান করে তুলে। যে মানুষটির হাত ধরে পৃথিবীর বুকে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের স্বতন্ত্র মানচিত্র অঙ্কিত হলো তিনি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। মধুমতী নদীর কোল ঘেঁষে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রাম। এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ বোরহানউদ্দিন নামের এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়—

> শেখ বংশ কেমন করে বিরাট সম্পদের মালিক থেকে আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে গিয়েছিল তার কিছু কিছু ঘটনা বাড়ির মুরুব্বিদের কাছ থেকে এবং আমাদের দেশের চারণ কবিদের গান থেকে জেনেছি। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ০৩)

এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, যে গাঁথা চারণ কবিদের গান হয়ে ওঠে সে গাঁথার একটি ঐতিহাসিক কিম্বা সামাজিক মূল্য আছে—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জীবনেরও নানা দিক সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। সুদীর্ঘ সময়ের পারিবারিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বলয়ে বেড়ে ওঠা শেখ বংশে 'শেখ মুজিবুর রহমান'-এর জন্ম কোন অনভিপ্রেত ঘটনা নয়। বার বার সংগীত শ্রবণে তিনি তাঁর রাজনৈতিক চর্চিত জীবনে পেয়েছিলেন প্রশান্তি। এই প্রশান্তির হাতছানিতে বার বার তিনি ছুটে গিয়েছেন ৬১/১ পাটুয়াটুলী নিউ জেনারেল গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডের দোকানে। আমরা জানতে পারি, তিনি তাঁর প্রিয় বহু গানের রেকর্ড সেখান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। রবীন্দ্র-রজনী-অতুলসহ বহু রচয়িতার গান। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে জানতে পারি, সংগীত তাঁর কাছে কতটা প্রিয় ছিল। তার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ তুলে ধরা যাক। এডভোকেট সাহেবদের বেষ্টিত অবস্থায় করাচি যাবার পথে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী গাড়ি চালচ্ছিলেন। পাশে বসা শেখ মুজিব। এডভোকেট সাহেবরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শেখ মুজিবকে প্রশ্ন করছিলেন,

> বাংলা ভাষাকে কেন আমরা রাষ্ট্রভাষা করতে চাই? হিন্দুরা এই আন্দোলন করছে কি না? মুজিব তাঁদের বুঝাতে চেষ্টা করলেন। মুজিবের কাছে তাঁরা নজরুল ইসলামের কবিতা শুনতে চাইলো। রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের কিছু কিছু কবিতা শেখ মুজিবের মুখস্থ ছিল। নজরুলের 'কে বলে তোমায় ডাকাত বন্ধু', 'নারী', 'সাম্য' কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের কবিতাও দু'একটার কয়েক লাইন শুনালাম। শহীদ সাহেব তাঁদের ইংরেজি করে বুঝিয়ে দিলেন। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২১৭)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থেকে ফিরবার পথে শেখ মুজিব গান নৌকায় বসে শিল্পী আব্বাসউদ্দিনের ভাটিয়ালি গান শুনছিলেন এবং স্বগোতোক্তি করছিলেন—

> নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে। ...আমি আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'মুজিব, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। আজ যে গানকে তুমি ভালবাস, এর মাধুর্য ও মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু হোক, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে।' (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ১১১)

বঙ্গবন্ধু সঙ্গীতকে খুব ভালবাসতেন। যখন যেখানে যে পরিস্থিতিতে থাকতেন না কেন সঙ্গীতের রসাস্বাদনে তিনি উদগ্রীব থাকতেন। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লিতে সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলিম লীগ পন্থী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কনভেনশন ডেকেছেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। শেখ মুজিবসহ দশ-পনেরোজন ছাত্রকর্মীও এই সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলন চলাকালে একদিন তাঁরা খাজা বাবার মাজার জেয়ারত করতে যান।

> আমরা দরগায় রওয়ানা করলাম, পৌঁছে দেখি এলাহি কাণ্ড! শত শত লোক আসে আর যায়। সেজদা দিয়ে পড়ে আছে অনেকজন লোক। চিৎকার দিয়ে কাঁদছে, কারো কারো বা দুঃখে দু চক্ষু বেয়ে পানি পড়ছে। সকলের মুখে একই কথা, "খাজা বাবা দেখা দে"। খাজা বাবার দরগার পাশে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান হচ্ছে। যদিও বুঝতাম না ভালো করে, তবুও মনে হয় আরও শুনি। আমরা দরগা জিয়ারত করলাম। বাইরে এসে গানের আসরে বসলাম। অনেকক্ষণ গান শুনলাম, যাকে আমরা "কাওয়ালি" বলি। কিছু কিছু টাকা আমরা সকলে কাওয়ালকে দিলাম। ইচ্ছা হয় না উঠে আসি। ...সেলিম চিশতী ছিলেন বাদশা আকবরের পীর। আজমীরের খাজা বাবার দরগায় দেখলাম গান-বাজনা চলছে সমানে, এখানেও দেখলাম সেই একই অবস্থা। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৫৫-৬০)

এই থেকে বুঝে নেওয়া যায়, গানের প্রতি তাঁর কতটা অনুরাগ ছিল। কতটা গভীর থেকে গানকে বুঝে নেবার চেষ্টা করতেন। দেশ, রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতির পাশাপাশি সংস্কৃতি তথা সংগীতকে বুঝে নেবার ক্ষমতা সবরাজনীতিবিদের না থাকলেও শেখ মুজিব ছিলেন তার ব্যতিক্রম। উপরের ক'টি উদ্ধৃতাংশ থেকে তাঁর সংস্কৃতি ভাবনা ও চর্চা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা মেলে। লেখক গোলাম কুদ্দুছ লিখেছেন—

> রাজনীতির কবি নামে খ্যাত শেখ মুজিব ব্যক্তি জীবনে শিল্প-সংস্কৃতির একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ, চর্চা ও জাগরণ ব্যতীত প্রকৃত রাজনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। তিনি সংস্কৃতিকে রাজনীতির সহোদর হিসেবে বিবেচনা করতেন। সে কারণেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব ও অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করা যায়। (গোলাম কুদ্দুছ ২০২০: ১১-১২)

আমার আলোচনার প্রতিপাদ্য বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গানের ভাণ্ডার নিয়ে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও দিক নির্দেশনায় বাংলা নামের এই দেশটা আজ পৃথিবীর বুকে স্বাধীন দেশ হিসেবে

জায়গা করে নিয়েছে। তাঁকে ঘিরে বাংলার কবি সাহিত্যিক ও বাউলদের ভাবাবেগ অতি তীব্র। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে অসংখ্য গান রচিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ যেমন ছুঁয়েছে কবি-সাহিত্যিকদের প্রাণ তেমনি বাংলার বাউলদের। সেই সব রচনার কিছু গান নিয়ে সাজিয়েছি আজকের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ক্ষেত্রে বলে নেওয়া উচিত হবে, লেখকের হাতে এমন কিছু রচনা ছিল যা "কাহিনী গীতি" হিসেবে বৃহাদাকারের—সেগুলো এখানে যুক্ত করা হয়নি। এখানে মোট ১৩ জন বাউল কবির গান নিয়ে লেখাটি তৈরি করা হয়েছে।

তরুণ গবেষক জানিয়েছেন, "লোকসংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ" নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথম গান রচনা করেছেন চারণ কবি শেখ রোকনউদ্দিন, ১৯৫১-১৯৫৪ সালের মার্চের মধ্যে তার লেখা অসংখ্য নির্বাচনী গানের চারটিতে শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ আছে। নিম্নোক্ত গানটি ১৯৫১ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে রোকনের পরিচয়ের পর রচিত। গানটি হলো—

> চাষী মরছি না খাইয়া
> ও আজ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কইরা মরি
> স্বাধীনতা পাইয়ারে
> চাষী মরছি না খাইয়া ॥
> . . .
> শেখ মুজিবর বলেছিল
> ছেড়ে দেও গো ধান
> ও সে আমার দেশের দাওয়াল ভাইরা
> ভিক্ষা দাও গো প্রাণ
> সরকার ভিক্ষা দাও না প্রাণ
> জালিম সরকার ভাত না দিয়া
> মুজিব ভাইরে নিল ধইরা
> তারে তিনটি বছর রাখলো জেলে
> বিচার না করিয়া ॥ (রঞ্জনা বিশ্বাস ২০১৭: ১৪৯)

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যতবার হাওড়বেষ্টিত অঞ্চল সিলেট গিয়েছেন প্রায় ততবারই শাহ আবদুল করিম সেই বক্তৃতা মঞ্চে গান গেয়েছেন। আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী দলের কেন্দ্রীয় নেতাগণ সিলেটে কোন প্রোগ্রামে গেলেই শাহ আবদুল করিমকে ডেকে নিতেন। আব্দুস সামাদ আজাদ সাহেবের সকল নির্বাচনী মঞ্চেই বাউল করিম ছিল অবধারিত। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেন। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী আর দুর্নীতি দমনের মন্ত্রী হলেন শেখ মুজিব। ১৯৫৬ সালের ২৬ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু প্রথম সুনামগঞ্জ শহরে এলেন। শাহ আবদুল করিম (১৯১৬–২০০৯)-এর "আত্মস্মৃতি" থেকে জানা যায়—

"সুনামগঞ্জে সফরে আসলেন যখন/সামাদ মিয়া সঙ্গে ছিলেন তখন॥ এই দুইজনের প্রতি মানুষ আশাবাদী ছিল/দূরের লোক কষ্ট করে দেখার সুযোগ নিল॥/আমিও সমাবেশে অংশ নিলাম/জনসভায় তখন গান গেয়েছিলাম:

পূর্ণচন্দ্রে উজ্জ্বল ধরা
চৌদিকে নক্ষত্র ঘেরা
জনগণের নয়ন তারা
শেখ মুজিবুর রহমান
জাগ রে জাগ রে মজুর কৃষাণ ॥

গণসঙ্গীত পরিবেশন করলাম যখন/ একশত টাকা উপহার দিলেন তখন ॥/ শেখ মুজিব বলেছিলেন সদানন্দ মনে/ আমরা আছি করিম ভাই আছেন যেখানে॥" (শাহ আব্দুল করিম পাঠ ও পাঠকৃতি [সম্পা.] শুভেন্দু ইমাম ২০১০: ১৯৯)

ভবা পাগলা (১৯০০-১৯৮৪): জন্ম ঢাকা জেলার ধামরাইয়ের আমতা গ্রামে। তিনি কয়েক সহস্রাধিক গান রচনা করেছেন। সর্বত্রই তিনি আধ্যাত্মিক সাধকরূপে পূজিত হচ্ছেন। তাঁর নামে বিভিন্ন স্থানে উৎসব হয়। তাঁকে নিয়ে বহু অলৌকিক ঘটনা লোকমুখে প্রচারিত হতে শোনা যায়। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি বৃহৎ রচনার কিয়দংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

(আজি) পদ্মার জল লাল
যমুনার কালো
ব্রহ্মপুত্র অতীব ভীষণ
মেঘনা নদী অতি বিশাল ॥
. . .
ভবা পাগলার অভিমান
আর কেন দেরী, শোনো হে কাণ্ডারী
মুজিব রে হও অধিষ্ঠান
সু সন্তান তোমার নিয়েছে ভার
(আজি) ধরিতে বাংলার হাল ॥

(ভবা পাগলার জীবন ও গান [সম্পা.] গোপিকা রঞ্জন চক্রবর্তী ১৯৯৫: ৯০–৯১)

এই গানটি মহান মুক্তিযুদ্ধের পূর্বকার রচনা। বিভিন্ন নদ-নদী, দেব-দেবী এবং বাংলার সন্তানদের সংগ্রামী প্রত্যয় বর্ণিত হয়েছে এই গানে। অবশেষে কাণ্ডারী হিসেবে শেখ মুজিবের অধিষ্ঠান চাইছেন ভবা পাগলা। 'মুজিবরে হও অধিষ্ঠান' বিশ্বকাণ্ডারীর নিকট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারীর জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন ভবাপাগলা এ গানের মধ্য দিয়ে। গানটি ভবাপাগলা কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গভীর রাত্রে কালনা মন্দিরে বসে লেখা। এই কালো রাত্রে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের নিপীড়িত, নির্যাতিত ও নিরস্ত্র অসহায় মানুষের উপর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালালে ভবাপাগলার মন অস্থির হয়ে ওঠে। তখনই তিনি এ গান রচনা করেন।

কামালউদ্দিন (১৯০৩–১৯৮৫): সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামে জন্ম। মালজোড়া গানের বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তাঁর একটি গান—

নৌকা আগে চলে রে, এ নৌকাটা শেখ মুজিবের
এ নাও দেখতে ভালো, চাঁদের আলো, গলই ছিল চন্দনের ॥
এগারো তক্তার নৌকাখানি, নাহি দিল গাব গাঁথুনি রে
একবিন্দু দেয় না পানি, উপরে তার আছে ছানি, গলই দিল সেগুনের ॥
ওই নৌকা ভিতর খোলা, মানুষ ধরে উনিশ জেলার
বুঝি না ভাই খোদার লীলা, জায়গা হয় না দালালের
শেখ মুজিব হাইলে ধরা, সামাদ ব্যাটা মাস্তুল খাড়া, ছায়া পড়ল আরশের ॥
কামালউদ্দিন চলে জয়বাংলা বলে, ছাড়ো নৌকা পাল তুলে
যাইব বুঝি সেই পাড়ে মানে না বান তুফান
হও রে সবাই আগুয়ান, করি না ভয় বোমা বুলেটের ॥
(বাউলগানে বঙ্গবন্ধু [সম্পা.] সুমনকুমার দাশ ২০১৭: ১৭)

এই গানটি ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পূর্বে গণ-সংগ্রামের সময়কার রচিত। বাউলদের গানে রচনার সময়কাল না থাকায় সন তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে জেলা ছিল ১৭টি ১৯৬৯ সালে টাঙ্গাইল ও পটুয়াখালি জেলায় পরিণত হওয়ায় ১৯টি জেলা হয়। এই গানে ১৯টি জেলার কথা বলা হয়েছে। আবার ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ 'নৌকা'–কে প্রতীক হিসেবে নির্বাচিত করে। ধারণা করা যায়, এই গানটি তখনকার রচনা। আরো একটি গান তাঁর লেখনী থেকে উঠে আসে। সেটি হলো—

নৌকা বাইয়া যাও রে বাংলার জনগণ
বঙ্গবন্ধুর সোনার নাও ভাসাইলাম এখন ॥
ও ভাইরে ভাই, ছয় দফার এই নৌকাখানি
সাজাইয়াছেন মুজিব জানি, বাংলার দুঃখ করিতে বরণ
আইয়ূব হইয়া বাদী, কষ্ট দেয় নিরবধি
সইলেন কত মুজিব জ্বালাতন ॥
ও ভাইরে ভাই, ১৯৭১ সালে
সকলের সংগ্রামের ফলে মুক্তি পেলেন রাজবন্দিগণ
এসে মুজিব বাংলার বুকে, দুঃখ বললেন নিজের মুখে
নিজ কণ্ঠে দিয়া ভাষণ ॥
ও ভাইরে ভাই, শেখ মুজিবের ভাষণ শুনে
বাংলার এই জনগণে ক্ষেপে উঠল আগুনের মতন
রাস্তাঘাটে হয় শ্লোগান, এগিয়ে চলেন নওজোয়ান
ছয় দফারে করিবারে রণ ॥
ও ভাইরে ভাই, দুষ্ট আইয়ূব কী করিল
সামরিক সিপাই পাঠাইল, জারি করল সামরিক শাসন
ইয়াহিয়াকে গদি দিয়া, আইয়ূব খান গেল সরিয়া
ঢাকায় এসে করিল আসন ॥
ও ভাইরে ভাই, বাংলার এই মুক্তিবাহিনী
যুদ্ধ করে দিনরজনী, চেষ্টা করে দিয়া প্রাণধন
একাত্তরে হইল স্বাধীন, বলে বাউল কামালউদ্দিন
ঘুচল বাংলার যত জ্বালাতন ॥
(বাউলগানে বঙ্গবন্ধু [সম্পা.] সুমনকুমার দাশ ২০১৭: ১৮)

গানটি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সময়কার রচনা। ধারণা করা যায় ১৯৭২-এর প্রথম দিক্‌কার রচনা এটি। বাউলরা যে রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন তার উদাহরণ মেলে এই গানে। ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে আজো এই গান উচ্চারিত হয় বাংলার পথে প্রান্তরে।

বিজয় সরকার (১৯০৩–১৯৮৫): নড়াইল জেলার সদর থানার ডুমদী গ্রামে জন্ম। বাংলাদেশের বিখ্যাত কবিয়াল ও বিচ্ছেদী গানের রচয়িতা তিনি। পিতার নাম নবকৃষ্ণ বৈরাগী ও মাতা হিমালয়কুমারী বৈরাগী। বিজয়ের সময় থেকেই বৈরাগীর পরিবর্তে তাঁকে অধিকারী লিখতে দেখা যায়। এখন তাঁর বংশীয়গণ অধিকারী বলে পরিচিত। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বৈরাগী ও অধিকারী সমার্থক শব্দ। কৈশোর থেকেই সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। কবিগানে তিনি যশস্বী হয়ে উঠেন অল্প বয়সেই। বিজয় সরকার হরিচরণ আচার্য ও রাজেন্দ্রনাথের মত গ্রহণ করে অশ্লীলতা মুক্ত কবিগান করেছেন। সমাজ সচেতন ও রাজনীতি সচেতন কবিয়াল বিজয় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বেশ ক'টি গান রচনা করেন।

বাংলাদেশ দরদী, দয়া করে যদি, আসিয়াছ আজি দেশের মমতায়
কি আছে মোদের কি দিব তোমারে, বরণ করিতে তবু পরানে চায় ॥
জাতীয় কুসুমে সাজায়েছি ডালা, তাতে আছে মোদের আঁখির বারি ঢালা
পরো হে অতিথি দীন জনের মালা, সফল এ জীবন মনির তায় ॥
সর্বহারা হয়েছিলাম দুর্বিপাকে, দেশে এলাম আবার তোমাদেরই ডাকে,
দেখে যাও দরদী কে কেমন থাকে, বলে কি জানাব আজি তোমায় ॥
জয় বাংলার জয় নিশান গগন মণ্ডলে, বাঙালি সব মোর মিলে দলে দলে,
আশ্রয় নিব এসে সেই পতাকা তলে নিরাপত্তার সান্ত্বনায় ॥
পাগল বিজয়ের প্রার্থনা বিশ্বপতির পদে, চির সুখী হয়ে থাক নির্বিবাদে
দীর্ঘজীবী হও তাঁহার আশীর্বাদে, দেশের কার্য কর সুষ্ঠু সবলকায় ॥

রচনা: ২৫ ভাদ্র ১৩৮০, দিঘলিয়া
(বিজয়গীতি [প্রকাশক] ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ২০০৬: ১৩৯)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জয়ের মাল্যে অভিষিক্ত করা এই রচনার বিষয়বস্তু। তাঁর জয়ে মন্দির-মসজিদে এবং বিভিন্ন উপাসনালয়ে বিশেষ পূজা বা উপাসনার আয়োজন করা হয়েছিল।

মহিমায় যার মুখরিত রাষ্ট্রপুঞ্জ অবধি
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু দীন দরিদ্রের দরদী
সে যে স্বাধীনচেতা শ্রেষ্ঠ নেতা, নহে অদৃষ্টবাদী ॥
বৃটিশ গেল নোটিশ পেয়ে স্বদেশী মামলায়
চোর খেদায়ে ডাকা এসে জুটিল বাংলায়,
দেশের জনগণ তাহাদের হামলায়, নির্যাতিত নিরবধি ॥
মোদের দেশে বসবে ওরা উচ্চ আসনে
ওদের পদলেহন করতে হবে তীব্র শাসনে,
ওরা বাস করবে বিলাস ব্যসনে, ছল চাতুরী চৌপদী ॥
বাঙালি যোগাবে খাবার ভার বোঝা বহি

ওরা দেশে নিয়ে বেশি খাবে কেমনে সহি
ওরা বলবে তারে দেশদ্রোহী উচিত কথা কই যদি ॥
উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা প্রথম তাই প্রকাশ
মাতৃভাষা বাদ দিলে জাতীয় সর্বনাশ
ওরা ঘরে বসে ঘটাবে ত্রাস লাভ করে পরের গদি ॥
আঘাত লাগল বঙ্গবন্ধুর আত্মসম্ভ্রমে
গাত্র ঝাড়া দিয়ে উঠল সিংহ বিক্রমে
তারা বানায়ে রাখল চরমে কারাগারের কয়েদী ॥
জাতির জনক জানাইল জয় বাংলার বাণী
পাগল বিজয় বলে এই বাণী সব বাঙালির বাণী
এখন গাহিছে এই অমর বাণী পাহাড় পর্বত নদ নদী ॥

রচনা: ৬ বৈশাখ, ১৩৮০, মালগাজীর পথে লঞ্চে
(বিজয়গীতি [প্রকাশক] ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ২০০৬: ১৪১-১৪২)

বাংলাদেশের ইতিহাস নির্ভর রচনা এটি। বঙ্গবন্ধুকে এখানে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নানা নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করে, সত্যকে বুকে লালন করে এবং সাহস ও ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দিয়ে তিনি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন অর্থাৎ জয়ী হয়েছেন এবং বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছেন।

১৯৭০ সালে হিমেল বাতাসে
সাতই ডিসেম্বর মাসে, একটি নূতন নক্ষত্র উঠিল বাংলার আকাশে,
যে কথা কেউ ভাবে নাই, ঘটিল তাই, জনগণ আনন্দে ভাসে,
ছন্দে ছন্দে উঠে সেই আনন্দের সুর ছুটে চলে সুদূর প্রবাসে ॥
সেই নক্ষত্রের আলোকে উঠল পৃথিবী হেসে
বলে এমন নেতা, জন্মে নাই আর কোনো দেশে
গণ নির্বাচন কার্যে কোনো রাজ্যে সাজে নাই কেউ এমন বেশে
নূতন এক ইতিহাসের সূচনা হলো প্রীতির পরিবেশে ॥
ধন্য ধন্য মুজিবর শেখ, আজাদি পরান, তুমি বাংলার সুসন্তান,
তাই তো এই দেশে পাঠাল তোমায় মালিক মেহেরবান,
স্বদেশের দৈন্য দুঃখে তোমার বক্ষে লাগল যেন শক্তিশেল,
তাই তুমি জীবন মরণ পণ করে দেশের তরে করলে আত্মদান ॥
তোমার নির্বাচনের বাক্সে ছিল নৌকার এক প্রতীক
সবাই আশা বুকে চেয়ে আছে তোমার মুখের দিক
লাগবে না জলের বাড়ি, স্রোতের আড়ি কেটে পাড়ি উঠিবে ঠিক
সব দেশের আদর্শ হবে এই দেশ, বাংলার গর্ব তুমি সর্বাধিক ॥
সেই আগরতলা ষড়যন্ত্র যন্ত্রণা অপার, বরণ করলে কারাগার
দেশের কত লোক করল তোমার তীব্র তিরস্কার
ঝঞ্ঝাট সব গেছে কেটে চল হেঁটে কর্মের পথ তোমার পরিষ্কার
পাগল বিজয় কয় ওহে বিজয়ী কর্মবীর তোমাকে জানাই নমস্কার ॥

রচনা: ২২ মাঘ, ১৩৭৪, সন্তোষপুর
(বিজয়গীতি [প্রকাশক] ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ২০০৬: ১৭৫-১৭৬)

১৯৭০ সালের নৌকা প্রতীক নিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচন। যেখানে পরাস্ত হয়েছে আগরতলা ষড়যন্ত্র, আইয়ূব-ভুট্টোর গভীর ষড়যন্ত্র এবং পশ্চিমাদের নানামুখী তৎপরতা। নির্বাচনে শেখ মুজিবের জয়লাভে আকাশে বাতাসে আনন্দের উচ্ছ্বাস।

আয়ূব ভুট্টো ইয়াহিয়া এরা অভিনেতা
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু অদ্বিতীয় নেতা
স্বার্থত্যাগী দেশ দরদী আত্ম বিজেতা
বিস্ময় মেনেছে বিশ্ব চেয়ে তোমার পানে ॥
দেশের লাগি অনুরাগী যাঁরা দিল প্রাণ
তাঁর স্মৃতির বেদী মূলে কর প্রীতি অর্ঘ্য দান
পাগল বিজয় বলে বিশ্বপতি করুণা নিদান
শুভাশিস কর তোমার সেই বীর সন্তানে ॥

রচনা: আষাঢ়, সংক্রান্তি, ১৩৭৯, ডুমদী
(বিজয়গীতি [প্রকাশক] ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ২০০৬: ২১৮-২১৯)

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীনের কথকতা ফুটে উঠেছে এই রচনায়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, ধনী-গরীব মিলে মিশে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলার দামাল ছেলেরা নয় মাস যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলো এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে অভিষিক্ত করা হলো। সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দেশকে শত্রু মুক্ত করা হলো।

শেখ মুজিবর শুভ সুখবর তুমি দিলে জয় বাংলা ধ্বনি তুলিয়া
বাংলা মায়ের তুমি দরদী ছেলে, দরদের দুয়ার তাই দিলে খুলিয়া ॥
নির্ভীক বীর দুর্দমনীয়, জনমন রঞ্জন রমণীয়
মৃত্যুঞ্জয়ী দেশ-বরণীয় স্মরণে সুখেতে ওঠে বুক ফুলিয়া ॥
প্রাণ দিয়ে দেশকে ভালোবেসে ছিলে
দেশও তেমনি তোমাকে যোগ্য অর্ঘ দিলে
মনে রেখ ইহা সেই অসীমের লীলে,
জীবনে যেও না তাই কভু ভুলিয়া ॥
ব্যবধান তুচ্ছ করি পেলে উচ্চাসন
পৃথিবীতে কারো ভাগ্যে ঘটেনি এমন
স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস করিবে বহন
আবহমান কালের তালে ছন্দে দুলিয়া ॥
পৃথিবী জানিল আজি তব গুণ গান
ছয় দফা দাবী তোমার স্বভাবী সংগ্রাম
পাগল বিজয় বলে সফল হউক বঙ্গবন্ধু নাম
বাংলার এই ফুল বনের বুলবুলিয়া ॥

রচনা: ২০ মাঘ, ১৩৭৭
(বিজয়গীতি [প্রকাশক] ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ২০০৬: ২২১)

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় লাভের সময় রচিত এই গান। বঙ্গবন্ধুর প্রতি ফুলেল শুভেচ্ছার স্মারক বহন করে এই গান। বাঙালি জাতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস তথা বাংলার বাউল কবিগণও এই বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করে।

শাহ আবদুল করিম (১৯১৬–২০১৯): জন্ম সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার ধল গ্রামে। ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনে কবিয়াল রমেশ শীলের সঙ্গে গণসংগীত পরিবেশন করেছেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। ২০০১ সালে লোকসংগীতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি "একুশে পদক" লাভ করেন। এছাড়াও তিনি বহু পদকে ভূষিত হন। তাঁর প্রকাশিত গীতি সংকলন: আফতাব সঙ্গীত (১৯৪৮), গণসঙ্গীত (১৯৫৭), কালনীর ঢেউ (১৯৯৮), ধলমেলা (১৯৯০), ভাটির চিঠি (১৯৯৮), কালনীর কূলে (২০০১) ও শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র (২০০৯)।

বন্ধু ছিলেন সত্য বটে
আসলে শত্রু নয় ॥
শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু সবাই কয় ॥
স্বার্থের জন্য স্বার্থপরে
ভারত বিভক্ত করে
২৩ বছর শোষণের পরে
বাঙালি সচেতন হয় ॥
শোষণমুক্তি চেয়েছিলেন
শেখ মুজিব দায়িত্ব নিলেন
জনগণ সমর্থন দিলেন
ছাড়িয়া মরণের ভয় ॥
গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র
এই ছিল তার মূলমন্ত্র
ধর্ম নয় শোষণের যন্ত্র
নিরপেক্ষ সমুদয় ॥
এনে দিলেন স্বাধীনতা
তাইতো হলে জাতির পিতা
স্বাক্ষী বিশ্বের জনতা
এই কথা যে মিথ্যা নয় ॥
দীর্ঘ ২১ বছর পরে
আজ বাংলার ঘরে ঘরে
আশার সঞ্চার হলোরে
হলো নতুন ভাব উদয় ॥
গোপন ষড়যন্ত্র করে
মুজিবকে সপরিবারে
অন্যায় ভাবে হত্যা করে
বিচার যে তার বাকী রয় ॥
যারা বাংলা মায়ের ভক্ত
মনকে করে নিল শক্ত
লাখ লাখ শহীদের রক্ত
বৃথা যাবে না নিশ্চয় ॥
শুনি জ্ঞানী গুণীর কথা

শ্রেষ্ঠ হয় মানবতা
শেখ মুজিব জাতির পিতা
করিম বলে নাই সংশয় ॥
(সংগ্রহ: বাউল আবদুর রহমান)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে আমাদের জাতির পিতা—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শাহ আবদুল করিম সহজ কথায় বাংলাদেশ স্বাধীনের ইতিহাস বিধৃত করেন। রাতের আঁধারে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে একদল দুষ্কৃতিকারী উল্লাস করেছিলেন, তাদের বিচার দাবি করেন আবদুল করিম। রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন বাউল শাহ আবদুল করিম। এই গানটি তারই পরিচায়ক।

দুর্ব্বীন শাহ (১৯২০–১৯৭৭): জন্মেছেন সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার নোয়ারাই গ্রামে। তারাটিলায় জন্ম নেওয়া দুর্ব্বীনের পরবর্তী নামকরণ হলো দুর্ব্বীন টিলা। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর রচিত বেশ ক'টি গান পাওয়া যায়। একটি গান মহান মুক্তিযুদ্ধের পূর্বকার। গানটি হলো—

কী দিব তুলনা জগতে মিলে না
দেশ দরদী মহান হৃদয় শেখ মুজিবুর রহমান ॥
সাত কোটি মানুষের পক্ষে নির্যাতন লইয়া বুকে
তবু আমাদের দুঃখে কাঁদে যার প্রাণ
জেল-জুলুম-অত্যাচারে হার মানিল যাহার ধারে
বঙ্গমাতার শ্রেষ্ঠতম সেরা বীর সন্তান ॥
. . .
এমন উদার মহান নেতা
অন্তরে যার দেশের ব্যথা ভুলব না তাঁর কল্যাণের কথা
বলে পাগল দুর্ব্বিন শাহ পূর্ণ হউক বাঙালির আশা
ঘরে ঘরে রব উঠুক আজ ছয় দফারই গান।
(বাউলগানে বঙ্গবন্ধু [সম্পা.] সুমনকুমার দাশ ২০১৭: ২৩)

কোন প্রেক্ষাপটে গানটি রচিত তা সহজেই অনুমেয়। ছয় দফা বাঙালির মুক্তির সনদ। ১৯৬৬ সালে স্বাধীনতার বীজ বপিত হয় এই ছয় দফা'র মাধ্যমে। দুর্ব্বীন শাহ বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত এই ছয় দফা'র প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে সেই সময়ে রচেন এই গান। তাঁর রাজনৈতিক গানগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নামে বন্দনা গীত, ছয় দফার বিশ্লেষণ গীত, ১৯৭০-এর নির্বাচনবিষয়ক, ২৫ মার্চের অতর্কিত হামলা, নয় মাসের যুদ্ধ বিশ্লেষণমূলক গান, সংবিধানের মূলমন্ত্রবিষয়ক গান এবং যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনীর অংশগ্রহণে দেশ স্বাধীনের গল্প স্থান পেয়েছে।

মছরু পাগলা: ১৯২৫ সালে দক্ষিণ সুনামগঞ্জের বীরগাঁও গ্রামে জন্ম। ১৯৪৫ সালে এন্ট্রান্স পাশ করেন। দেশ ভাগের আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রের গীতিকার ছিলেন। ১৯৯৮ সালের ১০ নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শেখ মুজিব জাগিয়ে ছিল
যাঁর ডাক শুনে জাগিল জাতি
হাতে দিয়া তালি ॥
জয় বাংলা জয় বাংলা বলে উঠিল আওয়াজ
কেউ করল পূজা-পার্বণ কেউ নফল নামাজ
কেউ বা অতি উগ্রমতি করেছে ফালাফালি ॥
মর্ম জেনে কর্ম গুণে অল্প দিনে মাত্র
শেখ মুজিব তৈয়ার করল স্বাধীনতার ক্ষেত্র
হেন সময় মুজিবেরে বন্ধিল উর্দুওয়ালি ॥
১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ মুজিব শূন্য দেশ
কেবা দিবে আওয়াজ রেওয়াজ, আদেশ কী নির্দেশ
বাঙালিদের বুকে সেদিন পাঞ্জাবি চালায় গুলি ॥
তড়িৎকর্মা পুরুষ যাহার, সাহসের নাই শেষ
কইল বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আমি মেজর জিয়া বলছি, স্বাধীন বাংলাদেশ
২৬শে মার্চ দিল জিয়া মুক্তিযুদ্ধের দ্বার খুলি ॥
(বাউলগানে বঙ্গবন্ধু [সম্পা.] সুমনকুমার দাশ ২০১৭: ৩৬)

গানটির বয়ানে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। সমগ্র বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। এবং বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ডাক দিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের শুরু করলেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে যে মর্মবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেটাই মূলত মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ঘোষণা—"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এই গানটির মধ্য দিয়ে আমরা অবগত হই, শেখ মুজিবের ডাকে বাঙালি জাতির জেগে উঠার কথা। চারদিকে 'জয় বাংলা' ধ্বনিত হলো। বার বার আন্দোলনে তিনি স্বাধীনতার ক্ষেত্র তৈয়ার করলেন। পাকিস্তানীরা তাঁকে বন্দী করে নিল। নিরীহ বাঙালির উপর ২৫ মার্চ অতর্কিত হামলা চালায়, এদিকে মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাঙালিরে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেবার ডাক দিলেন।

কুটি মনসুর (১৯২৬-২০১৭): ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন থানার লোহারটেক গ্রামে জন্ম। প্রকৃত নাম মোহাম্মদ মনসুর আলী খান। চার ভাইবোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মা তাঁকে "কুটি" বলে ডাকতেন। তাঁর রচিত অনেক গান এখনো জনপ্রিয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের মাতৃভূমি রক্ষায় তিনি গান লিখেছেন। এর স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা জেলার দোহার অঞ্চলের স্থানীয় কমাণ্ডার তাঁকে "কলমসৈনিক" সনদ প্রদান করেন। তাঁর রচিত ৫টি গ্রন্থ হলো—"আমার বঙ্গবন্ধু আমার '৭১, "কুটি মনসুরের অমর সংগীত", "মীন-গীতিকা", "পরিবার পরিকল্পনার গান" এবং "কুটি মনসুরের ভাণ্ডারী গান"।

শিয়াল কয় খাটাশ ভাইরে উপায় নাইরে
জীবন বাঁচাই কেমন করে
ওরে জোয়ার আইলো বর্ষা হইলো
পানি গেল চকপাথারে ॥
জোষ্ঠী মাসে গোষ্ঠীসহ পাট ক্ষেতে করিতাম বাস

পাড়ায় গিয়া খুব করিয়া ধইরা খাইতাম মুরগি হাঁস
খাইতাম ভাল থাকতাম সুখে টের পাইতো না গাঁয়ের লোকে
সাথে কইরা শিয়ালনীকে হাওয়া খাইতাম সন্ধ্যার পর ॥

. . .

ইয়াহিয়া টিক্কা খান আর যুদ্ধবন্দী বেঈমান
জ্বালাইয়া পোড়াইয়া সোনার বাংলা করে শ্মশান
বঙ্গবন্ধু নির্দোষী, হুকুম দেয় তার হবে ফাঁসী
কুটি মনসুর বলে বিশ্ববাসী বিচার কর ইয়াহিয়ারে ॥

রচনা: ০৭/০৪/১৯৭১

(কুটি মনসুরের গান [সম্পা.] অণিমা মুক্তি গমেজ ২০১৯: ৫৪)

কুটি মনসুরের এই গানটি একটি অসামান্য রচনা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বর্ষাকালে বেশ বেকায়দায় পড়েছিল। বর্ষার পানিতে সয়লাব বাংলায়, বেগতিক হয়ে পড়ে হানাদাররা। মনসুর সেই সময়ে শিয়ালের অবস্থা বর্ণনার সঙ্গে পাকিস্তানিদের তুলনা করেছেন। শিয়ালের যেমন বর্ষাকালে বেঁচে থাকার জন্য গৃহস্থের বাড়ি ঘরে ঢুকে মুরগী চুরি করতো—তেমনি অবস্থা ছিল নরপিশাচদের।

বাঙালি বীরেরই সন্তান
বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পেয়ে
একাত্তুরে যুদ্ধে গিয়ে দিয়েছিল প্রাণ
বাঙালি বীরেরই সন্তান ॥
অনেক রক্তের বিনিময়
বাংলাদেশটা স্বাধীন হয়
উড়াইয়া বিজয় পতাকা গায় বিজয়ের গান ॥
মুক্তিযোদ্ধা শহীদান
জীবন তারা করছে দান
তাদের জন্য দোয়া করে হিন্দু মুসলমান ॥
১৬ তারিখ ডিসেম্বরে
আনন্দ উল্লাস ঘরে ঘরে
বাংলাদেশের ইতিহাসে রয়েছে প্রমাণ ॥

রচনা: ১৬/০৭/১৯৭১

(কুটি মনসুরের গান [সম্পা.] অণিমা মুক্তি গমেজ ২০১৯: ৫৯)

কুটি মনসুরের রচনায় উঠে এসেছে দেশ স্বাধীনের কথা। শত শহীদের আত্মদান, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রয়াস এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশটা স্বাধীনতা লাভ করে। বাঙালি বার বার প্রমাণ করেছে এরা বীরেরই সন্তান—সেই কথা ইতিহাসেই রয়েছে প্রমাণ বলে উল্লেখ করেছেন কবি।

বিশ্ববাসী সবার মুখে শুনি শুধু একটি নাম
শেখ মুজিব শেখ মুজিব

জাতির জনক শেখ মুজিব ॥
গরীব ধনী সবার প্রিয় স্মরণীয়একটি নাম
শেখ মুজিব শেখ মুজিব
জাতির জনক শেখ মুজিব ॥
মুজিব ছিলেন প্রতিবাদী সংগ্রামী এক চেতনা
শ্রমজীবি সব মানুষের কল্যাণেরও প্রেরণা
দেশকে ভালবেসেছেন সুখ সমৃদ্ধি চেয়েছেন
জ্বালাতে চেয়েছেন তিনি শান্তিরও মঙ্গল প্রদীপ ॥
জীবনে কখনো নিজের সুখ শান্তি চাইলেন না
মানুষের কল্যাণ চেয়ে ভোগ করেছেন লাঞ্ছনা
দেশকে আপন জেনেছেন স্বাধীনতা এনেছেন
তাই/ বাংলাদেশের লাল সবুজ
পতাকা রবে চিরঞ্জীব ॥

রচনা: ০৭/১১/১৯৭২

(কুটি মনসুরের গান [সম্পা.] অণিমা মুক্তি গমেজ ২০১৯: ৪৮)

এই গানটিতে ফুটে উঠেছে বঙ্গবন্ধুর ওপর পশ্চিমাদের নির্যাতনের ইতিহাস। লোকগানের রচিত গানে সাধারণ মানুষ উদ্বুদ্ধ হন সহজ কথা ও সুরের প্রয়োগে গান গীত বলে। কুটি মনসুর তাঁর শাণিত চেতনায় বঙ্গবন্ধুকে অঙ্কিত করেছেন লাল-সবুজের পতাকা ও মানচিত্রে।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বলরে সবাই বল
অর্থনৈতিক মুক্তির পথে
চল এগিয়ে চল ॥
বাংলার মানুষ একসাথে লড়বো এবার লড়বো
বঙ্গবন্ধুর সুখের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবো
ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলবো
সোনার বাংলা গড়ে তুলবো
আয়রে আয় সেই একাত্তুরের
বীর সৈনিকের দল ॥
মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা বিরোধিতা করেছে
আবার তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছে
বঙ্গবন্ধুর শত্রু যারা
এবার ধরা পড়বে তারা
বাংলার শত্রু ধ্বংস হবে
যাবেরে সব রসাতল ॥

রচনা: ২০/০৪/১৯৭৩

(কুটি মনসুরের গান [সম্পা.] অণিমা মুক্তি গমেজ ২০১৯: ৪৮-৪৯)

দেশ স্বাধীন হয়েছে, সকলকে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু—সেই ডাকে সকলকে এক সাথে কাজ করার আহ্বান জানালেন এই কবিও। সেই সঙ্গে কবি হুঁশিয়ার করেও দিয়েছেন যে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসররা অর্থাৎ রাজাকার-আল্ শামস্ এখনো বাংলার মাটিতে রয়েছে। তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠার চেষ্টা করছে, তাদেরকেও ধ্বংস করতে হবে।

বাঙালি যার জন্য স্বাধীন হইলা তারে চিনলা না
বাংলাদেশটা কেমনে পাইলা
সেই খবর কেউ নিলা না ॥
বাহান্ন থেকে বাইশটি বছর অত্যাচার আর অপমান
জেল জুলুম ভোগ করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান
তারপর সত্তুর সনের নির্বাচনের
ইতিহাস কেউ ভুলবে না ॥
নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে হারাইতে পারে নাই
তবুও সেই পাকিস্তানে ক্ষমতা ছাড়ে নাই
শেষে একাত্তুরে যুদ্ধ করে
স্বাধীন হইলা বুঝলা না ॥
বাংলাদেশটা স্বাধীন হইল বঙ্গবন্ধুর উসিলায়
পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বাংলা ছাইড়া চইলা যায়
বর্তমান প্রজন্মের মানুষ
এই ইতিহাস জানলো না ॥
১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশটা পাই
বর্তমান প্রজন্মের কাছে সেই ইতিহাস বলে যাই
ইতিহাসে প্রমাণ অছে
মিথ্যা বলা চলবে না ॥

রচনা: ০২/১১/১৯৭৩

(কুটি মনসুরের গান [সম্পা.] অণিমা মুক্তি গমেজ ২০১৯: ৫৬-৫৭)

এই গানে কবি বঙ্গবন্ধুর কর্মপ্রবাহ ও দেশ স্বাধীনের কথা শোনাতে চেয়েছেন। ইতিহাসের সত্য ঘটনা অবলম্বনে তাঁর এই গান। স্বাধীন দেশের প্রকৃত ইতিহাস স্বাধীনতার পরবর্তী (১৯৭৫-১৯৯৫) বিশ বছরে বিকৃত করা হয়েছে। এই আশঙ্কা কবির ১৯৭৩ সালের রচনায়ই অনুমেয়। কবিগণ সত্যালাপী।

রাজ্জাক দেওয়ান (১৯৩৩-২০০৩): ঢাকার মোহাম্মদপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে চরওয়াসপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। "মাতাল কবি রাজ্জাক দেওয়ান" নামে তিনি বহুল পরিচিত। পাকিস্তান আমলে বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একনিষ্ঠ ভক্ত। বাউল ও পালাগানের জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন।

এমন করে ঘুমের ঘোরে থাকবি তোরা কতকাল
সোনার বাংলা খুনে হইল লাল ॥
. . .
বাপের বেটা মুজিবরে ছয় দফা দাবি করে

রাখে তারে জেলের ভিতরে কতকাল
সিংহ ছিল বন্দিশালা আমরা ভাঙছি জেলের তালা
আমরা ছিঁড়ে ফেলছি লোহার জাল ॥
এখন আর ভাবনা কিরে সোনার মানুষ আসছে ফিরে
সোনার বাংলা চায় যাঁরে বাংলার দুলাল
জজ-ব্যারিস্টার-চামার-কুলি জান দিবে মুজিবর বলি
ডরাই কিরে রাইফেলের গুলি, সিংহের চক্ষু হইছে লাল ॥
বুকটান করে আগে বাড়, সাধ্য কিরে রুখিবার
জয় বায়া বলে একবার সাজো মাতাল
আয় বাঙালি ঝাঁকে ঝাঁকে সকলই এক সমানে ছুটে
তোমাদেরই কিলের চোটে পাকবেরে ভাদ্দইরা তাল ॥
আমাদের রুখবে কারা ভয় কিরে বাঙালি মোরা
আকাশে-বাতাসে সুর বঙ্গবন্ধু মুজিবুর
থাকিসনে আর ঘুমে বিভোর রক্তমাখা সিংহের গাল ॥
আমার দেশ আমার মাটি সোনা হইতে বেশি খাঁটি
শেখ মুজিব বাংলার খুঁটি ঘরের চাল
রাজ্জাকে কয় কপাল পোড়া স্বভাবদোষে গেলি মারা
এই দেশের চেয়ারম্যানের আমারে কয় মাতাল ॥

(বাউলগানে বঙ্গবন্ধু [সম্পা.] সুমনকুমার দাশ ২০১৭: ৩৮-৩৯)

রাজ্জাক দেওয়ান রচনা করলেন বঙ্গবন্ধুর আহ্বান জনিত এক অসামান্য বয়ান। পশ্চিমা ষড়যন্ত্র আর দেশীয় দালালদের কর্মতৎপরতা দেশের শান্তি বিনষ্ট করে। বঙ্গবন্ধুর হাতকে শক্তিশালী করার আহবান এই বাউলেরও। তিনি বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম নীতিও আন্দোলনের তীব্রতা তুলে ধরে শান্তিকামী মানুষকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ (১৯৩৫–১৯৯৬): সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকে আইনাখাল নদীর পূর্ব পাড়ে "শিবনগর" গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর রচিত গানের সংখ্য সহস্রাধিক। তাঁর গান গেয়েছেন অনেক নামী ও গুণী শিল্পী। তিনি পীর-মুর্শিদের গান, বিচ্ছেদী গান, মনঃশিক্ষা ও দেশপ্রেমের গান রচনা করেছেন।

ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধু বাঙালির নয়নমণি
ধন্য নজরুল তাজউদ্দীন সামাদ কর্নেল ওসমানী ॥
মুজিব ভাই বলেছিলেন আমি যদি থাকি না
সংগ্রাম চালাইও তোমরা ভয়ে অধীর হইও না
তোমাদের সাথী রব্বানা আল্লা কাদের গণি ॥
যে ফন্দী করেছিলো পশ্চিমা বর্বরের জাত
বাংলাদেশকে চিরতরে করতে চাইলো কিস্তিমাত
সবকিছু হইল নস্যাৎ আল্লা মেহেরবাণী ॥
অত্যাচারীর অত্যাচার চিরদিন থাকে না
তাই সমূলে ধ্বংস হইল পাকিস্তানী খান সেনা
জীবনে ভোলা যাবে না মা বইনের পেরেশানী ॥

(সংগ্রহ: কবিপুত্র মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন রনি)

(১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর দিরাই জনসভায় গানটি পরিবেশন করেন বাউল শিল্পী মোঃ শফিকুন নূর)

গিয়াসউদ্দীন আহমেদ একজন স্বনামধন্য লোককবি। এই গানে তিনি পশ্চিমাদের অত্যাচারী রূপ বর্ণনা ও সকল ষড়যন্ত্র নসাৎ করে এগিয়ে চলা বঙ্গবন্ধুর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। এই জন্যে যে দেশকে রাহুমুক্ত করেছেন এবং বাংলার মা-বোনদের জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

শেখ ওয়াহিদুর রহমান (১৯৩৯–২০১২): সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার খাসারিপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৭০ সালে তিনি যুক্তরাজ্য প্রবাসী ছিলেন এবং ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গীতি সংকলন: "আউল বাউল গীতিসম্ভার", "আউলের বুলি", "ওয়াহিদ গীতি", 'আউল বাউল মন", "শেখ ওয়াহিদ গীতি সমগ্র"।

ওরে এই নৌকা মুজিবের নৌকা
তোরা ভুলিস না রে তাঁরে
নৌকাটা ভিড়াইয়া দে রে
এবার কিনারে ॥
ঝাঁঝরা দেহে বিদায় করলে
সঙ্গে সপরিবারে
আজও কেন হয় না বিচার
কোন চক্রার চক্করে ॥
বিশ্বে কত নেতা মরল
খুনীরা স্বীকার না করল
তবু তাদের ফাঁসি হলো
বিশ্বের ওই দরবারে ॥
কালো দিবস পালন করে
তাঁহার খুনী যারা
সরাসরি স্বীকার করে
মারল যে তাঁহারে ॥
আউলা ওয়াহিদ বাউলা বলে
পঞ্চম সংশোধনী কারা করে
সেই কালো আই না ভাঙিলে
ইতিহাস ছাড়বে না তোমারে ॥
(বাউলগানে বঙ্গবন্ধু [সম্পা.] সুমনকুমার দাশ ২০১৭: ৩৬)

বাংলাদেশের সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী এনে ইতিহাসের ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের সকল কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দান, "বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম" সংযোজন। সেই কালো

আইনের প্রতিবাদ ও বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার বিচার দাবিতে বাউল ওয়াহিদের আর্তনাদ ও প্রতিবাদ।

সিরাজ উদ্দিন খান পাঠান: নেত্রকোণা জেলার ১৯৫৪ সালে কলমাকান্দা উপজেলার বাবনী গ্রামে জন্ম। পিতা সদর উদ্দিন খান পাঠান বংশীবাদক ছিলেন। আট বছর বয়সে চোখ উঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারান। ১৯৭১ সালে ১৭ বছর বয়সী সিরাজ মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় গোলাবারুদ বহনসহ নানাবিধ কাজ করতেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকার টেকেরঘাটের এক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন। তিনি সিরাজের হাতে মেডেল ও পুরস্কার তুলে দেন। ২০১৭ সালে তিনি লোকসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পদক পান।

ওরে মুক্তিসেনা শীঘ্র চল
রাখতে দেশের মান
সাত কোটি বাঙালি মোরা
কত সইবো আইয়ূবের
শাসন অপমান ॥
মুজিব সেনা এগিয়ে চল
হওরে আগুয়ান
শেখ মুজিব নায়ের কাণ্ডারী
আছেন বিদ্যমান ॥
সাতই মার্চে দিছে হুকুম
শেখ মুজিবুর রহমান
সিরাজ বলে পিছু হটবো না
দেহে থাকতে প্রাণ ॥
জুলাই, ১৯৭১
(সংগ্রহ: লেখক)

এই গানে এক দৃপ্ত শপথের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা সুস্পষ্ট ছিল—সেই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই গানে। তাঁরই নির্দেশে মুক্তিসেনারা সেদিন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

আবদুর রহমান: ১৯৫৫ সালে হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার জলসুখা গ্রামে জন্ম। তিনি শাহ আবদুল করিমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বিবাহিত এবং চার ছেলে ও দুই মেয়ের জনক। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারের নিয়মিত শিল্পী। প্রায় ছয় শতাধিক গানের রচয়িতা তিনি। এছাড়া নিমাই সন্ন্যাস পালা, গণসংগীত, বিচ্ছেদ গান, ফকিরি গান ও আজব রঙ্গের ফুল শীর্ষক পাঁচটি অডিও ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে।

জীবন দিয়ে দিয়ে গেলে
বাঙালিরে স্বাধীনতা
হাসে আজি প্রাণ খুলিয়া
পাকপাকালি তরুলতা ॥

জেল জুলুমের ভয় ছাড়িয়া
ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াইয়া
সৎ সাহস বুকে নিয়া
বলেছ স্বাধীনতার কথা ॥
গর্বে মাথা উঁচু করে
স্বাধীনের পতাকা উড়ে
বাউল কবি ব্যাখ্যা করে
কয় তোমারে জাতির পিতা ॥
বলে বাউল আব্দুর রহমান
তুমি বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান
ভুলবেনা তোমার অবদান
বাংলার বাঙালি জনতা ॥
(সংগ্রহ: আবদুর রহমানের গানের খাতা থেকে)

বঙ্গবন্ধুর কীর্তিগাঁথা এই রচনা। যে মহামানব ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও স্বাধীনতার কথা বলেছেন, স্বাধীন দেশের পতাকা উড়িয়েছেন বাউল কবিগণ নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন তিনিই আমাদের জাতির পিতা। কোনদিন তাঁর এই অবদানের কথা কেউ ভুলবে না।

পরিশেষে বলতে চাই, এই অন্বেষণ অথবা গবেষণা চলমান রাখতে পারলে বাংলার বাউল কবিদের অন্তর্বেদন আরও আরও বেশি উন্মোচিত হতো এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গ্রামীণ কবিদের প্রেম ও শ্রদ্ধার নিদর্শন তুলে ধরা যেতো। শহুরে কবিদের পাশাপাশি লোককবিগণের রচনা যে কোন অংশেই খাটো নয়—তা তুলে ধরা জরুরি। এই গবেষণায় অর্থ প্রদান করে বর্তমান সরকার, বাংলার লোককবিগণের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গান উদ্ধারে উদ্যোগী ভূমিকা নেবেন বলে আমার বিশ্বাস। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০২০ সালের 'মুজিব জন্মশতবর্ষ' নিয়ে রচিত গান বাদ দেওয়া জরুরি হবে, কেননা এইসব গান স্বতঃস্ফূর্ত রচনা নয়, ফরমায়েসী গান বলেই বিবেচনা করা উচিত।

তথ্যসূত্র

অণিমা মুক্তি গমেজ [সম্পা.] (২০১৯), *কুটি মনসুরের গান*, আলোকায়ন, ঢাকা।

আবদুর রহমানের গানের খাতা থেকে সংগৃহীত।

গোপিকা রঞ্জন চক্রবর্তী [সম্পা.] (১৯৯৫), *ভবা পাগলা'র জীবন ও গান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

গোলাম কুদ্দুছ (২০২০), *বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি সংস্কৃতি*, নালন্দা, ঢাকা।

ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস [প্রকাশক] (২০০৬), *বিজয়গীতি*, কোলকাতা।

রঞ্জনা বিশ্বাস (২০১৭), *লোকসংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

শুভেন্দু ইমাম [সম্পা.] (২০১০), *শাহ আবদুল করিম পাঠ ও পাঠকৃতি*, বইপত্র, সিলেট।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১২), *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

সিরাজ উদ্দিন খান পাঠান-এর সঙ্গে কথা বলে গানটি পাওয়া যায়, তারিখ: ০৪ ডিসেম্বর ২০২০।

সুমনকুমার দাশ [সম্পা.] (২০১৭), *বাউলগানে বঙ্গবন্ধু*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

সংগ্রহ: গিয়াসউদ্দিন আহমেদ পুত্র মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন রনি। তারিখ ০১ ডিসেম্বর ২০২০।

রুদ্রমঙ্গল
মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা ॥ ১৪২৭-১৪২৮ ॥ ২০২০-২০২১ ॥ ISSN 2415-4695
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্গবন্ধুর "সোনার বাংলা": জাতীয় সংগীত প্রসঙ্গ

ফজলে এলাহি চৌধুরী*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বেশকিছু স্বদেশপ্রেমমূলক গান লিখেছিলেন, যার অন্যতম "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" গানটি। এই গান বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ববর্তী বিভিন্ন সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল আমাদের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক জীবনে। ফলে, এ গান জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেয়েছিল। তবে, দীর্ঘ এ গানের সংক্ষেপিত বাণীতে সেই সুরটিই গৃহীত হয়েছিল, যা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিপাগল বাঙালিরা গাইতে গাইতে এদেশের স্বাধীনতা এনেছিলেন। ফলে, রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে সুরগত ঈষৎ পার্থক্য তৈরি হয়েছিল এবং তা কেবল "রবীন্দ্রসংগীত" হয়ে থাকেনি। কী রয়েছে এই গানের বাণী বা পরিবর্তিত সুরের মহিমায় তা চিহ্নিত করা এবং কী করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সোনার বাংলা" জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "সোনার বাংলার" সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হয়ে উঠল, তা দেখানো এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। আমরা দেখব, গানটির সুর বাউল অঙ্গ থেকে নেওয়া হলেও এর সুরে উত্তর ভারতীয় ঝিঁঝিট রাগের চলনের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে, যা মূল বাউল গানটির স্থায়ী অংশে ছিল না। বাউল গানের সঙ্গে রবীন্দ্রগানের স্থায়ীতে কেবল একটি স্বরের শ্রুতির তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবধান ঘটেছিল, যা ঝিঁঝিটের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। আর, যুগপৎ দেখব, এই গানের সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের চর্চার সঙ্গে বাঙালিত্বের ভিত্তিগত একটি যোগ রয়েছে—বাঙালিত্বের কাঙাল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে কী করে এই গান বাঙালির প্রাণে চিরকালীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেল সেটাও আমরা চিহ্নিত করব।

ঔপনিবেশিক কালে, বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদটি কলকাতা-কেন্দ্রিক উচ্চশ্রেণির হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব হলেও তা পূর্ববাংলার পিছিয়ে-পড়া দরিদ্র বাঙালি হিন্দু-মুসলিমদের বিভেদের কারণ হয়নি। (মুনতাসীর মামুন ২০১৩ ক: ১২) ফলে,

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বঙ্গভঙ্গের বিষয়টি পূর্ববঙ্গে স্বাগতিত হয়েছিল।[১] কারণ, এ অঞ্চলবাসী মনে করেছিলেন, তাতে তাঁদের পশ্চাৎপদতা ঘুচবে। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সোনার বাংলা" আর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বাংলায় জন্মেছিলেন সেই "সোনার বাংলা"র সামাজিক বিভেদ ছিল। ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলেও তা ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ অবধি বিকশিত হয়েছিল উত্তর-ভারতীয় মুসলিমদের নেতৃত্বে। যে নেতৃত্ব বোঝাতে সক্ষম হয়, মুসলিমদের হীন অবস্থার দায় ব্রিটিশদের ও হিন্দুদের—বিশেষ করে কংগ্রেসের চক্রান্তের ফল। আর, এই বোধেরই ফসল হিসেবে "পাকিস্তান মানসিকতা" তৈরি হয়। ভারত বিভাজনের দায় মুসলিম লীগের একার নয়—নানান রাজনৈতিক কারণে অনিবার্য হয়ে ওঠে এই বিভাজন। আর এই বিভাজন-পরবর্তী সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কী করে বাঙালিদের ভালোবেসে তাঁর রাজনীতি ও জীবনকে অর্থবহ করে তুলেছিলেন তার পরিচয় আমরা পাই ১৯৫৫ সাল অবধি লিখিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*[২] গ্রন্থে। আর কতটা ত্রাসের ছিল তাঁর এই রাজনৈতিক কার্যক্রম পাকিস্তানিদের কাছে, তার দলিলও আমরা দেখতে পাবো তৎকালীন গোয়েন্দা সংস্থা আইবি সংরক্ষিত গোপন নথিতে, সম্প্রতি যা দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে—ক্রমে ১৪টি খণ্ডে[৩] প্রকাশিত হবে। বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধুর বিস্তারিত সম্পৃক্তি এই প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়, তবে কীভাবে রবীন্দ্রনাথের গান "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছায় এ দেশের জাতীয়

[১] ১৯০৫-এ যে বঙ্গভঙ্গ হয়, তাতে বৃহত্তর বাংলাকে ভেঙে দিয়ে একাধিক প্রদেশ বানানো হয়েছিল—বর্তমান ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যেমন অনেকগুলো রাজ্য আছে, সেইরকম। একই রাষ্ট্রের মধ্যে আলাদা প্রদেশ। আলাদা প্রদেশ শুধু, আলাদা দেশ তো নয়। এখন যেমন ভারতে এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে যাওয়া যায়, সেইরকমই সহজ থাকত ব্যাপারটা। প্রশাসনিক সুবিধার জন্যেই এটা করা হয়েছিল। কিন্তু এই আলাদা প্রদেশ করার বিরোধিতা শুরু হয়েছিল কলকাতা থেকেই। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী। এই আন্দোলন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এত তুঙ্গে ওঠে যে ইংরেজরা তা রদ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজরা বাংলা সম্পর্কে অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে যায়। ফলে, তার পাঁচ ছ' বছরের মধ্যেই তারা কলকাতা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যায় দিল্লিতে। এর ফল যেটা হলো, ভারত স্বাধীন হবার পর দিল্লিই যখন রাজধানী রইল, তখন তারা রাজধানীকেন্দ্রিক হিন্দি ভাষাটাকেই প্রায় রাষ্ট্রভাষার মতো চাপিয়ে দিতে চাইল সারা দেশের ওপর। রাজধানী কলকাতায় থাকলে বাংলা ভাষাটা হয়ত আরও আধিপত্য বিস্তার করতে পারত। সেক্ষেত্রে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, আসামের দক্ষিণাংশ ও বিহারের একটা বড়ো অংশের ভাষা বাংলা হওয়ায় বাংলা ভাষাভাষীরাই থাকত সংখ্যাগরিষ্ঠ। অজস্র সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলো কলকাতা এবং বাঙালিরা। এরপর ইংরেজরা বুঝে গেল যে, ধর্মের ভিত্তিতে এদের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে দিতে না পারলে এরাই আমাদের উপনিবেশ ভেঙে দেবে। ফলে তারা divide and rule নীতি অনুসরণ করল, যার অনিবার্য ফল হিসেবে পরে এল দেশভাগ। ওই বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা না করলে হয়ত এই উপমহাদেশের মানচিত্র অন্যরকম হতো। এবং বাঙালি ও বাংলা ভাষারও নানারকম উন্নতি হতো।

[২] দ্র. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, জুন ২০১২

[৩] দ্র. *SECRET DOCUMENTS OF INTELLIGENCE BRANCH ON FATHER OF THE NATION BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN,* Edited by Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister), Hakkani Publishers, Dhaka, volume 1 (1948-1950) & vol 2 (1950-1951)

সংগীত হলো তা বলতে গিয়ে কিছু রাজনৈতিক ঘটনা প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসবে। আর, এই জাতীয় সংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত ও মূল বাউল গানের সম্পর্ক, বিশেষ করে সুরগত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখব বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলার গভীর সম্পৃক্তি রয়েছে, কিছু ব্যবধানও রয়েছে যা যুগপৎ বাইরের ঘটনাগত এবং গানেরও অন্তর্গত বিষয়।

দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বঞ্চনা থাকত না, যদি প্রকৃত অর্থে পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিমরা শোষক না হয়ে নিষ্ঠাবান সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠত। তারা প্রকৃতপক্ষে শোষক ছিল বলেই তাদের চেতনায় ধর্মগত ঐক্যের কোনো বোধ কাজ করেনি, যদিও ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে তারা টুকরো করেছিল। ফলে, এই শোষণের বেদনা বইতে হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কেবল পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষী ও বাঙালিসংস্কৃতিসমৃদ্ধ সাধারণ মানুষকে। আর তাই ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিরাষ্ট্র গঠনে ধর্মসহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য মূল ব্যাপার হিসেবে কাজ করেছিল। তবে, এদেশের বাঙালিদের একটা অংশের চেতনায় ধর্মীয় উন্মাদনার বীজ গভীরভাবে উপ্ত ছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যখনই এবং যতবারই সেই অংশটির রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের সুযোগ ঘটেছে, তখনই এবং ততবারই এই জাতিরাষ্ট্রের যাত্রা ঘটেছে পাকিস্তানের দিকে এবং প্রতিবারই সেই যাত্রায় প্রতিবন্ধক ছিল রবীন্দ্রনাথের গান যা বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে প্রবলভাবে সম্পর্কিত। কারণ, বাঙালি মানস, বাঙালি সংস্কৃতিই বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্তঃসার—যার ভিত্তিভূমিতে রয়েছে বাংলা ভাষা আর "বাংলা" বলে অভিহিত একটি স্থাননাম। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময় থেকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমাদের মুক্তির সংগ্রামে কী করে রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালির মুক্তির সঙ্গে জড়িয়ে অনিবার্য হয়ে উঠল, আর কী করেই-বা স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালিত্বের চেতনার অবনমনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও দমিত করা হলো তা আমরা লক্ষ করব।

আমরা জানি, দেশভাগের পর "'পূর্ব বাংলা' নাম মুছে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম আমাদের কপালে সেঁটে দেবার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানে"। (সন্‌জীদা খাতুন ২০০৪: ১৪৪) পাকিস্তানিরা বুঝতে পারেনি, মানুষ সব বিস্মৃত হলেও প্রাণপণে ভাষা ও সংগীতকে যুগপৎ আগলে রাখতে চায়। অধিকন্তু ওরা ভুলে গিয়েছিল—প্রকৃত বাঙালি আত্মবিস্মৃত নয়, সাংস্কৃতিক ঐক্য দিয়ে বাঙালি যেকোনো অবমাননার প্রতিকার করতে জানে। উগ্রবাদীদের প্রথম আঘাতটা ভাষার ওপরই আসে, আর সেই সূত্র ধরেই আমাদের স্বাধীনতার অভিযাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ-ভাগ হলে প্রথমবার বাংলা ভাষার ওপর আঘাত আসে ১৯৫২ সালে। আর, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে তৎকালীন শাসক আইয়ুব খান চেয়েছিলেন বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণ করতে। ফলে, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয় দফা বাংলা ভাষার ওপর আঘাত এল। ১৯৬১ সালে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পীড়নের মধ্যে

সংস্কৃতিকর্মীগণ রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান নিয়ে সংগ্রামে ফিরে এলেন। প্রবল ঝুঁকির মধ্যে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পালিত হলো। যেন কণ্ঠ চেনা না যায়, গলায় রুমাল দিয়ে সন্‌জীদা খাতুনকে একটি অনুষ্ঠানে গাইতে হয়েছিল। (সন্‌জীদা খাতুন "যাত্রাপথের আরো কিছু কথা", ২০০৪: ১২৬) যদিও বাঙালি সংস্কৃতি মানে কেবল রবীন্দ্রনাথের গান নয়, তবুও এ সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হাতিয়ার হিসেবে এ গান তখন কাজ করেছিল। ওই সময় "দৈনিক আজাদ" পত্রিকায় রবীন্দ্রবিরোধিতার ব্যাপক নিদর্শন আমরা পাই, যাতে "সোনার বাংলা"কে সাম্প্রদায়িক আচ্ছাদনে ঢেকে দেবার প্রবণতা লক্ষ করা যায়—

> রবীন্দ্রনাথের দোহাই পাড়িয়া অখণ্ড বাংলার আড়ালে আমাদের তামদ্দুনিক জীবনে বিভেদ ডাকিয়া আনার সুযোগ দেওয়া চলিবে না। একদল লোক বাংলা সাহিত্যের অন্ধ অনুসারী ও ভক্ত। তাদের রবীন্দ্র ভক্তি বিপদের কারণ হইতে পারে এবং বাইরের যারা পাকিস্তানকে দ্বিধাহীনমনে গ্রহণ করে নাই, তারা এই সুযোগ তামদ্দুনিক অনুপ্রবেশের খেলায় নামিতে পারে। [১ বৈশাখ]
>
> রবীন্দ্রনাথ 'তখনও হিন্দু-ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ...পাকিস্তান ও ইহার আদর্শে বড় বিরোধী ছিলেন। ...বিপ্লবী সরকারের [আইয়ুব সরকার] তৎপরতার সম্মুখে এই ছদ্মবেশী মুক্ত বাংলার ষড়যন্ত্র আবার কিভাবে মাথা তুলিয়া খাড়া হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।' [১২ বৈশাখ]
>
> অবিভক্ত বাংলায়ও মুছলমান রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জাতীয় কবি বা আশা ও ভাষার কবি বলিয়া গ্রহণ করে নাই। রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যে ধারার অনুসারী, সে ধারার সঙ্গে মুছলমানদের নাড়ীর যোগ সেদিনও ছিল না। [১৪ বৈশাখ]
>
> পাকিস্তানের ইসলাম-ভিত্তিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করর উদ্দেশ্যে অখণ্ড ভারত ও রামরাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে চালু করার জন্য একশ্রেণীর তথাকথিত সংস্কৃতি সেবী প্রদেশব্যাপী যে সাংস্কৃতিক অপচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে, এই সভা তাহাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে। [৮ মে ১৯৬১]
>
> (উদ্ধৃত, মুনতাসির মামুন ২০১৩ ক: ২১–২২)

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সাংস্কৃতিক জাগরণ তৈরি হয়েছিল, তারই প্রবল অভিক্ষেপ দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ করে। সেনাশাসনের বিরুদ্ধে প্রবল সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ তৈরি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই। ওয়াহিদুল হকের মতে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-অর্জনের পথে তিনটি বড়ো ঘটনা—রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও একষট্টির রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী। সেনাশাসনের রক্তচক্ষুকে কেবল নয়, পাকিস্তানকে চ্যালেঞ্জ করে এগারো দিন জুড়ে ঢাকায় উদ্‌যাপিত হয়েছিল রবীন্দ্র জয়ন্তী শতবার্ষিকী—তিনশো গান, চারটি নৃত্যনাট্য, চারটি নাটক ও নানাবিধ প্রদর্শনীর মাধ্যমে। সারাদেশ এই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের বার্তা তুলে নিয়েছিল, আইয়ুব শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক আঘাত পাকিস্তান কখনোই সামলে উঠতে পারেনি। এই দ্রোহকে জ্বালিয়ে রাখতে তাঁরা "ছায়ানট" নামের পেছনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন। (ওয়াহিদুল হক ১৪১৪: ১৪) এভাবে, "রবীন্দ্রনাথ" বাঙালি

সংস্কৃতির সমার্থক হয়ে উঠেছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত তাদের দোসরদের কাছে। ফলে, বাঙালিদের দমনের উপায় হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে দমনের বাসনাও জেগে উঠেছিল।

বাঙালিদেরকে তো "দাবায়ে" রাখা সহজ নয়। পাক-ভারত যুদ্ধকালীন [১৯৬৫] অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের বাঁচার দাবি হিসেবে ছয় দফা নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিব হাজির হন। ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে নেজামই ইসলামী নেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে বিরোধী দলের এক বৈঠকে ছয় দফা উত্থাপন করতে চাইলে বাধা আসে। শেখ মুজিব বৈঠক ত্যাগ করে লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বাঙালির মুক্তির সনদ ঘোষণা করেন। ছয় দফা নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যেও অন্তর্বিরোধ ছিল, আর অনেক নেতা এ সম্পর্কে আগেভাগে জানতেন না কিছুই। ফলে, দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই স্বায়ত্তশাসনের বাসনা, "সোনার বাংলা" স্বাধীন করবার বীজ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বঙ্গবন্ধু বাঙালির সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার যোগ্যতম মুখপাত্রে পরিণত হন। আর, বাঙালি এবং বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে সমার্থক হয়ে ওঠে। ফলে, শেখ মুজিবকে দমন ও গ্রেফতার করা জরুরি হয়ে পড়ে পাকিস্তান সরকারের কাছে। শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হলে ৬ দফা আন্দোলন বাঙালি সিভিল সমাজের একমাত্র আন্দোলন হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনে শামিল হতে সাংস্কৃতিক কর্মীরা নেমে আসে পথে। রবীন্দ্রনাথ আবারও ফিরে আসেন এবং প্রবলভাবে ফিরে আসেন[৪]। (মুনতাসির মামুন ২০১৩ ক: ২৮)

আর, তখন পাকিস্তান সরকার খড়গহস্ত হন, নিষিদ্ধ করেন পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথের গান।[৫] এর প্রতিবাদ করেন সংস্কৃতিমান বাঙালি। তখন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিবৃতি দেওয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচার হিসেবে পরিগণিত হবে এমন অভিমত ব্যক্ত করেন ঢাকায় বসবাসকারী পশ্চিম পাকিস্তানি বিশিষ্ট দোসররা। অধিকন্তু, ৪০ জন তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সেই অপমত সমর্থন করে বিবৃতি দেন। শিল্পী কামরুল হাসান এই চল্লিশজনকে আলীবাবার "চল্লিশ চোর" হিসেবে অভিহিত করেছিলেন, যাদের অধিকাংশই পরবর্তী সময়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। (মুনতাসির মামুন ২০১৩ ক: ৩১) "রবীন্দ্রসংগীত" এদেশে গান হিসেবে যাথার্থ্য পাবার আগেই স্বাধীনতা-

৪ একই রকমভাবে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানেও ফিরে এসেছিল রবীন্দ্রনাথের গান। "জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব" ধ্বনিতে রাজপথ যখন মিছিলে টালমাটাল, তখন তার সঙ্গে "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো" থেকে নেওয়া, "জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো"ও ধ্বনিত হয়েছিল। (ওয়াহিদুল হক "সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ, রাষ্ট্রিক উত্থান, রবীন্দ্রনাথ", ১৪১৪: ২২১)

৫ ২৪ জুন ১৯৬৭, দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় প্রকাশিত খবর মোতাবেক "কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন গতকাল জাতীয় পরিষদে বলেন যে, ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান প্রচার করা হবে না এবং এ ধরনের অন্যান্য গানের প্রচারও কমিয়ে দেওয়া হবে।" (মুনতাসীর মামুন ২০১৩ ক: ২৯)

পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির জীবন সংগ্রামে প্রবলভাবে উপস্থিত হয়েছিল, যা বাঙালিদের জন্য অগৌরবের নয়, বরং পরম শ্লাঘার আকর। (ওয়াহিদুল হক ১৯৮৫: ৮৩) আর এই বিস্তৃত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রামের বেদনার-সুষমা ও গৌরব বেয়ে ক্রমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ের গান আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে নিঃসংশয়ে জাতীয় সংগীত হয়ে উঠেছিল। এখন, বিশ্লেষণ করবার বিষয়, কী ছিল রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা" গানে, আর সংগ্রামী বাঙালির স্বভাব-শিল্পিতায় তা কী রূপ পরিগ্রহ করে "জাতীয় সংগীত" হয়ে উঠল সেই গান তা যাচাই করা যেতে পারে।

২.

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ৭ আগস্ট ১৯০৫ কলকাতার টাউন হলে যে সভা হয়, সেই সভা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের নতুন গান—"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি"। "কুষ্টিয়া অঞ্চলের কোনো ডাকঘরের গগন হরকরা রচিত 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' গানের সুর 'আমার সোনার বাংলা'তে আরোপ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ"। (উদ্ধৃত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪১০: ১০৮) "১৯৭১ সালে 'বাংলাদেশ' স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক প্রথম দশ পঙ্‌ক্তি 'জাতীয়-সঙ্গীত' রূপে স্বীকৃতি লাভ করে"। (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪১০: ১০৮)

নিতাই বসু জানিয়েছেন:

> ...রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন্দ্রনাথ-সহ সপরিবারে শিলাইদহে বোটে থাকতেন তখন ওদের বোটে প্রত্যহ গ্রাম্য-গাইয়েদের আমদানি হত। এমনই এক অল্পবয়সী মুসলমান গাইয়ে সুনা-উল্লার কণ্ঠে গগন হরকরার যে গানটি শুনে রবীন্দ্রনাথ এই গানটি লিখতে প্রেরণা পান, সেটির প্রথম স্তবকটি হল—
>
> আমি কোথায় পাব তারে
> আমার মনের মানুষ যে রে
> হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দিশে
> দেশ বিদেশে,
> আমি দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে—
>
> (নিতাই বসু ১৩৯৭: ১৮০)

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে আমরা যে গানটি[৬] গেয়ে থাকি তার সুর বিশ্লেষণ করলে সেই গানের মধ্যে ঝিঁঝিট রাগের চলন পাওয়া যায়। ঝিঁঝিট রাগের স্বরূপ আলোচনা করে আমরা এই সম্পর্কসূত্রটি অনুসন্ধান ও যাচাই করতে পারি—

রাগ: ঝিঁঝিট

আরোহ: সা রা গা মা পা ধা ণা র্সা

অবরোহ : র্সা ণা ধা পা মা গা রা সা (বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে ১৪১৩: ২৪১)

জাতি: সম্পূর্ণ; বাদি: গান্ধার; সমবাদি: নিষাদ; সময়: রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

৬ পরিশিষ্টে 'ছায়ানট' থেকে প্রাপ্ত আমাদের জাতীয় সংগীতের সুর সংযুক্ত রয়েছে

চলন : সা রা গা -া, সা রা মা গা, পা -া মা পা মা গা রা সা ণ্া ধ্া প্া ধ্া সা -া, রা মা পা, রা মা পা ধা ণা ধা পা, পা ধা ণা পা ধা র্সা, র্রা -া ণা ধা পা ধা মা গা রা মা গা, মা গা রা সা ণ্া ধ্া প্া সা।

গানটির স্থায়ী অংশের 'চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি' এই অংশটির সুর ঝিঁঝিট রাগের চলনের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়—

সা | সা সা -া I রমা মা -া | পা পা -া I
চি র দি ন্ তো০ মা র্ আ কা ০
I -া -া সা | সা সা -া I রমা মা -া | পা পা -মা I
০ শ্ চি র দি ন্ তো০ মা র্ আ কা শ্
I পা পা -ধণা | ধা পা -মা I পা পা -ধণা | ণ্ধা পা -া I
তো মা ০র্ বা তা স্ আ মা ০র্ প্রা ণে ০
I -া -া -া | -া ণ্র্সা র্সর্রা I ণ্র্সা ণা -া | ণ্ধা পাঃ ধঃ I
০ ০ ০ ০ ও মা০ আ মা র্ প্রা ণে ০
I মপা ম্গা -া | মা গমা -পা I I [৭]
বা০ জা য় বাঁ শি০ ০

উপরের স্বরবিন্যাসে লক্ষ করা যায়, ঝিঁঝিটের নিম্নলিখিত চলনের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে– মা পা ধা ণা ধা পা, র্সা ণা ধা পা ধা মা গা রা মা গা রা মা গা, মা গা রা সা ণ্া ধ্া প্া ধ্া সা।

অন্তরা অংশে তার-সপ্তকে ঋষভের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়, যা ঝিঁঝিট রাগের সঙ্গে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ—

I র্সা র্সা র্রর্গা | র্রা র্সা -র্রর্সা I[৮]
আ মে ০র্ ব নে ০০

সঞ্চারিতে "কী শোভা কী ছায়া গো"র "ছায়া" অংশের সুরে যেভাবে "খটকা"[৯] ব্যবহার করা হয়েছে, সেরকম খটকা ঝিঁঝিটের বন্দিশে অহরহ শুনতে পাওয়া যায়—

I ণ্া -া -সা | স্রসা ণ্ধ্া -া I -া -া
কী ০ ছা য়া০ গো০ ০ ০ ০

সঞ্চারির "কী আঁচল" অংশে খটকার ব্যবহার রয়েছে যা ঝিঁঝিট সম্পর্কিত—

গমা| গ্মগা স্রসা -রা I[১০]
কী০ আঁ চ ল্

৭ দ্র. পরিশিষ্ট, 'ছায়ানট' থেকে প্রাপ্ত সাম্প্রতিক জাতীয় সংগীতের স্বরলিপির প্রতিলিপি।
৮ দ্র. পরিশিষ্ট।
৯ মূল স্বরে নিম্নস্বরের গমকযুক্ত স্পর্শ।
১০ দ্র. পরিশিষ্ট।

আভোগে আমরা দেখি ঝিঁঝিট রাগের চলনের সঙ্গে সম্পর্কিত রা গা সা, মা গা রা সা-া, পা মা গা রা গা সা, ধা সা—এই সঙ্গতিগুলি পাওয়া যায়।

ঝিঁঝিট রাগের চলনের সঙ্গে গানটির গঠনের সম্পর্ক পাওয়া যায়। লোকসংগীতের পরিশীলিত রূপ ভারতীয় রাগসংগীত। প্রচলিত বাউল সুরের ধুনকে সংস্কার করে পরবর্তী সময়ে "ঝিঁঝিট", "ভূপালি", "খাম্বাজ", "ভৈরব", "কাফি", "কল্যাণ" এমন নানান রাগ আমরা পাই। দেশি সংগীত বা লোকজ ধুন বিবর্তিত হয়ে, পরিশীলিত পরিমার্জিত রূপ নিয়ে রাগসংগীত হয়েছে। এই অনিবার্য যোগের প্রতিফলন আমরা এই গানের সুরের বিশ্লেষণে পাই। গগন হরকরার গাওয়া বাউল গানের স্থায়ী অংশে "মনের মানুষ যে রে"-র শেষাংশের সুরে শুদ্ধ নিষাদ রয়েছে (প্রফুল্লকুমার দাস ১৩৬৯: ৮৬-৭৯), রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের স্থায়ী অংশে 'ভালোবাসি'-র শেষাংশের সুরে কোমল নিষাদ ব্যবহার করেছেন। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৬২: ১০; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৬২: ৮৭; পরিশিষ্ট)[১১] রবীন্দ্রনাথকৃত এমন পরিবর্তনের কারণে তা ঝিঁঝিটের কাছাকাছি পৌঁছেছে। একটি স্বরের শ্রুতিগত এ পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাঙা গানে না করলে এই লক্ষণটি গানটির শুরুতেই পাওয়া সম্ভব ছিল না। মূল গানের অন্তরাতে কোমল নিষাদের ব্যবহার পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের গানে অন্তরার প্রথমাংশে শুদ্ধ নিষাদের ব্যবহার থাকলেও "অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে" অংশের সুরে কোমল নিষাদের ব্যবহার রয়েছে। আভোগের সুরেও নিষাদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তরার অনুরূপ বিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়। আর, সঞ্চারীর সম্পূর্ণ অংশেই রবীন্দ্রনাথ কোমল নিষাদ ব্যবহার করেছেন। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৬২: ১০-১২; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৬২: ৮৭–৮৯; পরিশিষ্ট)

আর, রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানের সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংগীতের সুরের কিছু ব্যবধান লক্ষ করবার মতো[১২]। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের গানে স্বরের অর্ধমাত্রা জাতীয় সংগীতে এসে কখনো-বা একমাত্রার মর্যাদা পেয়েছে। কখনো কখনো উলটোটা ঘটেছে। গানের স্থায়ীতেই এমন নমুনা পাওয়া যাবে। স্পর্শ স্বরের

১১ প্রথম সুরটি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ইন্দিরাদেবী করেছিলেন, যা *স্বরবিতান* ষট্‌চত্বারিংশ খণ্ডের শুরুতে রয়েছে। দ্বিতীয়টি সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া রেকর্ড অনুসারে ১৩৭৮ সনে শান্তিদেব ঘোষ করেছিলেন, সেটিও ওই স্বরবিতানের শেষে যুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় স্বরলিপিটি আমাদের জাতীয় সংগীতের সুর হিসেবে পরিশিষ্টে সংযুক্ত রয়েছে। 'আমার সোনার বাংলা' গানের সুর প্রসঙ্গে বলা কথাগুলি তিনটি সুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১২ "বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে "আমার সোনার বাংলা"-র সুর আর স্বরলিপি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। তখন ক্যাবিনেট ডিভিশনের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু রায় দেন, যে সুর গেয়ে দেশকে স্বাধীন করা হয়েছে, তাই আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের সুর। ঘটনা এই যে, সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া রেকর্ড থেকে যে সুর শুনে শিল্পীরা গানটি তুলেছিলেন, সেই সুর থেকে নিজেরাই খানিকটা সরে যান। আর সেই সুরই গাওয়া হয়ে আসছে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল থেকে এ পর্যন্ত।
বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত আমাদের ভুলের অপরাধকে মুছে দিয়েছিল। আজও সেই সুরে "আমার সোনার বাংলা" গেয়ে চলেছি আমরা।" (সন্‌জীদা খাতুন "সোনার বাংলা", ১৪১৬: ২২৮)

ব্যবহার ঘটেছে কখনো-বা, যা জাতীয় সংগীতকে আরও আবেগঘন করেছে, যেমন 'কী আঁচল বিছায়েছ' অংশে। স্বরান্তরে যাবার প্রবণতাও রয়েছে। আবার, ছোটো-ছোটো মীড়ের ব্যবহার[১৩] রয়েছে আমাদের জাতীয় সংগীতে, যা ইন্দিরাদেবীকৃত রবীন্দ্রসংগীতের সুরে ছিল না। বাউল গানের ঢং বা কীর্তনের মুড়কি রবীন্দ্রসংগীতে ছিল না—খাড়া খাড়া স্বরের ব্যবহার ছিল তাতে, যা আমাদের জাতীয় সংগীতে রয়েছে[১৪]। আর এসবই করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানকে ভালোবেসে, তাঁর গানকে অনিবার্য শক্তি হিসেবে জড়িয়ে নিয়ে ইতিহাসের অংশ করবার অভিপ্রায়ে।

৩.

আমরা জানি, অখণ্ড ভারতবর্ষে দেশাত্মবোধক ভাবনার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল "বন্দে মাতরম্" গানটি। সে গানটি সকল ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে জাতীয় সংগীত হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাধা আছে, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো দ্বিধা ছিল না—"... ভারতবর্ষের ন্যাশনাল গান এমন কোনো গান হওয়া উচিত যাতে একা হিন্দু নয় কিন্তু মুসলমান, খ্রীস্টান—এমন কি ব্রাহ্মণও শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগ দিতে পারে। (উদ্ধৃত, আলপনা রায় ১৪১৩: ভূমিকাংশ ৩১) আমরা জানি, এমনকী 'বিজয়া' নিতান্ত হিন্দুদের একটি সামাজিক অনুষ্ঠান হলেও রবীন্দ্রনাথ তাতে 'অনন্ত সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছে' তাকেও সম্ভাষণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।" (প্রশান্তকুমার পাল ১৩৯৭: ২৬৪) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় ন-বছর পর ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতীয় সংগীতরূপে স্বীকৃত হলো রবীন্দ্রনাথের রচিত "জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা"। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী সময়ে জওহরলাল নেহরু তাঁর স্মৃতিচারণ করেন, যেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নতুন ভারতের জন্যে 'National Anthem' রচনা করতে অনুরোধ করেন। আর তখন থেকেই জাতীয় সংগীত কথাটি "National Anthem" অর্থে স্বীকৃত হয়। (উদ্ধৃত, আলপনা রায় ১৪১৩: ভূমিকাংশ ৩৩) এর আগে যেকোনো দেশাত্মবোধক গানই জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত ছিল। রবীন্দ্রনাথের গীতসংকলনে এই শ্রেণির গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে চিহ্নিত হতে দেখি। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গান থেকে বাঙালি যে অনুভবের ভাষা পেয়েছিল, সে ভাষাকে ধরে রেখেছিল পরবর্তী সময়ে বিভাজিত ভারতের পূর্ববঙ্গের পীড়িত জনগোষ্ঠী। রবীন্দ্রনাথের গান জাতীয় সংগীত হয়ে ওঠার বিষয়ের সঙ্গে প্রবল আবেগ ও রাজনৈতিক বোধন জড়িত হয়ে পড়েছিল। সন্‌জীদা খাতুন এ গান সম্পর্কে জানিয়েছেন—

১৩ সুচিত্রা মিত্রের রেকর্ড শুনে শান্তিদেব ঘোষের করা স্বরলিপিতে এই মীড়ের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু ওই সময়ে স্বরলিপি দেখে গান শিখবার ব্যাপারটি ছিল না, এবং সুচিত্রা মিত্রের রেকর্ডটি শিখবার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল তাই সুচিত্রার গায়নে মীড় দেবার প্রবণতা আমাদেরকে প্রভাবিত করেছে। যদিও আমাদের জাতীয় সংগীতের সুর এবং সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া সুর তুলনা করলে মীড় ব্যবহারে অনুরূপতা খুব কম পাওয়া যায়।

১৪ স্থায়ী অংশে "ভালোবাসি"র শেষাংশের সুরে বাউল গানের মুড়কি খুবই স্পষ্ট। দ্র. পরিশিষ্ট।

> ১৯৫৭ সালের প্রথমার্ধে ঢাকাতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতাসুদ্ধ প্রাদেশিক নেতাদের এক বৈঠক হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যে কার্জন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সে সভায় আমার গান গাইবার কথা ছিল। সেই সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে "আমার সোনার বাংলা" গানটি গাইতে অনুরোধ পাঠান। এর তাৎপর্য তখন বুঝিনি, আজ বুঝতে পারি। সেদিন পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের কাছে 'সোনার বাংলা' বিষয়ে বাঙালির আবেগ-অনুভূতি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন এদেশের নেতা। এর কিছুদিন আগে ২৩ মার্চ পূর্ববঙ্গের নাম পূর্বপাকিস্তান করে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়েছিল। আঞ্চলিক স্বাধীনতার জন্যে উত্তাল আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু সবসময় জাহিদুর রহিমকে এই গান গাইবার জন্যে খবর পাঠাতেন। রেসকোর্সের ময়দানে তাঁর সভাতে জাহিদ যে কতবার "আমার সোনার বাংলা" গেয়েছে! এ গানের আবেগ বাঙালিকে আমূল নাড়া দিয়েছে। পাকিস্তানি বিরূপ প্রচারণা রবীন্দ্রসঙ্গীত আর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে দ্বিধাগ্রস্ত করে রেখেছিল। জনপ্রিয় নেতার বাঙালি স্বার্থ সংরক্ষণমূলক বক্তৃতার সঙ্গে এই বাংলাপ্রীতির গান সকল মানুষকে অনেকভাবে আকর্ষণ করল। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাই মাঠের রাখালও স্বতঃস্ফূর্তভাবে "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" গেয়ে উঠেছে।
>
> (সন্‌জীদা খাতুন "আমার সোনার বাংলা" ১৪১৬: ২২৮)

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে জাহিদুর রহিম ও ফাহমিদা খাতুন মিলে ঊনসত্তর ও সত্তরে দেশের সর্বত্র 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'—১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী গানটি গেয়ে বাঙালির ভিতরে দেশপ্রাণতা সঞ্চার করবার অপূর্ব অভিযান চালায়। (ওয়াহিদুল হক "রবীন্দ্রগীতির মুক্তি" ১৪১৪: ২১৪)[১৫] স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সামাজিক-রাজনৈতিক বর্বরতা আর, মুক্তিযুদ্ধকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদারদের পীড়ন গণহত্যাকেও হার মানিয়েছিল। উল্লসিত জল্লাদদের পরাস্ত করে বেদনাহত বিধ্বস্ত বাঙালির মনে নতুন এক স্বদেশ গড়বার স্বপ্ন দানা বেঁধেছিল। যেখানে বড়ো হয়ে উঠেছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর সাংস্কৃতিক ঐক্য। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তান সরকারের কাছে অবরুদ্ধ শেখ মুজিব ইসলামাবাদ থেকে মুক্তি পেলেন ৮ জানুয়ারি ১৯৭২। স্বাধীন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সফরসঙ্গী ছিলেন ভারতীয় কর্মকর্তা শশাঙ্ক এস. ব্যানার্জি। তাঁর উদ্ধৃত স্মৃতিকথায়ও এ গানের আবেগঘন সম্পৃক্তি উঠে আসে—

> সাইপ্রাসের আক্রোতিরিতে ব্রিটেনের বিমান ঘাঁটিতে তেল ভরা হলো কমেট জেটে। তারপর ওমান। ব্যানার্জি দেখলেন, বঙ্গবন্ধু বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে গাইতে লাগলেন—'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' ব্যানর্জিকে বললেন, গলা মেলাতে। প্রথমবারেরটা হলো রিহার্সেলের মতো। দ্বিতীয়বার আবেগে ভরা। বঙ্গবন্ধুর চোখ সজল।
>
> আবার দু'জনে বসলে বঙ্গবন্ধু ব্যানার্জিকে নিচু গলায় বললেন, তিনি চান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হবে আমার 'সোনার বাংলা'। বঙ্গবন্ধু বললেন, বিষয়টা জানলাম আমি আর আপনি। (উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন ২০১৩ খ: ৬৭)

১৫ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের প্রাক্কালেও গানটি গাওয়া হয়েছিল। মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানেও এ গান গাওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে গানটি আমাদের যৌথজীবনচেতনা সঞ্চার করতে নিয়মিত প্রচারিত হতো।

"রবীন্দ্রগীতি এবারে পেয়ে যায় একটা অভাবিত মাত্রা। এক ধরনের মুক্তিই বটে। কেবল যে তাঁর গান ছড়াল জনারণ্যে তা নয়। মানব-মুক্তির হাতিয়ার হল তা, রাজনৈতিক সম্মুখ সমরে। কোন কোন লেখক বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কেতনে আঁকা ছিল রবীন্দ্র-আলেখ্য। সঙ্গতভাবেই বাংলাদেশকে আর রাষ্ট্রের জন্য জাতীয় সঙ্গীত খুঁজতে হয় না। মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি প্লাটুন, সেকশন, লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে যে গান গেয়েছে, সেই "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" গ্রহণ করতে, গৌরবদান করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দেরি হয় না।" (ওয়াহিদুল হক ১৪১৪: ২১০) ফলে, প্রকৃতিগতভাবে, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে এই গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচিত হয়। যেই গানের বাণীতে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ বাংলার ব্যাপ্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যের সীমাহীন রূপের কথা বলা আছে। আর, আছে স্বদেশকে ভালোবাসার কথা, স্বদেশের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সংযোগের কথা। যে স্বদেশে মায়ের মুখ সঞ্চারিত। যে ভূখণ্ড মায়ের মতো কথা বলে ওঠে—সুধার মতো লাগে তাঁর মুখের বাণী। আর, যাঁর মুখাবয়ব মলিন হলে নয়নজলে আমরা ভেসে যেতে থাকি। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮০: ২৪৩) যে গান শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে; বাঙালির প্রকৃত চোখ হৃদয়ের জলে ভিজে যায়—নিজেকে সংবরণ করা বড়ো দুরূহ হয়ে পড়ে।

"বাংলা" কথাটির যেমন দ্বিধারিক অর্থ রয়েছে, তেমনই স্বদেশপ্রেমেও "স্বজাতি" ও "স্বদেশ"—এই দ্বিবিধ চেতনা কাজ করে। ভূখণ্ডের নামের সঙ্গে এমন সংস্কৃতিগত সমাপতন খুবই বিরল ব্যাপার। বঙ্গভঙ্গ আদেশের অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবোধ একজন কবির। আর, পরবর্তী সময়ে বাঙালি সংস্কৃতিসমেত পূর্ববাংলাকে মুক্ত করবার অভিপ্রায়ে যে স্বদেশবোধ বঙ্গবন্ধুর ছিল তা একজন রাজনীতিজ্ঞের। আত্মবোধদীপ্ত দেশপ্রেমিক দু-জনের আত্মপ্রত্যয়ের যাত্রা দুইরকমের। চেতনাগত ঐক্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধুর জেগে-ওঠা স্বদেশ ও বেদনা এক নয়। তবু, আমরা লক্ষ করি বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আগে বঙ্গবন্ধুর ওপর আঘাত, তাঁর বন্দিদশা সমগ্র বাঙালির ওপর আঘাতের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে সাংস্কৃতিক জাগরণকে দমাতে রবীন্দ্রনাথকেও দমিত করা হয়েছিল, কারণ, রবীন্দ্রনাথও পাকিস্তানিদের কাছে বাঙালির সাংস্কৃতিক সত্তারই অংশ হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে, স্বাধীন বাংলাদেশেও বাঙালি সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে পাকিস্তানের পথে যাত্রাকালে বঙ্গবন্ধুকে মুছে দেবার অপবাসনা আমরা লক্ষ করেছি। পাঠ্যপুস্তক থেকে বঙ্গবন্ধু অপসারিত ছিলেন, তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের মহাকাব্যিক ভাষণটিও গোপন ছিল। এমনকী নব্বুইয়ের দশকের শুরুতে তৎকালীন সরকারপন্থি বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় সংগীতকে বদলে দেবার বাসনাও ব্যক্ত করেছিলেন। এভাবে দুই সময়ের দুই ভিন্ন স্বভাবের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধুকে বাঙালিত্বের অনুকূল বিবেচনা করে সমার্থক করে তুলেছিলেন বাংলাদেশের শাসকগণ, যেমনটি করেছিল পাকিস্তানি শাসকরা। আমরা লক্ষ করি, পাকিস্তান থেকে মুক্ত হবার ঠিক পরপর, স্বাধীনতার কালে বাঙালির মুখের ভাষা

এবং পোশাক যেমনটি ছিল, সাম্প্রতিক সময়ে তেমনটি আর নেই। এর বিচ্যুতির কারণ, নতুন কোনো ভূখণ্ড যখন নতুন কোনো অনুপ্রেরণায় জেগে ওঠে, তখন তা যে তীব্রতা নিয়ে সমাজের মধ্যে অবস্থান করে, সময় যত যায় সেই তীব্রতা ক্রমে ফিকে হতে থাকে। অধিকন্তু, রাজনৈতিক পালাবদলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যখন সাংবিধানিকভাবে মুছে ফেলা হয়, স্বাধীনতাবিরোধীরা রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসীন হয়, তখন মুক্তিযুদ্ধের "অসাম্প্রদায়িক চেতনা" আরো ক্ষয়ে যেতে থাকে রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিপোষকতায়। আশার কথা যে, সাংস্কৃতিক জাগরণ ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বাঙালি আবার ফিরে পেতে পারে নিজস্ব অনুভাবের ভাষা, যেমনটি পেয়েছিল জাতির দুঃসময়ে রবীন্দ্রনাথের গানে। ইতিহাসচেতনার মধ্য দিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা বাহিত হলে তবেই জেগে উঠবে বঙ্গবন্ধুর "সোনার বাংলা"—যেখানে রবীন্দ্রনাথ কোনো-না-কোনো ভাবে "সোনার বাংলা"রই সমার্থক হয়ে থাকবেন।

তথ্যসূত্র

আলপনা রায় (মাঘ ১৪১৩), *রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ওয়াহিদুল হক (নভেম্বর ১৯৮৫), *চেতনাধারায় এসো*, মুক্তধারা, ঢাকা।

ওয়াহিদুল হক (২ চৈত্র ১৪১৪), *প্রবন্ধ-সংগ্রহ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

নিতাই বসু (১৩৯৭), *রবীন্দ্রসংগীতের উৎস সন্ধানে*, সাহিত্যায়ন, কলকাতা।

প্রফুল্লকুমার দাস (১৩৬৯), *রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ* (দ্বিতীয় খণ্ড), জিজ্ঞাসা পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (দ্বি. সং. পৌষ ১৪১০), *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী*, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

প্রশান্তকুমার পাল (১ বৈশাখ ১৩৯৭), *রবিজীবনী* পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে (তৃতীয় সং. মাঘ ১৪১৩), *হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি* (ধরিত্রী রায় অসীম চট্টোপাধ্যায় সম্পা.), দীপায়ন, কলকাতা।

মুনতাসীর মামুন (২০১৩ ক), *রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আমাদের হলেন*, সুবর্ণ, ঢাকা।

মুনতাসীর মামুন (২০১৩ খ), *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৌষ ১৩৬২), *স্বরবিতান* ষট্‌চত্বারিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৌষ ১৩৮০), *গীতবিতান*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

সন্‌জীদা খাতুন (২০০৪), *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

সন্‌জীদা খাতুন (ফাল্গুন ১৪১৬), *প্রবন্ধ-সংগ্রহ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

পরিশিষ্ট

জাতীয়সঙ্গীত স্বরলিপি

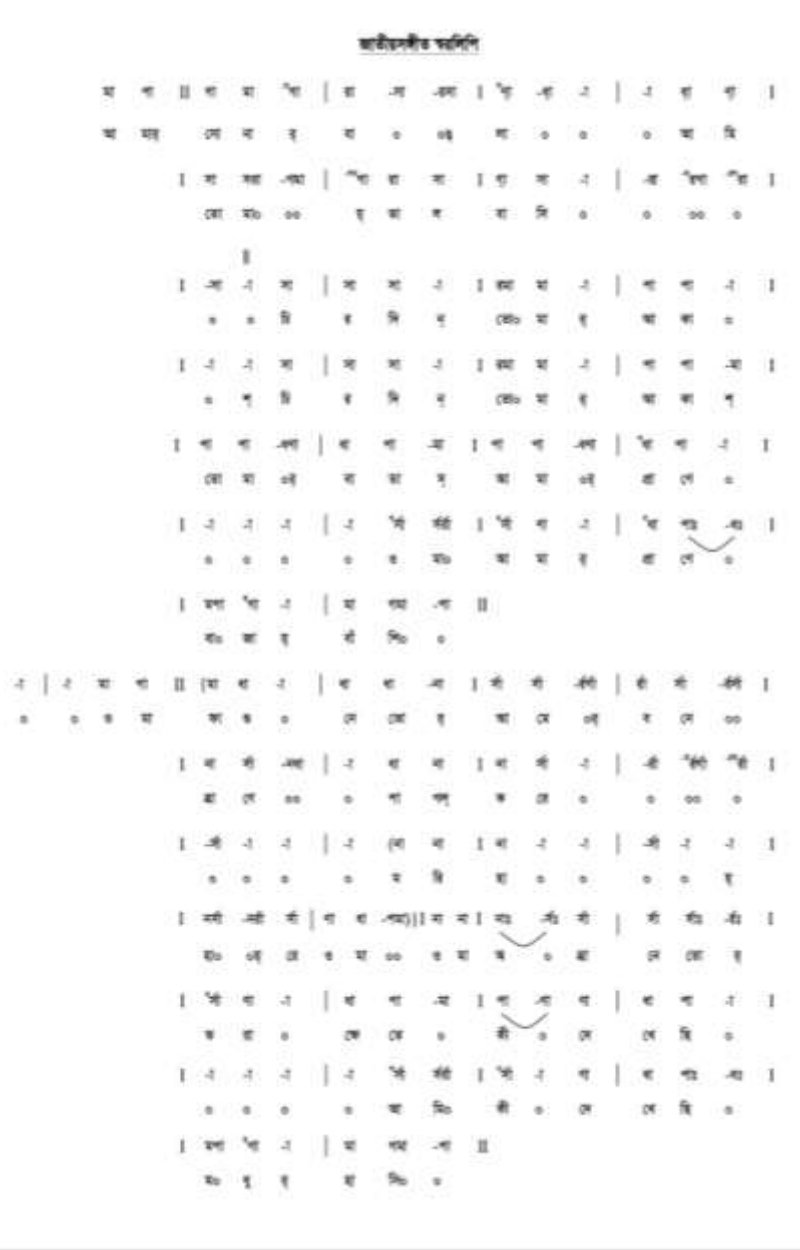

রুদ্রমঙ্গল
মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা ॥ ১৪২৭-১৪২৮ ॥ ২০২০-২০২১ ॥ ISSN 2415-4695
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

শহীদুল জহিরের কথাসাহিত্যে বঙ্গবন্ধুর ছায়াসন্ধান

মাওলা প্রিন্স (মো. হাবিব-উল-মাওলা)*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: সমকালীন বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে কম লিখে বেশি প্রাধান্য বিস্তার করা কথাশিল্পী শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮) তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে অনিবার্য ও অনোপেক্ষণীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে রূপাদর্শ করেছেন। কিন্তু, তিনি জাদুবাস্তব নন্দনরীতির কথাসাহিত্যিক হওয়ায় তাঁর কথাসাহিত্যে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট নন; অত্যন্ত মিহি ও মায়াবী আলো-ছায়ায় রূপাঙ্কিত। বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধে সেই মিহি ও মায়াবী আলো-ছায়ায় রূপাঙ্কিত বঙ্গবন্ধুকে সন্ধানের প্রয়াস রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্লেষিত হয়েছে শহীদুল জহিরের বিখ্যাত শিল্পসৃষ্টি-রূপে বিবেচিত একটি ছোটগল্প ও দুটি উপন্যাস।

সমকালীন বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮) একজন প্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পী।[১] বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন নন্দনরীতি জাদুবাস্তবতার (magic realism) সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারের পারঙ্গমতায় তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সাহিত্যশিল্প-সংশ্লিষ্টদের। জাদুবাস্তবতা যে তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন, কিংবা এই নতুন রীতিতে যে তিনিই প্রথম বাংলা কথাসাহিত্য রচনা করেছেন, তা নয়; কিন্তু, তাঁর রচনার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে জাদুবাস্তবতা পরিচিতি ও প্রাতিষ্ঠানিক

* অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

[১] শহীদুল জহিরের মূল নাম মো. শহীদুল হক। প্রথম গ্রন্থ *পারাপার* (১৯৮৫) প্রকাশের পরে একই নামের দুজন লেখকের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেতে শহীদুল হক তাঁর পিতামহের নাম 'জহিরউদ্দিন' অনুসারে 'শহীদুল জহির' নাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এ কে নুরুল হক এবং মাতার নাম জাহানারা খাতুন। তিনি ১৯৫৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর পুরান ঢাকায় নারিন্দার ভূতের গলিতে জন্মগ্রহণ করেন। নয়াটোলা, বড় মগবাজার, ঢাকা পৈতৃক বাসভবন হলেও তাঁর স্থায়ী নিবাস হচ্ছে হালিশ, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। শহীদুল জহিরের মৃত্যু হয় ২৩ মার্চ ২০০৮ সালে।

মাত্রা লাভ করেছে। কেননা, শহীদুল জহির পূর্ববর্তী আলোচনা, সমালোচনা ও গবেষণায় পরাবাস্তবতা (surrealism) ছিলো নন্দনরীতির উজ্জ্বলতম প্রসঙ্গ। শহীদুল জহির ফরাসি পরাবাস্তবতাকে আশ্রয় করেননি; তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ল্যাটিন আমেরিকার জাদুবাস্তবতায়। সত্তরের দশকে যখন *পারাপার* (১৯৮৫) গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো লিখছিলেন, তখন স্পষ্টই তিনি মার্কসবাদে (marxism) আচ্ছন্ন ছিলেন। পরবর্তী আশির দশকে তিনি কলাম্বিয়ান কথাসাহিত্যিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ (১৯২৭-২০১৪)-এর সন্ধান পান এবং মার্কেজের ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত *One Hundred Years of Solitude* (১৯৭০) পড়েই তিনি আত্মপ্রত্যয়ী হন বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে জাদুবাস্তবতার প্রয়োগে।[২] এই প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তাঁর *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* (১৯৮৮) নামক প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসে। এরপর নব্বইয়ের দশকের পুরো সময়ে শহীদুল জহির জাদুবাস্তবতাকে মুখ্য রীতি করে সাহিত্যচর্চা করেছেন। এ দশকে তাঁর সৃষ্টি *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* (১৯৯৪) উপন্যাস এবং *ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯৯) ছোটগল্পগ্রন্থ; যেখানে শহীদুল জহির লাভ করেছেন ঈর্ষণীয় সাফল্য। আরও পরে তাঁর প্রকাশিত *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প* (২০০৪) এবং *মুখের দিকে দেখি* (২০০৭) শীর্ষক সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসেও জাদুবাস্তবতার স্পষ্ট প্রভাব ও নিপুণ প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়েছে। যে-কারণে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে শহীদুল জহির ও জাদুবাস্তবতা প্রায় সমার্থক এবং এ দুটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ একইসঙ্গে কিংবা পাশাপাশি উচ্চারিত হয়ে থাকে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, জাদুবাস্তবতা কী, কিংবা, কী রয়েছে জাদুবাস্তবতায়? পরাবাস্তবতার সঙ্গে জাদুবাস্তবতার পার্থক্যইবা কী? এসব প্রশ্নের উত্তরে সহজকথা হলো, আর্থরাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রবণতা থেকে জাদুবাস্তবতার উদ্ভব।[৩] আর্থরাজনৈতিক অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা,

[২] ১৯৮২ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী কলাম্বিয়ান কথাসাহিত্যিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের আলোড়ন সৃষ্টিকারী *One Hundred Years of Solitude* (*নিঃসঙ্গতার একশ বছর*) উপন্যাসটি লিখিত ও প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে, স্প্যানিশ ভাষায়। পরবর্তীতে ইংরেজি ভাষায় এটি প্রকাশ পায় ১৯৭০ সালে।

[৩] জাদুবাস্তবতার উদ্ভব প্রসঙ্গে রবিন পাল তাঁর 'জাদু বাস্তবতা : বাস্তবতার ভিন্ন স্বর' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন: 'জার্মান *Magischer Realismus* আখ্যাটি তৈরি করা হয় ১৯২০-র দশকে জার্মানিতে ভাইমার রিপাবলিকের চিত্রকলা সূত্রে, যে চিত্রে আপাত বাস্তবের অন্তরালে জীবনরহস্য ধরার প্রয়াস ছিল। এই ১৯১৯-২৩ কালটা ছিল রাজনৈতিক ভঙ্গুরতা, রাজনৈতিক হিংস্রতার সময়। কাইজার পালিয়েছে, বাম ডান বিপ্লবী দলগুলো যুদ্ধ করছে, হিটলারের জাতীয় সমাজতন্ত্রী জার্মান শ্রমিক দলও এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। আর জার্মানিতে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক দুরবস্থা, কারণ যুদ্ধে জার্মানির পরাজয়। ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিপ্লবী কার্যকলাপে তৈরি হয়েছে জাতীয় সঙ্কট, কোয়ালিশন সরকার তা প্রশমিত করতে ব্যর্থ। জার্মানির অবস্থান ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে দূরত্বে, পুরনো পৃথিবী ভাঙছে, ভবিষ্যৎ কোনদিকে বলা যাচ্ছে না, দেশময় কোনোক্রমে বেঁচে থাকার মনোভাব (Sachlich keit) বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে শিল্পীরা সুভদ্র বস্তুগত বিচার ও প্রকাশবাদী (Expressionist) মানবিকতা এবং যুক্তিবিচারে আস্থা রাখতে না পেরে দ্বিধান্বিত, শঙ্কিত। এই অবস্থায় জার্মান শিল্প সমালোচক ফ্রাঞ্চ রো ভাইমার প্রজাতন্ত্রের শিল্প আন্দোলনের আলোচনা সূত্রে প্রকাশবাদী আন্দোলনের

আক্রোশ, প্রতিহিংসা, অপশাসন, দুঃশাসন, ত্রাস, দুর্বৃত্তায়ন ইত্যাদিতে সমাজমুখী শিল্পী যে ঘুরানো-প্যাঁচানো-গোলকধাঁধাপূর্ণ উদ্ভট, লোমহর্ষক ও ব্যাখ্যাহীন অথচ বিস্ময়কর নতুন নন্দনরীতির আশ্রয় নেন বা নিচ্ছেন, তাই জাদুবাস্তবতা। পরাবাস্তবতায় শিল্পী সমাজনিষ্ঠ হলেও মূলত ব্যক্তিমুখী। ব্যক্তির গুরুত্বে ও ব্যক্তিসত্তার ব্যবচ্ছেদে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রকে দর্শন, ধারণ ও উপস্থাপন করতে চান। পরাবাস্তবতায় শিল্পনিপুণ হয় ব্যক্তি ও শিল্পীর ভেতরের জগৎ। কিন্তু, জাদুবাস্তবতায় শিল্পী ব্যক্তিচেতন হলেও সর্বাংশে সমাজমুখী। এখানে গল্প-কাহিনী-আখ্যানকে নিয়ন্ত্রণ করে সম্মিলিত মানুষ, তাদের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি ও পারিপার্শ্বিক আবহ। বাহিরের চেনা জগৎ হঠাৎই অচেনা ও উদ্ভট হয়ে ওঠে জাদুবাস্তবতায়। এ রীতিতে স্বপ্ন, কল্পনা, রূপকথা, লোককথা, ফ্যান্টাসি ইত্যাদির মোড়কে প্রাত্যহিকতার আড়ালে উদ্দেশ্য থাকে সত্যসন্ধান। আর্থরাজনৈতিক পীড়নে ক্ষত-বিক্ষত কথাশিল্পী শহীদুল জহির শেষপর্যন্ত সত্যসন্ধানে ব্রতী ছিলেন। তিনি ইতিহাস, রাজনীতি ও সমকালের সত্যকে যুতসই জাদুবাস্তবতারীতিতে তুলে এনেছেন তাঁর অনন্য কথাসাহিত্যে।

দুই.

সত্যসন্ধানে ব্রতী কথাশিল্পী শহীদুল জহির ইতিহাস, রাজনীতি ও সমকালকে নিরীক্ষণ করেছেন নিবিড়, নির্মোহ ও নিরাসক্তভাবে। তাঁর কথাসাহিত্যে ষাটের দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের মানুষের জীবনসত্য শিল্পিত হয়েছে। পুরান ঢাকার ভূতের গলি, ভিক্টোরিয়া পার্ক, সিরাজগঞ্জের সুহাসিনী গ্রাম, রৌহার বিল আর চট্টগ্রাম-আরাকান সীমান্তবর্তী ভূগোল তাঁর কথাসাহিত্যের স্থানিক প্রেক্ষাপট। শহীদুল তাঁর এই পরিচিত স্থানিক প্রেক্ষাপটে অতিসাধারণ মানুষগুলোর অপরিবর্তিত নিয়তিকে বারংবার অবলোকন করেছেন। মানুষগুলো যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও সত্যিকারার্থে মুক্তি পায় নি, তাদের জীবন ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে মৌলিক ও গুণগত কোনো পরিবর্তন আসে নি, তারা ও তাদের সময়জ্ঞান বা কালচেতনা যে অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃত্তাকার কুয়োয় কিংবা নেশা লাগানো জ্যোৎস্নার চক্রাকার চাঁদে আটকে গেছে, বাঁধা পড়েছে, তা শহীদুল জহিরের সত্যসন্ধানে উন্মোচিত হয়েছে। একইসঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে এই অক্ষম, অসার ও অপরিবর্তিত নিয়তির কারণসদৃশ উৎসমূল। স্বাধীন বাংলাদেশের চলমান রাজনীতি যে এজন্য দায়ী, সুবিধাবাদী রাজনীতির আঁকাবাঁকা, নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন গতিপথই যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমৃদ্ধি ও পূর্ণতার অন্তরায়, তা শহীদুলের কথাসাহিত্যে বিচার্য হয়েছে। তবে, রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হলেও শহীদুল জহির রাজনীতিবিমুখ কথাশিল্পী নন। তিনি সুবিধাবাদী রাজনীতির মুখোশ যেমন উন্মোচনে ব্রতী হয়েছিলেন, তেমনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেও বুনন করেছেন তাঁর

সঙ্গে ভ্যানগখ ও পরাবাস্তববাদী শিল্পের ভিন্নতা প্রদর্শন করতে গিয়ে জাদু বাস্তবতার বাইশটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন এবং পরাবাস্তববাদের সঙ্গে জাদু বাস্তববাদের সম্পর্ক ও স্বাতন্ত্র্যের কথাও তুলে ধরেন।' (হাবিব রহমান সম্পাদিত ২০১৪: ২৫২-২৫৩)

কথাসাহিত্যে। এক্ষেত্রে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার "বঙ্গবন্ধু"[৪] শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)-কে গুরুত্বারোপ করেছেন।[৫] সরাসরি আলোকপাত না করলেও, কিংবা প্রতীক-রূপকের আলো-ছায়ায় অস্পষ্ট অবস্থায় রূপোন্মোচন করলেও, কিংবা প্রদেয় সাক্ষাৎকারে অস্বীকার করতে চাইলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি যে বঙ্গবন্ধুকেই রূপাদর্শ (model) করেছেন কিংবা করতে চেয়েছেন, তা উপলব্ধি করা যায়। তাঁর *ডুমুরখেকো মানুষ* ছোটগল্পে এবং *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* ও *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* উপন্যাসে করা যায় বঙ্গবন্ধুর ছায়াসন্ধান।

[৪] "১৯৬৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী আইউব খান ইত্তেফাকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন এবং সাংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের 'গোল টেবিল' বৈঠকের প্রস্তাব দেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ তথা মুজিবকে বাদ দিয়ে গোল টেবিল বৈঠক অর্থহীন ছিল। এবং মুজিব বন্দী অবস্থায় কোন বৈঠকে যোগদান করতে অস্বীকার করেন। ফলে সরকার ২২শে ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও মুজিবসহ সকল আসামীকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সদ্যমুক্ত শেখ মুজিব ও আগরতলা মামলার অন্যান্য আসামীকে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) এক বিরাট গণসম্বর্ধনা দেয়া হয়। এই সম্বর্ধনা সভায় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' আখ্যায় ভূষিত করেন। মুজিব তাঁর ৬-দফার সঙ্গে ১১-দফাকেও গণদাবী হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সেগুলো আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাসাম্যের পরিবর্তে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বরও দাবী করেন।" (আবুল ফজল হক ১৯৯৪: ৩৬)

[৫] শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে নিজের জন্ম সম্পর্কে লেখেন: "আমার জন্ম হয় ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। আমার ইউনিয়ন হল ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বশেষ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের পাশেই মধুমতী নদী। মধুমতী খুলনা ও ফরিদপুর জেলাকে ভাগ করে রেখেছে।" (শেখ মুজিবুর রহমান ২০২০: ১) অন্যত্র তিনি লেখেন: "আমার জন্ম হয় ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে। আমার আব্বার নাম শেখ লুৎফর রহমান।" (২০২০: ৮) *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের সূচনায় অতিরিক্ত পৃষ্ঠায় তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে: "শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যয়ন করেন। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। তিনি তাঁর দল আওয়ামী লীগকে ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী করেন। তাঁর এই অর্জন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অন্যতম প্রেক্ষাপট রচনা করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ঐ সংগ্রামের জন্য তিনি জনগণকে 'যা কিছু আছে তাই নিয়ে' প্রস্তুত থাকতে বলেন। তিনি ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। তাঁরা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করেন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন হলে শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি বীরের বেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। বাঙালির অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান জীবদ্দশায় কিংবদন্তী হয়ে ওঠেন। ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী সদস্যের হাতে তিনি নিহত হন।" (২০২০: অতিরিক্ত ১-২)

ডুমুরখেকো মানুষ

ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প গ্রন্থের তৃতীয় ও নামগল্প *ডুমুরখেকো মানুষ* কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক (জ. ১৯৩৯) সম্পাদিত *প্রাকৃতক* পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালের অক্টোবরে। (*শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ*, ২০১০: ৬৬৬) ছোটগল্পটি একজন ডুমুরবিক্রেতা এবং পাঁচজন অপরিণামদর্শী ডুমুরখেকো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংঘাতে নির্মিত হয়েছে। গল্পে দেখা যায়, "ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং ঈষৎ বাঁক-খাওয়া" একটি হাড় আন্দোলিত করে রহস্যময় ও অস্পষ্ট হাসি নিয়ে "মোহাব্বত আলি জাদুগরি" বিকেলের আলোয় পুরান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে উপস্থিত লোকদের জাদু খেলা দেখায় এবং জাদু খেলা শেষে এদেশের বনে-জঙ্গলে জন্মানো পাকা ডুমুর ফল বিক্রি করে। তার বিক্রয়ের রীতি বা শর্ত হলো, প্রথমে সে সকলকে একটি করে ডুমুর বিনা পয়সায় খেতে দিবে এবং এরপর কেউ আরও খেতে চাইলে তাকে দুটাকার বিনিময়ে হাফ ডজন কিনতে হবে এবং এই দাম পুরনো ক্রেতার ক্ষেত্রে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাবে। এজন্য জাদুকর তার সকল ক্রেতার নাম আজীবন মনে রাখবে বলে নিশ্চিত করে এবং ডুমুরখেকোদেরকে ডুমুর ফল দ্রুত খেয়ে না ফেলার পরামর্শ দেয়। আব্দুল গফুর নামক এক পুরনো ক্রেতা পঞ্চমবার ছয়টি ডুমুর বত্রিশ টাকায় কেনার পরে ষষ্ঠবার তা পেতে চাইলে মোহাব্বত আলি ছয়টি ডুমুরের মূল্য বাবদ চৌষট্টি টাকা দাবি করে। এতে আব্দুল গফুর অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠে। তার আর ডুমুর কেনা হয় না। উচ্চমূল্যের কারণে সে ডুমুর না কিনে ক্রমাগত বসে বসে জাদুকরের ডুমুর বিক্রি করা দেখে এবং সে তার মতোই পুরনো ডুমুরখেকো আব্দুল জলিল, শরফুল আলম, শহীদুল হক ও ইদ্রিস আলিকে আবিষ্কার করে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে সখ্যতা তৈরি হলে একপর্যায়ে তারা জাদুকরের নিকট ডুমুর ফলের বিপরীতে ডুমুরের একটি করে গাছ কিনতে আগ্রহী হয়। এজন্য তারা প্রতিটি গাছের মূল্য হাজার টাকা দিতেও প্রস্তুত। তারা জাদুকর মোহাব্বত আলিকে ডুমুর গাছ বিক্রিতে সম্মত করতে ব্যর্থ হলে একদিন জাদুকরের বাড়িতে যায় এবং পুনরায় তাদের প্রত্যেককে একটি করে ডুমুর গাছ দেওয়ার অনুরোধ করে। কিন্তু, এবারও মোহাব্বত আলি রাজি হয় না। সে খুব বিরক্ত হয়, হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে, চিৎকার করে বলে যে ডুমুর গাছ বিক্রি হয় না। সে তাদেরকে তক্ষুণি প্রাসাদ ত্যাগ করতে বলে। জাদুকরের ক্রোধান্বিত চেহারা দেখে অনুপ্রবেশকারী ডুমুরখেকোরা ভয় পেয়ে ছুটে বাহিরের ঘরে আসলেও পরে তারা পুনরায় ভেতরের ঘরে প্রবেশ করে এবং পালকের বিছানায় চিৎ হয়ে শায়িত মোহাব্বত আলি জাদুকরকে হত্যা করে। জাদুকরের মৃতদেহ বিছানার ওপর রেখে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে পেছনে ডুমুর বাগিচার দিকে এগিয়ে গেলে অকস্মাৎ তারা "মৃদু অথচ নিশ্চিত শব্দ" শুনতে পায়। তারা ছোটা বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে মৃদু চির-চির শব্দে একটি ডিমের খোসার মতো ইমারতটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এতে হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওরা বাহিরে বের হওয়ার জন্য উলটো দিকে দৌড়ায়। যখন সম্বিৎ ফিরে পায় তখন তারা বুড়িগঙ্গা নদীর কিনারায় এক কাঠ চেরাইয়ের কারখানার পাশে নিজেদেরকে আবিষ্কার

করে। তারা ঘটনাটিকে স্বপ্ন ভাবে; কিন্তু, নিজেদের হাতে লোহার রড ও খঞ্জর এবং গায়ের রক্তরঞ্জিত জামা দেখে আতঙ্কিত হয়। আতঙ্ক ও অবসাদে তাদের চোখ-মুখ গরম হয়ে ওঠে। তাদের শরীরে দেখা দেয় কাঁপুনি। এরপর তারা "অর্ধচেতনার এক ঘোরের ভেতর শুধুমাত্র প্রবৃত্তিগত ইচ্ছেশক্তির বলে" নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করে বিছানায় শোয়। এরপর "প্রবল তাপ ও শারীরিক বিক্ষেপের কারণে" গৃহের লোকেরা তাদের দেহ চাদরে ঢেকে দিলে জগডুমুরখেকো পাঁচজন মানুষ অদৃশ্য হয়ে যায়। গল্পের শেষাংশ:

> তখন বাড়ির লোকেরা বিছানার ওপর ছড়িয়ে থাকা চাদরটি ওঠায় এবং লক্ষ্মীবাজারে অথবা নারিন্দায়, দয়াগঞ্জে অথবা বনগ্রামে পাঁচটি বাড়িতে বাড়ির লোকেরা বিছানার ওপর ধূসর বর্ণের একখণ্ড হাড় পড়ে থাকতে দেখে। এখন এইসব মহল্লার লোকেরা ডুমুর ভক্ষণকারী এইসব লোকের কথা বলে, তারা তাদের ডুমুর খাওয়ার আনন্দ এবং বেদনার কথা বলে, এবং তারা তাদের অপরিণামদর্শিতার পরিণতির কথা বলে। (শহীদুল জহির ২০০৬: ৯২)

গল্পটি গভীর নিরীক্ষণে কিছু শব্দসংকেত (key words) বেরিয়ে আসে; যথা: ভিক্টোরিয়া পার্ক, ছয় ইঞ্চি হাড়, মোহাব্বত আলি জাদুগির, প্রীতিলতা, ডুমুর, ছটি ডুমুর, পাঁচজন ডুমুরখেকো, অনুপ্রবেশকারী, অপরিণামদর্শী, প্রাসাদ, পালকের বিছানা ইত্যাদি। এই শব্দসংকেতগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী পঁচাত্তরে সংঘটিত সেই অভ্যুদয়ের মহানায়কের হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তীতে তাঁর হত্যাকারীদের পরিণতির ছায়াচিত্র ফুটে উঠে। গল্পের 'ভিক্টোরিয়া পার্ক' যে চেতনার রেসকোর্স ময়দান, জাদুকরের হাতে আন্দোলিত 'ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং ঈষৎ বাঁক-খাওয়া হাড়টি' যে বাঙালির মুক্তির সনদরূপে বিবেচিত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা, 'মোহাব্বত আলি জাদুগির' যে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু, 'প্রীতিলতা' যে প্রতীকী বাংলাদেশ, 'ডুমুর' যে রূপকী স্বাধীনতা, 'ছয়টি ডুমুরের থোকা' যে মানুষের ছয়টি মৌলিক চাহিদা, 'পাঁচজন ডুমুরখেকো' যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাযজ্ঞে নেতৃত্ব দেওয়া উচ্চাভিলাষী পাঁচ সেনাকর্মকর্তা, তা অনুমান ও উপলব্ধি করা যায়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা যে সেরাতে তাঁর রাজপ্রাসাদে ছিলো 'অনুপ্রবেশকারী', হত্যাকাণ্ডের সময়ে বঙ্গবন্ধু যে ছিলেন রাষ্ট্রপতির 'পালকের বিছানা'য় শায়িত বা ঘুমন্ত অবস্থায় এবং আইন, রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে হত্যাকারীরা যে ছিলো 'অপরিণামদর্শী', তা বোধগম্য হয়ে ওঠে। গল্পের শেষে মহল্লার লোকেরা ডুমুরখেকোদের 'অপরিণামদর্শিতার পরিণতির কথা বলে', যা জাতীয় জীবনে এখনও বলতে শোনা যায়। গল্পটিতে বঙ্গবন্ধুর ছায়াসন্ধানে প্রাসঙ্গিক দুটি অভিমত:

> ক. পাঠক যদি তার এই গল্পপাঠে একটু নিবিষ্ট হন তাহলেই অনুমান করতে পারবেন যে সেই রহস্যময় মানুষটি হলো আমাদের দেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ মানুষকে স্বপ্ন দেখান—এই জনপদের শারীরিক, মানসিকভাবে রুগ্ন, অসুস্থ জাতির সামনে। সেই ভরাপূর্ণিমার মতো রূপসী মাইয়া মানুষটি হচ্ছে আমাদের সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ। ১১ জন মানুষের কথায় মনে হয় তার ১১ দফার কথা, যা একসময় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চাবিকাঠি ৬ দফা। আর তিনি যে ৬টি ডুমুর থোকা বিক্রি করেন সেই ৬টি ডুমুর মানে ৬টি মৌলিক চাওয়া-পাওয়া, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা। কিন্তু কতিপয় অবিবেচক,

স্বার্থপর, লোভী, হিংস্র মানুষের হাতে তাকে প্রাণ হারাতে হয় সপরিবারে। যতদূর জানা যায় বঙ্গবন্ধুকে যখন হত্যা করা হয় তখন ৫ জন তাকে ঘর থেকে বের করে আনে। আবার বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিবরণীতে জানা যায় যে, ঐ হত্যাকাণ্ডে মেজর হুদা, মেজর পাশা, মেজর নূর, মেজর মুহিউদ্দিন এবং রিসালদর মোসলেমউদ্দিন এই ৫ জন নেতৃত্ব দেয়। গল্পের শেষে দেখি যে সেই ৫ হত্যাকারী গায়েব হয়ে গেছে, তাদের বিছানায় এক খণ্ড হাড় পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং সকলে তাদের অপরিণামদর্শিতার পরিণতির কথা বলে। আমরাও কি বলি না! (রবিউল করিম ২০১০: ২৮৩-২৮৪)

খ. 'ডুমুরখেকো মানুষ' গল্পের জাদুবাস্তবতায় অনেকগুলো উপাদানের সঙ্গে 'মনোজগতের পরাবাস্তব অধিবিদ্যা'-ও এসেছে; কিন্তু, গল্পটির সার্বিক সার্থকতা জাদুবাস্তবতায় রূপকতা সৃষ্টিতে। রূপকী-আশ্রয়ে 'কাঠুরে ও দাঁড়কাক' গল্পে যেমন একনায়ক এরশাদ-সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা যায়, তেমনি 'ডুমুরখেকো মানুষ' গল্পটির মধ্যেও স্বাধীন বাংলাদেশের মহানায়ক শেখ মুজিবকে খুঁজে পাওয়া যায়। ভিক্টোরিয়া পার্কে জাদুখেলা দেখানো 'মোহাব্বত আলি'কে রেসকোর্স ময়দানের বঙ্গবন্ধু, খুব সুন্দরী মায়ালোক 'প্রীতিলতা'কে স্বাধীন বাংলাদেশ, এবং জাদুকরকে হত্যাকারী 'ডুমুরখেকো'দেরকে বঙ্গবন্ধুর হন্তারকদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। (কাজী সাহানা সুলতানা ২০১৫: ২৩৮-২৩৯)

ডুমুরখেকো মানুষ শহীদুল জহিরের বিখ্যাত ছোটগল্প। জাদুবাস্তবতার আধারে জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক জাদুকর বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করবার শিল্পনিপুণতায় গল্পটি অসাধারণ। গল্পকার এখানে বঙ্গবন্ধুকে চেতনালোকে রেখে অরাজক ও অপরিণামদর্শী জাতীয় রাজনীতির যে বিরূপ চিত্র তুলে এনেছেন, তা ঐতিহাসিক, ইতিহাসসত্য।

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

২০০৪ সালের ডিসেম্বরে কথাশিল্পী কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর (জ. ১৯৬৩)-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ঔপন্যাসিক শহীদুল জহির তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেন:

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেশের রাজনৈতিক আবহ এবং এই সময়ে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রকাশিত *একাত্তরের দালালরা কে কোথায়* পড়ে আমার মনের এমন একটা অবস্থা হয় যে, আমাকে *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* বইটা লিখতে হয়।... হ্যাঁ। আমার কাছে এই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ভাল লাগে নাই। তখন আমি বইটা লিখি। এবং তখন আমি মার্কেজের *ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড* পড়ে ফেলায় তার কাছ থেকে যাদুবাস্তবতার রচনা পদ্ধতিটা নেই। (ওবায়েদ আকাশ [সম্পা.] ২০০৮: ১৯১)

অর্থাৎ, রাজনৈতিক সুবিধাবাদের প্রতি অনাস্থা ও প্রতিবাদস্বরূপ নির্মিত উপন্যাস *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*। উপন্যাসের আখ্যান থেকে জানা যায়, বদরুদ্দিন মওলানা ওরফে বদু মওলানা একাত্তর সালে নরম করে হাসতো আর বিকেলে কাক ওড়াতো মহল্লার আকাশে। এক থালা মাংস নিয়ে ছাদে উঠে যেতো বদু মওলানা আর তার ছেলেরা। কাকেরা এই মাংস ধরতে ব্যর্থ হলে পড়ে যাওয়া মাংস পরোখ করে মহল্লার লোকেরা বুঝতে পারতো সেগুলো ছিলো মানুষের মাংস। মুক্তিযুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ,

অগ্নিসংযোগ, লুট, ত্রাস, ধর্ষণ ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত রাজাকার নেতা বদু মওলানার ব্যক্তিগত ক্রোধ ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ার শিকার হয় আবদুল মজিদের বড় বোন; কলেজিয়েট স্কুলপড়া ও সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলের চার্চে প্রার্থনা-সংগীতে অংশ নেওয়ার ধারাবাহিকতায় সিলভারডেল স্কুলে গান গাওয়া মোমেনা। রাজাকার ও পাকিস্তানী মিলিটারি থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত মোমেনার মৃত্যু হয়। পৈশাচিক নির্যাতনে মৃত মোমেনার ক্ষত-বিক্ষত ছিন্নভিন্ন বস্ত্রহীন নিথর দেহ ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে পাওয়া যায় রায়েরবাজারের জনমানবহীন একটি মাঠে। দেশ স্বাধীনের মুহূর্তে বদু মওলানা পালিয়ে যায় এবং দুবছর পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা হলে সে মহল্লায় ফিরে আসে এবং আধিপত্য বিস্তারে পুনরায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। ভিক্টোরিয়া পার্কের সভায় দাঁড়িয়ে বলে, তার পুত্রের মৃত্যুর কথা বাদ দিলে একাত্তর সালে সে বস্তুত একটি দুঃখজনক মৃত্যু দেখেছিলো; সেটা ছিলো তার প্রিয় পুত্রের কুকুর ভুলুর মৃত্যু। আর একটি মৃত্যু সে দেখে নাই, শুনেছে; সেটা ছিলো রাজাকার আবদুল গণির মৃত্যু। উনিশ শ পঁচাশি সালে সরকারবিরোধী আন্দোলনে নবাবপুর রোডে বদু মওলানার ছেলে আবুল খায়ের পথসভায় বক্তৃতা দেয়, "জয় বাংলা" বলে বিবৃতি শেষ করে পুনরায় "ভাইসব" বলে সম্বোধন করে সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য ডাক দেয়, সকলকে ধন্যবাদ জানায়। লাউড স্পিকারে "আপনেদের ধন্যবাদ" কিংবা "ভাইছাব, আপনেদের ধন্যবাদ" কিংবা "ভাইসব" শব্দমালা শোনার মুহূর্তে আবদুল মজিদের স্যান্ডেলের ফিতা "পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে ব্যর্থ হয়ে ফট করে ছিঁড়ে যায়।" সে থমকে দাঁড়ায় এবং প্রবলভাবে তাড়িতবোধ করে। সেদিন নৌকা প্রতীকের স্থানীয় আওয়ামী নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক আজিজ পাঠন তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাঁধের ওপর হাত রেখে বলে যে, রাজনীতিতে চিরদিনের বন্ধু অথবা চিরদিনের শত্রু বলে কিছু নেই, কাজেই অতীত ভুলে যাওয়া ছাড়া আর কিইবা করার থাকে মানুষের, সময়ে মানুষকে অনেককিছু ভুলে যেতে হয়। তিনি বোঝাতে চান যে, বাস্তবতা অনেক সময় বড় হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতার দ্বন্দ্বে আপোসহীন কিংবা নিরুপায় আবদুল মজিদ ছিয়াশির জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে পৈত্রিক বাড়িঘর বিক্রি করে মহল্লা ছেড়ে চলে যায়। আবদুল মজিদের মনস্তত্ত্ব, বোধ-বিবেচনা-বক্তব্য ও চিন্তা-ভাবনা-সিদ্ধান্ত মূর্ত হয়েছে উপন্যাসের শেষাংশে:

এই অবস্থায় কয়েক দিনের চিন্তাভাবনার শেষে সে সিদ্ধান্ত নেয় মহল্লা ত্যাগ করে যাওয়ার। এ ব্যাপারে অবশ্য সে তার মা, স্ত্রী এবং দুবোনের স্বামীদেরও মতামত নেয়, তবে লক্ষ্মীবাজারের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে বাড্ডায় তার শ্বশুরবাড়ির কাছ দিয়ে নতুন বসত শুরু করার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকে। কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করে তার মনে হয়, এটাই একমাত্র যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। প্রথমত, সে চায় না, তার মেয়েটি তার বোনের মতো বদু মওলানা কিংবা তার ছেলেদের জিঘাংসার শিকার হোক এবং তার মনে হয়, বাস্তবতা এভাবে এগোলে এ রকম যে ঘটবে না তা কেউ বলতে পারে না। তার মনে হয়, বদু মওলানা একাত্তর সনের সেই একই রাজনীতির চর্চা করে এবং সে এখনো জানে আবদুল মজিদ এবং তার পরিবার মোমেনার মৃত্যুর জন্য এখনো তাকে ঘৃণা করে। তার মনে হয়, এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় বদু

> মওলানা এবং তার দল সুবিধে করতে পারলে তারা আবদুল মজিদকে ছেড়ে দেবে না এই ঘৃণার জন্য। তবে আবদুল মজিদ এটাও বুঝতে পারে যে, বদু মওলানার সে সুযোগ ঘটলে মহল্লার প্রায় সব লোকই আবার তার সেই পুরনো চেহারাটা দেখতে পাবে; কিন্তু এই ভয়ে একটি মহল্লার সব অধিবাসী বাড়িঘর বিক্রি করে পালাতে পারে না। তা সত্ত্বেও, আবদুল মজিদ ঠিক করে যে, মহল্লার সব লোকের কি হবে তা নিয়ে চিন্তা করে তার লাভ হবে না, সে প্রথমে নিজেকে বাঁচাতে চায় এবং কোনো সমষ্টিগত প্রচেষ্টার অবর্তমানে সে তা করতে পারে এখনই মহল্লা ত্যাগ করে। তার এই চিন্তা এবং সিদ্ধান্তের পরিণতিতে ছিয়াশি সনের সাতই জানুয়ারির দৈনিক ইত্তেফাকে আবদুল মজিদের বাড়ি বিক্রির একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এবং ধরে নেয়া যায় যে, তাদের বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়ে থাকলে লক্ষ্মীবাজারে তাদের নাম অবলুপ্ত হয়েছে। মহল্লার লোকেরা তাদের এই আচরণে প্রথমে হয়তো বিস্মিত হয়; তবে একসময় তারা হয়তো বুঝতে পারে, কেন আবদুল মজিদ মহল্লা ছেড়ে চলে যায়, অথবা এমনও হতে পারে যে, আবদুল মজিদের এই সংকটের বিষয়টি মহল্লায় এবং দেশে হয়তো কেউ-ই আর বুঝতে পারে নাই। (শহীদুল জহির ২০০৭: ৫১-৫২)

পঁচাশিতে সরকারবিরোধী আন্দোলন ও ছিয়াশির জাতীয় নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ আওয়ামী লীগ ও বিপক্ষ জামায়াতে ইসলামী একজোট হয়ে অংশগ্রহণের অপ্রত্যাশিত ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপটে পরিবর্ধিত *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসে বঙ্গবন্ধুর ছায়াসন্ধান ভিন্ন কিংবা তির্যকভাবে করা যায়। উপন্যাসে রাষ্ট্র কর্তৃক তিহাত্তরের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন বাংলাদশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজাকারদের পুনর্বাসন ও প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুখ হয়েছিলো এবং পঁচাশির সরকারবিরোধী আন্দোলন ও ছিয়াশির জাতীয় নির্বাচনে সেই পথ যে আরো প্রশস্ত ও পাকাপোক্ত হয়েছে, তা উচ্চকিত। *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত শহীদুল জহিরের বিখ্যাত *ইন্দুর-বিলাই খেলা* ছোটগল্পেও তিহাত্তরের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রসঙ্গটি এসেছে। সেখানেও দেখা গেছে একাত্তরের ডিসেম্বরে ভেগে যাওয়া ইন্দুর মওলানা আব্দুল গফুর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর একদিন ভূতের গলিতে ফিরে আসে। তিহাত্তরের সাধারণ ক্ষমা যেহেতু রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষণা করা হয়েছিলো এবং তিহাত্তরের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণ, দস্যুবৃত্তি, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অপরাধে অপরাধী কোনোভাবেই ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত না হলেও এই ঘোষণার ফলেই যেহেতু মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তিরা সেসময়ে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ছাড় পায়, আইনীভাবে ছাড়া পায়, সেহেতু মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানও এর দায় এড়াতে পারেন না বলে ঔপন্যাসিকের উপলব্ধি ও বিচার উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।[৬]

[৬] "১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর দালাল আইনে আটক যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীদের সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার পর দালাল আইনে আটক ৩৭ হাজারের অধিক ব্যক্তির ভেতর থেকে প্রায় ২৬ হাজার ছাড়া পায়। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ৫নং ধারায় বলা হয়, যারা বর্ণিত আদেশের নিচের বর্ণিত ধারাসমূহে শাস্তিযোগ্য অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত অথবা যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে অথবা যাদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত ধারা মোতাবেক কোনটি অথবা সব ক'টি অভিযোগ থাকবে। ধারাগুলো হলো: ১২১ (বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো অথবা চালানোর

বঙ্গবন্ধুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও ঔপন্যাসিকের অভিমান, ক্ষোভ কিংবা হতাশার চিত্র এখানে স্পষ্ট। ঔপন্যাসিকের এই নিরাসক্ত ও নির্মোহ ইতিহাসবিচার তাঁর পেশাদারিত্বের পরিচয়বহ, বলা যেতে পারে। সমালোচকের ভাষ্য:

> শহীদুল জহির মুক্তিযুদ্ধের একটা উপন্যাস লিখতে বসে, কিংবা এমন একটা উপন্যাস লিখেতে বসে যেটা ঘটনাচক্রে মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করেছে, সেন্টিমেন্টালিটির চাপ বহন করেননি। সেটা সমকালীন বহুবিধ মুক্তিযুদ্ধাশ্রয়ী সাহিত্য-রচনা থেকে *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*কে স্বতন্ত্র করেছে। এর রচনাকারকেও। এই বিশেষ কাজটাকে দেখতে হবে আসলে তাঁর কারিগরি হিসেবেই। অন্তত আমার সেরকম প্রস্তাবনা। তাঁর কারিগরি, লেখকের জন্য যা মৌলিক পেশাদারিত্বের বলে আমি বিবেচনা করি, কয়েকটা লক্ষণে প্রকাশিত। প্রথম এবং প্রধানটাই হচ্ছে কথকের নিয়মনিষ্ঠ নৈর্লিপ্তি। (মানস চৌধুরী ২০১০: ৪২৬)

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাশ্রয়ী উপন্যাস *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতায়* ব্যক্তিগত জীবন ও দলীয় রাজনীতির পরস্পরবিরোধী গতি-প্রকৃতি ও অবস্থান হয়েছে বিশ্লেষিত। আদর্শিক কিংবা ফরমায়েশী বক্তব্য বিনির্মাণ না করে নির্লিপ্তভাবে ইতিহাস ও রাজনীতিকে বিশ্লেষণের ব্রতে শহীদুল জহির অনেকটাই নিঃসঙ্গ কথাশিল্পী। যে-কারণে তিহাত্তরের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রসঙ্গকে নির্দেশ করে তিনি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকেও প্রশ্নবিদ্ধ কিংবা সমালোচনা করতে পেরেছেন। এক্ষেত্রে শহীদুল জহির আইনের ধারা-উপধারায় চোখ রাখেন নি, দেখেছেন জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে।

সে রাতে পূর্ণিমা ছিল

শহীদুল জহিরের *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* বহুমাত্রিক উপন্যাস হলেও রাজনীতি ও রাজনীতিনির্ভর একটি জনপদের মানুষের আটকে পড়া যাপিত জীবনই এখানে মুখ্য। প্রান্তিক পর্যায় থেকে ক্রমে ক্রমে উঠে আসা একজন জনপ্রতিনিধিও যে একনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তার ক্ষমতাকে আঁকড়ে রাখতে চান শত বছর এবং এই রাজনৈতিক অভিলাষের পরিণতি যে কী ভয়াবহ কী মর্মান্তিক এবং শেষ পর্যন্ত যে এই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কিংবা অপসংস্কৃতি থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি পায় না, তা এই উপন্যাসে শিল্পিত হয়েছে। কাহিনীর কাঠামোয় (plot) দেখা যায়, সুহাসিনীর ভূমিহীন কৃষক আকালু ও তার বোবা স্ত্রীর ছেলে মফিজুদ্দির জন্ম হয় এক পূর্ণিমার রাতে। চৌদ্দ-

চেষ্টা), ১২১ ক (বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর ষড়যন্ত্র), ১২৮ ক (রাষ্ট্রদ্রোহিতা), ৩০২ (হত্যা), ৩০৪ (হত্যার চেষ্টা), ৩৬৩ (অপহরণ), ৩৬৪ (হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ), ৩৬৫ (আটক রাখার উদ্দেশ্যে অপহরণ), ৩৬৮ (অপহৃত ব্যক্তিকে গুম ও আটক রাখা), ৩৭৬ (ধর্ষণ), ৩৯২ (দস্যুবৃত্তি), ৩৯৪ (দস্যুবৃত্তিকালে আঘাত), ৩৯৫ (ডাকাতি), ৩৯৬ (খুনসহ ডাকাতি), ৩৯৭ (হত্যা অথবা মারাত্মক আঘাতসহ দস্যুবৃত্তি অথবা ডাকাতি), ৪৩৫ (আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার), ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৬ (আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে কোন জলযানের ক্ষতিসাধন) অথবা এসব কাজে উৎসাহ দান। এসব অপরাধী কোনোভাবেই ক্ষমার যোগ্য নন।" দ্রষ্টব্য: সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, দালাল আইন (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২, উইকিপিডিয়া: https://bn.wikipedia.org/wiki (02.02.2020)।

পনেরো বয়সে কিশোর মফিজুদ্দিকে কাজিদের কুকুর তাড়া করে রৌহার বিল পর্যন্ত নিয়ে গেলে সেখানে সে একটি বাঁশের লাঠি পেয়ে উল্টো খ্যাপা কুকুরটিকে সারাদিন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় এবং দুদিনের প্রাণান্ত চেষ্টায় ছ-সাত জন তরুণের সাহায্যে সে একটি বিস্তৃত ফসলের মাঠে কুকুরটিকে পিটিয়ে হত্যা করে এবং মৃত কুকুরটিকে সেখানে পুঁতে দেয়। এতে কাজিরা ভয়ানক অপমান ও রাগ বোধ করে রায়গঞ্জ থানায় নালিশ করলে সুহাসিনীতে মফিজুদ্দিন বিখ্যাত হয়ে ওঠে এবং গ্রামের লোকেরা সেই ফসলের বিস্তৃত মাঠকে "কুত্তা মারার মাঠ" উল্লেখ করতে থাকে। তেজোদীপ্ত এই ছেলেকে মিয়াবাড়ির আলি আসগর মিয়া বাঁধা কামলা হিসেবে পেতে চায়। কিন্তু, মফিজুদ্দিন মিয়াবাড়ির বাঁধা কামলা নয়, মিয়াবাড়ির জামাই হিসেবে আলি আসগর মিয়ার বাড়িতে চলে আসতে সম্মতি জানায়। এই সাংঘাতিক কথার কারণে তার প্রাণনাশের উপক্রম হলে সে এক গণিকার আত্মাহুতিতে বেঁচে যায়। একটানা সতেরো দিন নিরুদ্দিষ্ট হয়ে থাকার পরে সে গ্রামে ফিরে আসে এবং প্রচার করে যে সে আলি আসগর মিয়া সাবের মেয়ে চন্দ্রভানকে বিয়ে করবেই, কেউ তার কিছু করতে পারবে না এবং সে একশো এগারো বছর বাঁচবে। পরে সে কিশোর ও যুবক ছেলেদের নিয়ে সুহাসিনীর উত্তর প্রান্তে জেলা বোর্ডের সড়কের পাশের খাসজমিতে একটি হাট বসায়। একটি কড়ুই গাছের সবুজ শাখার নিচে দাঁড়িয়ে উপস্থিত গ্রামবাসীদের সম্মুখে মফিজুদ্দিন নূতন হাটের নামকরণ করে "নয়নতারার হাট"। ফাল্গুন মাসের শেষ বৃহস্পতিবার সুহাসিনীতে প্রথম হাট বসলে সেদিন রাতে সতেরো বছর বয়সী মফিজুদ্দিনের সঙ্গে চৌদ্দ বছরের চন্দ্রভানের বিয়ে হয়। আকালুর ছেলেকে আলি আসগর মিয়া ঘরে তুলে নেয়। নয়নতারার হাট লেগে ওঠা, মিয়াবাড়ির মেয়েকে বিয়ে করা, খড়াপীড়িত গ্রামের মানুষদের ডাক দিয়ে খাল কাটা ও গ্রামের মানুষদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সীমানায় তালগাছ রোপণের সুবাদে সুহাসিনীর লোকেরা মফিজুদ্দিনকে পঞ্চায়েতের প্রধান বানায়। ঔপন্যাসিকের ভাষায়:

> তারপর থেকে সুহাসিনী গ্রামে এবং ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নে আর নির্বাচন হয় নাই, নির্বাচন এলে গ্রামের লোকদের এই কথাটা জানা থাকে যে, মফিজুদ্দিন মিয়া নির্বাচনে দাঁড়াবে এবং সে প্রার্থী হলে আর কেউ প্রার্থী হবে না; এভাবে, গ্রামের লোকেরা দেখতে পায় যে, মফিজুদ্দিন একনাগাড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়। সুহাসিনীর মানুষের এই কথাটি জানা ছিল যে, মফিজুদ্দিন এক শ এগারো বছর জীবিত থাকবে, এবং যেকোনো কারণেই হোক, এ কথায় তাদের যেহেতু আস্থা জন্মে গিয়েছিল, তারা একসময় ধরে নিয়েছিল যে, এই এক শ এগারো বছর তাদের আর ভোট দেয়ার কোনো ব্যাপার নাই। (শহীদুল জহির ২০০৭: ৬৯)

ব্রিটিশ আমলের শেষাংশ থেকে আশির দশকে হত্যা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মফিজুদ্দিন অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রতিনিধি থাকে। এই দীর্ঘ সময়ের ভেতর সত্তরের দশকের কোনো এক নির্বাচনে সুরধ্বনি গ্রামের মেম্বার আফজাল খাঁ ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হওয়ার চেষ্টা করলে এলাকার লোকেরা তখন জীর্ণতার ভেতর থেকে পুরনো মফিজুদ্দিনকে আবিষ্কার করে। তারা সেদিন সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত মফিজুদ্দিনকে মাথা বাঁকানো লাঠি

হাতে একধরনের একরোখামির সঙ্গে সুরধ্বনি গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে। ফলে, মফিজুদ্দিনের দোস্তো করিম খাঁয়ের ছেলে আফজাল খাঁকে তার মত বদলাতে হয়। কিন্তু, আশির দশকে রায়গঞ্জ থানা উপজেলায় রূপান্তরিত হলে উপজেলা চেয়ারম্যান পদে আফজাল খাঁয়ের ছেলে ইদ্রিস খাঁ মফিজুদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়টি সুরাহার জন্য মিয়া ও খাঁ পরিবার একাধিকবার আলোচনায় বসলেও কোনো সমাধান হয় না। বরং মনোনয়নপত্র দাখিলের নির্দিষ্ট দিনের এক সপ্তাহ পূর্বে পূর্ণিমার রাতে মফিজুদ্দিন সপরিবারে নিহত হয় আততায়ীদের হাতে। এতে সুহাসিনীর মানুষেরা ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াতে পারবে বলে মনে করে। কিন্তু, তাদের প্রায় পঞ্চাশ বছরের ক্রমাগত অপেক্ষার আর শেষ হয় না। এবার ইদ্রিস খাঁ বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। কদিন পর পুলিশ সপরিবারে মফিজুদ্দিনকে হত্যার অভিযোগে ইদ্রিস খাঁকে গ্রেফতার করলে প্রমাণের অভাবে ইদ্রিস খাঁ ছয় মাস পরে ছাড়া পায়। এরপর "ইদ্রিস ভাই জিন্দাবাদ" শুরু হলে নয়নতারার হাটে বহু বছরের পুরনো কড়ুই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ইদ্রিস খাঁ সুহাসিনীর লোকদের তাদের "জীবন এবং সম্ভাবনা" ও "স্বপ্ন এবং বঞ্চনা"র কথা বলে। ইদ্রিস খাঁ একজন বেশ্যার নামে রাখা হাটের নাম বদলিয়ে 'রসুলপুরের হাট' নতুন নামকরণের ঘোষণা দেয়। সুহাসিনীর প্রাইমারি স্কুলের মাঠে বিরাট সভায় ইদ্রিস খাঁ ক্রমাগত মফিজুদ্দিনের অনাচারের বর্ণনা দেয়। ইদ্রিস খাঁ নূতন সময় শুরুর কথা শোনায়।

সে রাতে পূর্ণিমা ছিল উপন্যাসটির মূল আখ্যান-পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধুর ছায়াসন্ধান করা যায়। এখানে মফিজুদ্দিন মিয়াকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সুহাসিনীকে বাংলাদেশ আর গ্রামবাসীকে বাংলাদেশের জনগণরূপে কল্পনা করা অমূলক নয়। প্রান্তিক পর্যায় থেকে ধাপে ধাপে উঠে এসে নেতৃত্বের গুণে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বময় হওয়া একজন রাজনীতিক হিসেবে এবং পূর্ণিমার রাতে আততায়ীদের হাতে সপরিবারে নিহত হওয়ার নৃশংস চিত্রে মফিজুদ্দিন মিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের সাযুজ্য সহজেই অনুমেয়। এক্ষেত্রে দুটি নামের অদ্যাক্ষরে "ম" বর্ণের মিলও ইঙ্গিতবহ হতে পারে। উপন্যাসে বর্ণিত পাঁচটি উদ্ধৃতি বা অংশের আলোকে বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বিচার করা যুক্তিযুক্ত হবে:

১. আততায়ীদের হাতে ভাদ্র মাসের এক মেঘহীন পূর্ণিমা রাতে সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়া সপরিবারে নিহত হওয়ার পরদিন, গ্রামবাসীদের কেউ কেউ মহির সরকারের বাড়ির প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়। অনেকটা সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও তারা ঘটনার আকস্মিকতার বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারে না; মহির সরকারের বাড়ির বাইরের উঠোনে লম্বা বেঞ্চে গোবর এবং বিচালির গন্ধের ভেতর বাকরহিত হয়ে বসে থাকে এবং থেলো হুঁকোয় তামাক খায়। (২০০৭: ৫৩)

২. অমাবস্যার অন্ধকারের বদলে আততায়ীরা কেন পূর্ণিমার চন্দ্রালোকিত রাতকে বেছে নেয়, তা গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে না; তারা কেবল এই বিষয়টি ভেবে বিস্মিত হতে থাকে যে, মফিজুদ্দিন মিয়া কি করে মারা যেতে পারে, এ রকম তো হওয়ার কথা ছিল

না, তার তো ১১১ বৎসর বেঁচে থাকার কথা ছিল এবং তার বয়স তো মাত্র ৮১ বৎসর হয়েছিল বলে তারা জেনেছিল। (২০০৭: ৫৪)

৩. তারা বলে যে, বিস্ফোরণের শব্দে জেগে ওঠায় তাদের শরীরে কাঁপুনি দেখা দেয়, একাত্তর সনের মুক্তিযুদ্ধের পর তারা গ্রামে এমন শব্দ এবং বন্দুকের গুলির ফট ফট আওয়াজ আর শোনে নাই, কতক্ষণ ধরে তারা মানুষের চিৎকার শুনতে পেয়েছিল, তা তারা বলতে পারে না, তারা শুধু বলে, অনেকক্ষণ ধইর‍্যা; তারপর মিয়াবাড়ির ভিটার গাছপালার ঘেরের ভেতর থেকে তারা আগুনের শিখা জ্বলে উঠতে দেখে। মহির সরকারের বাড়ির উঠোনে বসে, এই ব্যাপারটি সম্পর্কে গ্রামের লোকেরা নিশ্চিত হয় যে, গুলি এবং বিস্ফোরণের শব্দ, মানুষের চিৎকার এবং আগুনের শিখার ভেতর মিয়াবাড়ির ভিটার দিকে তাকিয়ে আগের দিনের রাতে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মিয়াবাড়ির লোকেরা শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা বুঝতে পারে নাই, তারা কি করবে; তাদের মনে হয় যে, তখন তাদের কেমন অবসাদ লেগেছিল এবং বন্দুকের গুলি খাওয়ার ভয়ও হয়েছিল তাদের। (২০০৭: ৫৮)

৪. তাদের মনে পড়ে মফিজুদ্দিন মিয়ার গলার নিচ থেকে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত গুলির ক্ষত ছিল, লাশের সারিতে তার আট ছেলের প্রত্যেকে ছিল, ছিল ছেলেদের স্ত্রী এবং সন্তানেরা; মহির সরকারের উঠোনে বসে থাকা কৃষকেরা লাশের হিসেব করতে গিয়ে বিপর্যস্ত বোধ করে, কতজন ছিল মোট? (২০০৭: ৫৮-৫৯)

৫. সুহাসিনীর যারা তামাশা দেখার জন্য সেদিন বিছানার চাদর দিয়ে ঢাকা মঞ্চের সামনে বসেছিল তারা বলে যে, আফজাল খাঁ এবং তার দুই ছেলে ক্রমাগতভাবে খালি মফিজুদ্দিনের কথাই বলে; তারা গ্রামের লোকদের এই কথা বলে যে, মফিজুদ্দিনের অত্যাচারের দিন এখন শেষ হয়ে গেছে এবং এখন সুহাসিনীতে, ব্রহ্মগাছায় এবং রায়গঞ্জে শুরু হয়েছে নূতন যুগের। (২০০৭: ১৫৩)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি বা অংশগুলো থেকে কয়েকটি দিক বা উৎসমুখ (point) উন্মোচিত হয়; যথা: এক. আততায়ীদের হাতে পূর্ণিমার রাতে মফিজুদ্দিন মিয়া সপরিবারে নিহত হন। দুই. মফিজুদ্দিন মিয়া গলার নিচ থেকে হৃদপিণ্ড পর্যন্ত গুলিবিদ্ধ হন। তিন. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরে বিস্ফোরণের শব্দ, বন্দুকের গুলির ফট ফট আওয়াজ ও মানুষের চিৎকার সুহাসিনীতে প্রথম শোনা যায় সপরিবারে মফিজুদ্দিন মিয়া নিহত হওয়ার রাতেই। চার. সপরিবারে মফিজুদ্দিন মিয়ার হত্যাকাণ্ডের সময়ে বন্দুকের গুলি খাওয়ার ভয়ে গ্রামবাসীদের কেউই এগিয়ে আসে না। পাঁচ. মফিজুদ্দিন মিয়া নৃশংসভাবে নিহত হলে গ্রামবাসীদের কেউ কেউ বিস্মিত হয়, বাকরহিত হয়ে বসে থাকে, থেলো হুঁকোয় তামাক খায়; কিন্তু, শোক কিংবা প্রতিবাদ করে না। ছয়. মফিজুদ্দিন মিয়া নিহত হওয়ার পর নতুন নেতা, জনপ্রতিনিধি বা শাসকরূপে আবির্ভূত খাঁয়েরা ক্রমাগত মফিজুদ্দিনের অত্যাচারের কথা বলে। এবং সাত. মফিজুদ্দিন মিয়ার মৃত্যুর পরে নাম পরিবর্তন, রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার, নিহত ব্যক্তির নামে বিষোদগার, পরিবারতন্ত্রের উত্থান ইত্যাদি তামাশা সুহাসিনীতে তথাকথিত নূতন যুগের সূচনা ঘটায়। বাংলাদেশের ইতিহাস ও রাজনীতি অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এই দিক বা উৎসমুখগুলো একমাত্র বঙ্গবন্ধুর

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা, এক. বঙ্গবন্ধু আততায়ীদের হাতে রাতে সপরিবারে নিহত হন। সেরাতে সত্যিকার পূর্ণিমা ছিলো কিংবা ছিলো না; কিন্তু, ধানমণ্ডিতে বৈদ্যুতিক আলোর সুব্যবস্থা ছিলো। দুই. বঙ্গবন্ধুর শরীর ১৮ কিংবা ২৮টি গুলিতে ঝাঁজরা হয়েছিলো। ঘাতকরা তাঁর বুক বরাবর বুলেট ছুড়েছিলো। তাঁর মুখ বা মাথায় গুলি লাগে নি। তিন. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বর্বরোচিত সশস্ত্র হামলা হয় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের ওপর। ঘাতকরা সেরাতে সেনাবাহিনীর আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে মেরে ফেলেছিলো ১৬টি প্রাণ।[৭] চার. বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সময়ে তাঁকে বা তাঁর পরিবারকে বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসে নি, কিংবা এগিয়ে আসার সাহস প্রদর্শন করে নি। এক্ষেত্রে তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী ও কাছের মানুষরা হয়তো আত্মরক্ষাকেই শ্রেয় মনে করেছিলো। পাঁচ. বঙ্গবন্ধু নির্মম ও নৃশংসভাবে সপরিবারে হত্যা হলে সেদিন বা সেসময়ে অনেকেই বিস্মিত ও বাকরহিত হলেও কেউ শোক ও প্রতিবাদ করে নি। ইতিহাসের সাক্ষী বদরুদ্দীন উমর (জ. ১৯৩১) উল্লেখ করেছেন:

> ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছিলেন। যে কোনো লোকই এভাবে ঘটনাচক্রে নিহত হতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে যা উল্লেখযোগ্য তা হলো, তাঁর মতো একজন নেতার নিষ্ঠুরভাবে সপরিবারে নিহত হওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী। খুব ভোর বেলা এই ঘটনা জানাজানির পর দলে দলে মানুষ রাস্তায় বের হয়ে আসেন। লক্ষ্য করার বিষয় ছিল এঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে, ঘটনার প্রতিবাদের জন্য নয়। একজনকেও এর প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। এমনকি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ ছিল না। তারা কেউ রাস্তায় বের হয়ে বিক্ষোভ দেখায়নি। তাদের মতো সরকারী ক্ষমতায় থাকা বড় একটি দলের নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকে একটা লিফলেট কেউ কোথাও দেখেনি। দেয়ালে কোনো পোস্টার বা চিকা দেখা যায়নি। (বদরুদ্দীন উমর ২০১৩: ১৬৩)

উপন্যাসে মফিজুদ্দিন মিয়ার কথা ও কাজে সুহাসিনীর গ্রামবাসীদের আস্থা বা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিলো যে, মফিজুদ্দিন একশো এগারো বছর বাঁচবেন এবং সেপর্যন্ত তিনিই একক ক্ষমতার অধিকারী হবেন; কিন্তু, একাশি বছর বয়সে মফিজুদ্দিন মিয়া

---

[৭] *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে সংযোজিত "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন পরিচয় (১৯৫৫-১৯৭৫)" অংশে উল্লেখ রয়েছে: "১৫ই আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে নিহত হন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুননেছা, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ কামাল, পুত্র লে. শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই নাসের, ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিল আহমেদ এবং ১৪ বছরের কিশোর আবদুল নঈম খান রিন্টুসহ ১৬ জনকে ঘাতকরা হত্যা করে।" (শেখ মুজিবুর রহমান ২০২০: ৩০২)

আকস্মিকভাবে নিহত হওয়ায় তারা বিস্ময় প্রকাশ করে এবং ভোট দিতে পারার সম্ভাব্য সুযোগের চিন্তা ও কল্পনায় অনেকটা সুখ অনুভব করে। বাস্তবে, বঙ্গবন্ধুর নিহত হবার ক্ষেত্রেও কি এমনটি ঘটে নি? রাজনৈতিক বিশ্লেষকের অভিমত:

> সামরিক অফিসারদের একটা অংশ এবং আওয়ামী লীগের লোকজনরা যৌথভাবেই এই ঘটনা ঘটিয়েছিল। কিন্তু শুধু এটুকু বললেই এর সঠিক কারণ বোঝার উপায় নেই। দেশে একটা বাস্তব পরিস্থিতি তৈরী হওয়ার সুযোগ নিয়েই শেখ মুজিব হত্যা এবং তাঁর শাসন উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল। সেই বাস্তব পরিস্থিতিকে বাদ দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার বিষয়টির ব্যাখ্যা হতে পারে না। (বদরুদ্দীন উমর ২০১৩: ১৬৩)

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার "বাস্তব পরিস্থিতি " তৈরিতে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ তথা বাকশাল গঠনের বিষয়টি বিশেষভাবে উঠে আসে। কেননা, বহুদলীয় সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে একক জাতীয় দল গঠন ছিলো একনায়কতন্ত্রেরই নামান্তর।[৮] ছয়. বঙ্গবন্ধু হত্যা হওয়ার পরে নতুন জনপ্রতিনিধি বা শাসকরা ক্রমাগত বঙ্গবন্ধুর বাকশাল ও তাঁর অপশাসনের কথা প্রচার করে। দলীয় অনুচরদের প্রশ্রয়, ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও খামখেয়াল, দেশের সম্পদ লুট, ধর্মের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, সশস্ত্র বাহিনীকে অবহেলা ইত্যাদি অভিযোগে বঙ্গবন্ধুকে অভিযুক্ত করা হয় ঘাতকদের পক্ষ থেকে।[৯] এবং সাত. বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন, রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার, রাষ্ট্রধর্ম চালু, নিহত ব্যক্তির নামে বিষোদগার, পুঁজিবাদ ও পরিবারতন্ত্রের উত্থান, ক্ষমতাকে কুক্ষিগতকরণ, রাজনৈতিক আক্রোশ ও প্রতিহিংসা ইত্যাদি রাজনৈতিক তামাশা কিংবা অপসংস্কৃতির উত্থান ও চর্চা তো হয়েছে। হয়ে এসেছে। এখনও তা হয়, হচ্ছে। অর্থাৎ, *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শহীদুল জহির বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সপরিবারে নিহত হওয়ার নারকীয় ও মর্মন্তুদ ঘটনাকে অভিব্যঞ্জিত করে আমাদের জাতীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি ও চরিত্র-চারিত্র্য তথা স্বরূপকে অনুসন্ধান করেছেন।[১০] আর, এই অনুসন্ধানে দেখা যায় বা যাচ্ছে যে, পূর্ণিমার

[৮] *বাংলাদেশের রাজনীতি: সংঘাত ও পরিবর্তন* গ্রন্থে অধ্যাপক ড. আবুল ফজল হক উল্লেখ করেছেন: "১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হবার অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। উক্ত সংশোধনীর দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি ১৯৭৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী এক ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একক 'জাতীয় দল' গঠন করেন। ফলে সেদিন থেকে আওয়ামী লীগসহ সকল দল আইনতঃ বিলুপ্ত হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি মুজিব স্বয়ং জাতীয় দল তথা 'বাকশাল'-এর চেয়ারম্যান হন এবং সেই দল সংগঠন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা গ্রহণ করেন।" (১৯৯৪: ১৬৪-১৬৫)

[৯] রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সপক্ষে বঙ্গবন্ধুর অন্যতম ঘাতক লে. কর্ণেল ফারুক রহমানের যুক্তি কিংবা অপযুক্তিগুলো প্রকাশ ও প্রচার হয় ৩০শে মে ১৯৭৬ সালে *Sunday Times* পত্রিকায়। (বিস্তারিত: আবুল ফজল হক ১৯৯৪: ১৮৮)

[১০] যদিও একটি সাক্ষাৎকারে কথাশিল্পী কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের "উপন্যাসটির মূল চরিত্র মফিজুদ্দিনে কেউ শেখ মুজিবরের ছায়ারূপ লক্ষ করতে চান" মন্তব্যের উত্তরে শহীদুল জহির বলেছিলেন, "চাইলে ভুল

কুহকের মতোই রাজনীতির কুহক হলো আমাদের অপরিবর্তিত নিয়তির চক্রাকার।[১১] বহুকাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রের গুণগত পরিবর্তন কিংবা উত্তরণ এখানে অনুপস্থিত।

তিন.

স্বদেশ ও রাষ্ট্রভাবনার সঙ্গে সমূলে প্রোথিত শহীদুল জহিরের কথাসাহিত্য। কিন্তু, তিনি পূর্বসুরিদের থেকে আলাদা তাঁর নিয়মনিষ্ঠ নির্লিপ্তি ও নিরপেক্ষতার গুণে। যে-কারণে তিনি মুক্তিযুদ্ধ, রাজনীতি, রাজনীতিক, রাজনৈতিক দল ও প্রতীক ইত্যাদি বিষয়ে আবেগপ্রবণ ও আদর্শিক প্রয়াসকে পরিহার করে সত্যসন্ধান করতে চেয়েছেন। তাঁর এই সত্যসন্ধানে বঙ্গবন্ধু এক অনিবার্য ও অনোপেক্ষণীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাই, বঙ্গবন্ধুকে তিনি তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে রূপাদর্শ করেছেন। অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধু তাঁর কথাসাহিত্যে আইডিয়াল (ideal) নন, মডেল (model)। কোনো মানুষই যেমন ভুল-ত্রুটির বাহিরে নয়, তেমনি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও আলোচনা-সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। শহীদুল জহিরের কথাসাহিত্যে আমরা সেই বঙ্গবন্ধুকে পাই, যিনি আলোচনা ও সমালোচনা মিলেই বা নিয়েই একক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী—অম্লানোজ্জ্বল।

তথ্যসূত্র

আবুল ফজল হক (১৯৯৪), *বাংলাদেশের রাজনীতি: সংঘাত ও পরিবর্তন*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, রাজশাহী।

ওবায়েদ আকাশ সম্পাদিত (২০০৮), *শালুক* (শহীদুল জহির বিশেষ সংখ্যা), বর্ষ ৯, সংখ্যা ১০, ঢাকা।

কাজী সাহানা সুলতানা (২০১৫), 'শহীদুল জহিরের ছোটগল্পে জাদুবাস্তবতার রূপায়ণ', *উন্নয়ন সংকলন* (প্রধান সম্পা.: অধ্যাপক ড. মো. আমিনুর রহমান ও নির্বাহী সম্পা.: ড. মো. সুলতান মাহমুদ), ভলিয়ম ১১, সংখ্যা ১, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল স্টাডিজ, ঢাকা।

করবে। আমার তো মনে হয় মফিজুদ্দিন চরিত্রটিতে বিভিন্ন মেজাজের জাতীয় বুর্জোয়ার চেহারাই উন্মোচিত হয়।" (ওবায়েদ আকাশ সম্পা. ২০০৮: ১৯০) এক্ষেত্রে মনে রাখা আবশ্যক যে, একটি সাহিত্য বা শিল্পকর্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সবসময়ই এর স্রষ্টার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। আবার, প্রতিকূল পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় কিংবা রহস্য সৃষ্টিতে শিল্পকর্মটির স্রষ্টা অনেককিছু গোপন রাখতে চাইতেও পারেন। শহীদুল জহির পেশাগতভাবে যেহেতু সরকারি আমলা (সচিব) ছিলেন আমৃত্যু, তাঁকে যেহেতু ১৯৭৮ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারের সময়কালে চাকুরি করতে হয়েছে এবং বেঁচে থাকলে চাকুরি করতে হতো রাজনৈতিক সরকারের অধীনে, সেহেতু তিনি আলোচিত-সমালোচিত বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ টেনে ঝুঁকি নিবেন না, ঝুঁকি নিতে চান নি; এটাই স্বাভাবিক। তবে একথা সত্য যে, *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* বহুমাত্রিক উপন্যাস হওয়ায় ঔপন্যাসিক বঙ্গবন্ধু বিষয়ক ভাবনাকে বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত করেছেন।

[১১] অনুরূপ, আর একটি বক্তব্য বা উদ্ধৃতি প্রাণিধানযোগ্য: "বস্তুত, এ উপন্যাসে পূর্ণিমা হলো নিয়তির চক্রাকার; যা সুহাসিনী গ্রামের মানুষদের কখনো মুক্তি দেয় না, কুহকী হয়ে বারবার ফিরে আসে তাদের জীবনে।" (মাওলা প্রিন্স ২০১৯: ১৯৮)

বদরুদ্দীন উমর (২০১৩), '১৫ই আগস্ট এখন এবং ১৯৭৫ সালে', *বাঙলাদেশের রাজনীতি*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।

মাওলা প্রিন্স (২০১৯), 'চিরায়ত বাঙলা কথাসাহিত্য: বইপড়া কর্মসূচি', *কথাসাহিত্য পাঠ ও রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, মুক্তদুয়ার, ময়মনসিংহ।

মানস চৌধুরী (২০১০), 'যাপন-বাস্তবতাই রাজনীতিক: শহীদুল জহিরের পয়লা উপন্যাস পাঠ', *শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ* (মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সম্পাদিত), পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

মো. আমিনুর রহমান সম্পাদিত (২০১৫), *উন্নয়ন সংকলন*, ভলিয়ম ১১, সংখ্যা ১, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল স্টাডিজ, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সম্পাদিত (২০১০), *শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

রবিউল করিম (২০১০), 'করুণ চিলের মতো সারাদিন, সারাদিন শুধু ঘুরি', *শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ* (মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সম্পাদিত), পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

রবিন পাল (২০১৪), 'জাদু বাস্তবতা: বাস্তবতার ভিন্ন স্বর', *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব : ধ্রুপদী ও আধুনিক* (হাবিব রহমান সংকলিত ও সম্পাদিত), কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

শহীদুল জহির (২০০৬), *শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প*, সমাবেশ, ঢাকা।

শহীদুল জহির (২০০৭), *শহীদুল জহির নির্বাচিত উপন্যাস*, সমাবেশ, ঢাকা।

শহীদুল জহির (২০১২), *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প*, তৃতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০২০), *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, সুলভ ষষ্ঠ মুদ্রণ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

হাবিব রহমান সম্পাদিত (২০১৪), *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব: ধ্রুপদী ও আধুনিক*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

web: https://bn.wikipedia.org/wiki (02.02.2020).

রুদ্রমঙ্গল
মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা ॥ ১৪২৭-১৪২৮ ॥ ২০২০-২০২১ ॥ ISSN 2415-4695
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

লিপিমিতা পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ

মাসুদ রহমান*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে ভারত সরকার ও জনগণ সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা দিয়েছিল। আধুনিক যুগের অন্যতম অনুষঙ্গ পত্রপত্রিকারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এসময়। ভারতের মূলধারার সংবাদপত্রের পাশাপাশি অনেক সাময়িক-সাহিত্যপত্রও এগিয়ে এসেছিল ইতিবাচক মনোভঙ্গি নিয়ে। এমনি একটি পত্রিকা ছিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার মাসিক *লিপিমিতা* পত্রিকা। পত্রিকাটি পরিচালিত হতো পত্রমিতাদের সংগঠন বিশ্বমিতালী সঙ্ঘ কর্তৃক, যাদের সদস্য ছিল বিশ্বব্যাপী। পত্রিকাটির উনিশশত একাত্তর সালের প্রতিটি সংখ্যায় বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির সংগ্রাম-বীরত্ব, ত্যাগ-তিতিক্ষা নানাভাবে প্রসঙ্গ হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সেসময় চলমান বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম নিয়ে লেখকদের সৃজনশীল লেখা এবং তথ্য-বিশ্লেষণঋদ্ধ প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। নিয়মিত বিভাগগুলোতেও বিশেষ দৃষ্টিকোণে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার জন্য সাহায্য ভাণ্ডারও খুলেছিল সংগঠনটি। অধুনালুপ্ত এই পত্রিকাটির পরিচয় প্রদানসহ মুক্তিযুদ্ধে এর ভূমিকা ও কার্যক্রমের বিস্মৃত ইতিহাস বর্তমান আলোচনায় প্রথমবারের মতো উঠে এসেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টি কারো অজানা নয়। যুদ্ধ শুরু হলে প্রতিবেশী এই দেশটিতে আশ্রয় নিয়েছিল প্রায় এক কোটি বাঙালি। এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে দেশটি দীর্ঘদিন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানসহ বাঁচানোর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মানুষের বঞ্চনা-বিপর্যয়ের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে বিশ্ববাসীর সমর্থন আনতে সহায়তা দিয়েছে। শেষদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে নিজেকেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছে যুদ্ধে। ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনা কিছু থাকতেই পারে, তবে এটাই সত্য যে, ভারতের গণতান্ত্রিক সরকারের বাংলাদেশকে এই সার্বিক সাহায্য-সমর্থন প্রদানের ক্ষেত্রে সেদেশের জনগণের

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী

আবেদনও ক্রিয়াশীল ছিল। সমগ্র ভারতের সচেতন-সমর্থনদানকারী মানুষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের অন্তরের আবেগ স্বভাবতই অধিক মাত্রায় ছিল। শরণার্থীদের মানবিক সাহায্য প্রদান, মুক্তিকামী বাঙালিদের জন্যে মাঠে-ময়দানে সোচ্চার কার্যক্রম চালানোর পাশাপাশি পত্রপত্রিকাও ছিল সমর্থন ব্যক্ত ও সাহস যোগানোর একটি মাধ্যম। পশ্চিমবাংলার সংবাদ-সাময়িক পত্রের সেসব ভূমিকা কমবেশি ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে। বিশেষ করে *আনন্দবাজার*, *অমৃতবাজার*, *যুগান্তরের* মতো প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের কথা সকলেই অবগত। সেসময় বাংলাদেশ ভূখণ্ডে গোপনে এবং পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা থেকে বেশ কিছু পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধের কলমসৈনিকেরা বের করেছেন। *জয়বাংলা*, *অগ্রদূত*, *স্বদেশ*, *জন্মভূমি*, *অভিযান*, *বঙ্গবাসী*, *স্বাধীন বাংলা* ইত্যাদি অনিয়মিত পত্রিকার নাম আমরা জানি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এমনই একটি পত্রিকা *লিপিমিতার* কথা আলোচনা জন্য করবো, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এখনও অসম্পূর্ণ বা চলমান ইতিহাস রচনার মধ্যে আজো অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অথচ সার্বিক বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গের এই পত্রিকাটির ভূমিকা অনন্য ও বহুমাত্রিক ছিল বলে স্বীকার করতেই হবে। কারণ, পত্রিকাটির মূল পরিচয় ছিল যে, এটি একটি পত্রমিতালী সংগঠনের মাসিক মুখপত্র। এ জাতীয় সংগঠন বা পত্রিকাই এখন হয়ে গেছে ইতিহাসের অংশভূত।

ছিন্নপত্র একাধারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত পত্র ও শিল্পোত্তীর্ণ সাহিত্য। এর ১৪১ নম্বর পত্রে তিনি চিঠি বিষয়ক তত্ত্ব পেশ করে লিখেছেন:

> চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সাথে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, চিঠিপত্রদ্বারা তার চেয়ে আরো একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি। চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরো একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি ও যেরকম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না। আবার লেখায় যতখানি করে মুখের কথায় ততখানি করতে পারে না। এই কারণে, চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *ছিন্নপত্র* ১৪১১: ২৭০)

কিছুদিন আগেও মানুষ এই "নতুন ইন্দ্রিয়ের" ব্যাপক ব্যবহার করে এসেছে একদিকে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য মতো—"নিজের স্বগত উক্তিকে সুব্যক্ত পরিস্ফুট করে তোলবার ইচ্ছে" (রবীন্দ্রনাথ *ছিন্নপত্রাবলী* ১৪১১: ১৮৪) থেকে, অপরদিকে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমঝোতার জন্যে। এর ব্যবহার শুধু পারিবারিক-সাংসারিক পর্যায়েই সীমিত থাকেনি, অপরিচিতের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যে, অজানাকে জানার প্রয়োজনেও। এই সুবাদে পত্রমিতালী সংস্কৃতির প্রবর্তনা। কোনো পত্রিকা বা সংগঠনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে চেনাজানা হতো পত্র বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। বিষয়টির জনপ্রিয়তা এতোটাই ছিল যে, দেশ-বিদেশের আগ্রহেচ্ছুদের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি জানিয়ে সাধারণ খবরের কাগজ, সাময়িকপত্রে একটি বিভাগ থাকতো পত্রমিতাদের

যোগাযোগ সহজসাধ্য করার জন্য। আবার শুধু পত্রমিতালীর জন্যও সংকলন কিংবা পত্রিকা বের হতো। এ জাতীয় পত্রিকাতে অন্যান্য বিষয়ও থাকতো, তবে প্রায়শ তা পত্রমিতাদের অংশগ্রহণেই গ্রন্থিত হতো। এরকমই একটি পত্রিকা ছিল *লিপিমিতা*।

পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলীর উত্তরপাড়ার বিশ্বমিতালী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা বরেন্দ্র সুন্দর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ৪৮ রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটের বাড়িটিই ছিল পত্রিকার কার্যালয়। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে মাসিক *লিপিমিতার* যাত্রা শুরু। প্রতিমাসেই যে নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারতো, এমন নয়। মাঝে-মধ্যে দু-তিন মাস যৌথ সংখ্যা রূপে বের হতো। আর্থিক সংকটই এর প্রধান কারণ ছিল। মূলত সদস্যদের গ্রাহক চাঁদা ও অতিরিক্ত অর্থসাহায্য দিয়ে পত্রিকা পরিচালিত হতো। কয়েকবছর অন্তর মিতা সম্মেলন হতো। কয়েক প্রকারের মিতা ছিল। বার্ষিক চাঁদাদাতারা হতেন সাধারণ মিতা, দুবছরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হতেন তাঁদের বিশ্বমিতা বলা হতো। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে বাঙালি-অবাঙালি যাঁরা সদস্য হতেন তাঁরা বৈদেশিক মিতা। পত্রিকা পরিচালনা বা সাংগঠনিক দায়িত্ব যাঁরা পালন করতেন তাঁদের বলা হতো সঙ্ঘমিতা। মাসিক এই পত্রিকাটির নিবন্ধনে মুদ্রাকর, প্রকাশক, সম্পাদক হিসেবে ছিলেন জগন্নাথ জানা। তিনিও হুগলীর মানুষ ছিলেন। তবে বরেন্দ্র সুন্দরই ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক। পত্রিকাটির মুদ্রণ কার্য চলতো হাওড়ার বেঙ্গল প্রেসে।

পত্রিকাটিতে মিতাদের লেখা, প্রশ্ন-উত্তর ইত্যাদির সাথে সাথে নাম-পরিচয় ছাপা হতো। পরিচয়ে ঠিকানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট মিতার পছন্দ বা শখের বিষয় উল্লেখ করা হতো। এক্ষেত্রে সাহিত্য-শিল্প, খেলাধুলা, ডাকটিকেটসহ রাজনীতি এমনকি হাঁসমুরগি পালনও শখ বা প্রিয় বিষয় হিসেবে উল্লিখিত হতো। বিষয়গুলো প্রথমে ক, খ ইত্যাদি বর্ণপ্রতীকে তালিকাভুক্ত করে দেখানো হতো; তারপর মিতাদের নাম-ঠিকানার পাশে এক বা একাধিক বর্ণ দিয়ে নির্দেশিত হতো। এসব তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে প্রায় সব রাজ্যেই বিশ্বমিতালী সঙ্ঘের মিতা বা সদস্য ছিল। ভারতের বাইরে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান হয়ে এশিয়া ছাড়িয়ে ইউরোপ-আমেরিকাতেও সংগঠনের মিতা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। আমাদের ব্যবহৃত সংখ্যাগুলোতে যেসব মিতার পরিচয় আছে, তাঁরা সকলেই বাঙালি ছিলেন। সেই অর্থে বলা চলে সঙ্ঘটি ছিল বিশ্বব্যাপী বাঙালির একটি প্রাণের সংগঠন ও পত্রিকা *লিপিমিতা* ছিল সেই বিশ্ববাঙালিদের অন্তরভাষ্য। পত্রিকাটি যখন বারোতম বছরে পড়ে, তখন সমগ্র বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক নতুন ঘটনা ঘটে। এই প্রথম বাঙালি তার জাতীয়তার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হলো। স্বভাবতই এই ঐতিহাসিক, নবদিগন্ত-উন্মোচক ঘটনাটি বিশ্বমিতালী সঙ্ঘের সদস্যদের প্রাণে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। বাঙালি জাতির নতুন এক শক্তি-সাহস-সাধনার পরিচয় পেয়ে বিশ্বের সকল প্রান্তের বাঙালিরাই উদ্দীপ্ত-গর্বিত হলো। অনিবার্যভাবেই অহংকারের কেন্দ্রে যে মানুষটি অলঙ্কৃত হলেন তিনি বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান। এসময় প্রকাশিত পত্রিকাটির পাতায় পাতায় সেই আবেগ-সহমর্মিতা-সমর্থনের সাক্ষ্য মিলবে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরের *লিপিমিতা* ছিল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ সংখ্যা। অল্প সময়ের মধ্যে, সাবেকি মুদ্রণ-প্রযুক্তির নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও মাত্র শুরু হওয়া বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের মতো অভূতপূর্ব ঘটনার অনুভূতি-প্রতিক্রিয়ার কিছু রূপদান করে সংখ্যাটি বের করা হয়। এ সংখ্যা তো বটেই, আমরা দেখি, এর পরের চারটি যথাক্রমে আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৮, ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৮, অঘ্রান-পৌষ-মাঘ ১৩৭৮, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮—অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশকে বিষয় করে নানা ধরনের লেখালেখি বের করেছে *লিপিমিতা*। এবারে আমরা লেখাগুলোর পরিচিতি-পর্যালোচনায় প্রয়াসী হবো।

পত্রমিতালী বিষয়ক পত্রপত্রিকায় রাশিফল ও ভাগ্যগণনা বিশেষ গুরুত্বসহ পেশ করা হতো। *লিপিমিতাও* তার ব্যতিক্রম ছিল না। বছরের প্রথম সংখ্যায় যথারীতি বেশ পরিমাণেই ছিল এগুলো। বাংলা ইংরেজি তারিখ মিলিয়ে পূজা-পার্বণ, জাতীয়-আন্তর্জাতিক দিবসের উল্লেখ করে দিনপঞ্জি, বিভিন্ন রাশির আসন্ন বর্ষ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীসহ যুক্ত হয়েছিল "কয়েকটি রাষ্ট্রের সম্ভাব্য বর্ষফল"। আমেরিকা-রাশিয়া-চীনের মতো ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসহ ভারতের পাশাপাশি তৎকালীন পাকিস্তান সম্পর্কেও "ভবিষ্যদ্বাণী" করা হয়। পাকিস্তান প্রসঙ্গে লেখা হয়:

> পাকিস্তানের সাময়িক [সামরিক] শাসন কায়েম রাখার চেষ্টা দুর্বল হয়ে পড়বে। এবং খুব সম্ভব ভেঙ্গেও পড়তে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় খণ্ডে গণ বিক্ষোভ ও গৃহ যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করবে। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনাও আছে। পূর্ব পাকিস্তানে গণ আন্দোলন দানা বেধে উঠবে এবং সামরিক পীড়ন চলা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমানের অধিনায়কত্বে জনসঙ্ঘ সুশৃঙ্খল গণতন্ত্রপথে এগিয়ে যাবে। শেখ মুজিবরের কয়েক বার প্রাণ নাশের চেষ্টা চলবে। বর্তমান বর্ষেও পূর্ব বঙ্গে প্রবল বন্যা ঝটিকা ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বহু লোক ধ্বংস হবে। ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসার শিল্প শ্রম শিল্পমূলক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের মধ্যে সময়োচিত নানা প্রকার সাহায্য দানের দ্বারা সরকারের কল্যাণ প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হলেও অব্যাহত থাকবে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগ ক্রমশ সুদৃঢ় হয়ে উঠবে। (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮: ৪৮)

রাশিফল-ভাগ্যগণনা ইত্যাদি বিশ্বাস করার লোক যুগে যুগে আছেই, তবে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা এসব আমলে আনতে চান না। সেসব তর্কে না যেয়েও আমরা বলতে পারি, উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি-অংশে কিছুটা ছিল বিগত বছরের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, আর ছিল পূর্ববঙ্গের মানুষ তথা বাঙালির উত্তরণ কামনা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্য দিয়ে সে আশা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলেই তাঁর প্রাণনাশের শঙ্কাও করেছিল পত্রিকাটি। কাজেই এই ভবিষ্য-গণনা ছিল বস্তুত বাঙালির প্রতি শুভকামনার প্রকাশ মাত্র।

আমাদের এই দাবির প্রমাণ মিলবে ওই সংখ্যার "বিশ্বদূতের আসরে" নামীয় সম্পাদকীয় কলামে। বিশ্বদূত ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা বরেন্দ্র সুন্দর চট্টোপাধ্যায়। সাপ্তাহিক আসরটির "নববর্ষের শুভেচ্ছা" শীর্ষক কলামে তিনি নিম্নরূপে বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধিকে কেন্দ্র করে বাঙালির ঋদ্ধ আগামীকে অবলোকন করতে চেয়েছেন:

> পাকিস্তানের দীর্ঘ সমুদ্র মন্থনের পর পেয়েছি আমরা পরম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। হৃতসর্বস্ব হতগৌরব বাংলাদেশকে আবার সোনার আসনে বসাবার জন্য পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী ভাইবোনেরা বদ্ধপরিকর। ভাগিরথীর এপারে এসেছে ইন্দিরার যুগ আর ওপারে এসেছে মুজিবুরের যুগ। দুই যুগের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়েছে বিদায়ী ১৩৭৭। এই একটিমাত্র কারণে ১৩৭৭-এর দগ্ধ ললাটে পরিয়ে দিলাম জয়ের তিলক। (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮: ৯২-৯৩)

এ সংখ্যায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছিল "সোনার বাংলা" শিরোনামে ক্রোড়পত্র। শুরুতে হাতে আঁকা বঙ্গবন্ধুর ছবির উপরে লেখা ছিল "স্বাধীন বাংলার জনপ্রিয়" এবং ছবির নিচে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান"। আলোচনার শুরুতে পৃথকভাবে উদ্ধৃত ছিল রবীন্দ্র-কাব্যপঙ্‌ক্তি:

> ঐ অমর মরণ রক্ত চরণ
> নাচিছে সগৌরবে,
> সময় হয়েছে নিকট এখন
> বাঁধন ছিড়িতে হবে।
> (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮: ৯৫)

কলামের শুরুতেও ছিল বরীন্দ্রবাণী এবং নির্বাচনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, লেখকের বিবেচনাবোধের পরিচায়ক, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের বাংলা দীর্ঘদিন অবসাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল এতোদিন, সেই বাংলার পূর্ব দিগন্তে "জাগরণের মন্ত্রপাঠ" শুনতে পেয়েছেন লেখক। তবে আলোচনার পুরোটাই যে এমনি কাব্যিক ভাবে চলেছে তা নয়, পশ্চিম পাকিস্তানিরা যে নির্যাতন-বঞ্চনা চালাচ্ছিল পূর্বাংশের প্রতি, এ নিয়ে নানা বিষয়ের তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনসহ তার বর্ণনা রয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার মোহজালে আটকিয়ে বিভ্রান্ত করার ইতিহাসও উল্লেখিত হয়েছে। তারপর বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-মেঘনার তীরে তীরে যখন মুক্তির আন্দোলন শুরু হলো তখন ইয়াহিয়ার আদেশে যে নরমেধযজ্ঞ শুরু হয়েছে তার সত্যনিষ্ঠ বিবরণও তুলে ধরা হয়েছে। তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলায় যে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো যে তখনও পর্যন্ত বাঙালির ন্যায্য ও অনিবার্য এই সংগ্রামের যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি সে বিষয়ে আক্ষেপ আছে, তবে হতাশ্বাস নেই। কারণ লেখক মনে করেন, "পৃথিবীর সমস্ত জাত বিরুদ্ধে গেলেও স্বাধীন বাংলা জয়যুক্ত হবেই"—এই বিশ্বাসে আবারও রবীন্দ্র-বাণী দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে সম্পাদকীয়—

> উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
> ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
> নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
> ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।
> (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮: ৯৯)

একটি নিয়মিত মাসিক পত্রিকা যা সেকালের সময়সাপেক্ষ মুদ্রণপ্রযুক্তিতে ছাপাতে হতো এবং বেশ পূর্ব থেকে সদস্যদের থেকে লেখা নিয়ে পাণ্ডুলিপি তৈরির বিষয় ছিল, সেখানে এতো দ্রুত পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের আন্দোলন-সংগ্রামকে বিষয়ীভূত করে একাধিক নিয়মিত ও সম্পাদকীয় উপস্থাপন সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য।

তবে এই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতে মিতাদের নিকট থেকে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ বিষয়ে লেখা গ্রহণ করার সময় পাওয়া যায়নি। ইতঃপূর্বে সংগৃহীত যেসব লেখা নির্বাচিত হয়েছিল, তাতে সমকালীন প্রসঙ্গ বলতে ছিল পশ্চিমবঙ্গের "নকশালি হানাহানি"। পরবর্তী আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৮ সংখ্যা থেকে পাওয়া যাচ্ছে মিতাদের সৃজনশীল রচনা। হাওড়ার গোপা মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন *জয় বাংলা* শীর্ষক কবিতা, একই এলাকার শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের কবিতার নাম ছিল *শেষ বিচারের ভার*। এছাড়া নিয়মিত পাতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ ছাড়াও এ বিষয়ে সংগঠনের বিশেষ উদ্যোগের কথা জানা যায়।

গোপা মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় জানিয়েছেন সারা বাংলা জুড়ে এখন দেখা যায় আল্পনা—বাংলা মায়ের বীর সন্তানদের রক্তে সে আল্পনা আঁকা হয়েছে। তারপরও বঙ্গবন্ধুকে ভরসা করে কবির আশা:

> সোনার বাংলা শ্মশান করেছে
> দরিয়ার পানি রক্তে ভরেছে
> 'জয় বাংলার' মন্ত্র তবুও
> কাড়তে পেরেছে কে–
> জঙ্গী শাসক দেখ ঐ চেয়ে
> মুজিবরে আজ দেশ গেছে ছেয়ে
> শত সহস্র রোশেনারা আসে
> রুখবে তাদের কে।
> (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৮: ১৪৪)

কবিতাটির শেষে সীমান্ত পারের বাঙালিদের জন্য রয়েছে দুঃখের পাশাপাশি গর্ব, আশাবাদ ও আহ্বান:

> এপার বাংলা গর্বে ও দুঃখে
> চেয়ে আছে শুধু ওপারের পানে
> যেথা তারি ভাই; হাঁকে চল যাই
> শহীদ হবিরে কে।
> (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৮: ১৪৪)

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় আবেগী উচ্চারণের সাথে সাথে, বিশেষ বৈশ্বিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। শুরুটা ছিল নিম্নরূপ:

> ছোট কথা সংগ্রাম
> আর একটা কথা স্বাধীনতা
> দুয়ে মিলে যা' হয় তার
> সমষ্টি দেখে এলাম স্বাধীন বাংলায়।
> সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ এক
> দাবি চায়—নেতা কিন্তু এক
>
> (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৮: ১৪৫)

এই একজন নেতা বঙ্গবন্ধু আর তাঁর এক দাবি স্বাধীনতা; আর সে জন্যেই বাংলায় চলছে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতন। সমাজ সচেতন কবি তাঁর কবিতার শেষে বাংলাদেশের এই সংগ্রামের পাশাপাশি এশিয়ার আরেকটি দেশের সমিল লক্ষ করে বলেছেন:

> জেনে রেখ,—স্বাধীনতা সংগ্রামের
> একই নাম বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম।
>
> (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৮: ১৪৫)

এই ভিয়েতনামের সাথে তুলনা করাটা ছিল বিশেষ তাৎপর্যবহ। মুক্তিযুদ্ধের কালেই আমেরিকার কিছু তৎপরতার কারণেই মুজিবনগর সরকারের পক্ষে ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত BANGLADESH বুলেটিনের ২৫ আগস্ট ১৯৭১ সংখ্যায় সংবাদ শিরোনাম ছিল: U. S. ARMS TO PAKISTAN: Prelude to a 'New Vietnam'? (*বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড*, ২০০৯: ৪৯৪)। ভিয়েতনামে দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে সামরিক আগ্রাসনের জন্য সাধারণ মার্কিনিদের পর্যন্ত যুক্ত করা হয়েছিল। আর অস্ত্রশস্ত্র তো নিয়মিতই যোগান দেওয়া চলছিল। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন নিক্সন সরকার ভিয়েতনাম থেকে পাকিস্তানের করাচিতে বিপুল সংখ্যক অস্ত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলে বাংলাদেশ আরেকটি ভিয়েতনাম হতে যাচ্ছে কিনা সে প্রসঙ্গ ওঠে। তবে মানবতাবাদী ফরাসি সাহিত্যিক আদ্রে মালরো নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক *টাইমস* পত্রিকায় এক চিঠিতে কিছুদিন আগেই (২ আগস্ট) বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বলেছিলেন:

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অচিরেই এশিয়া ভূখণ্ডে এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সমস্যাটি হলো বাংলাদেশ। "ভিয়েতনামের অনুরূপ" রূপ নিয়ে দেখা দেবে এই সমস্যা। কিন্তু ভিয়েতনামের সাথে ব্যতিক্রম বাংলাদেশের। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৭৮ মিলিয়ন। আর এই জনসংখ্যা মাওবাদ দ্বারা নয়, অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদ দ্বারা। আমেরিকানদের বাংলাদেশ সম্পর্কে বর্তমান শান্ত অঞ্চল ভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড ২০০৯: ৭১)

এসবের বিবেচনায় আমরা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে একটা প্রাগ্রসর বৈশ্বিক দৃষ্টি দেখতে পাই। তিনি কবিতার সমাপ্তিতে যে একবারেই বিক্ষিপ্তভাবে ভিয়েতনামের নাম

নিয়েছিলেন, তা নয়। "নিষ্ঠুর জল্লাদকে কি কাঠগড়ায় দাঁড়/ করাবার মত নেই কোন বিশ্ব আইনের/ সংজ্ঞা?" (মাসিক *লিপিমিতা*, হুগলী, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৮: ১৪৫) বলে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাতে সমকালীন নীতিহীন, শক্তিধর দেশগুলোর সমর-উন্মাদনার বিষয়ে সচেতনতার প্রমাণ মেলে।

এই সংখ্যায় "বিশ্বদূতের আসরে" বিভাগের কলামের নাম ছিল "নয়নে-নয়নে"। প্রতিবারের মতো বিভিন্ন সমকালীন বিষয়ে লেখক মজলিশি ঢঙে কথা বলেছেন, তবে শিরোনামটিই এসেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সুবাদে। সেবছর কলকাতায় বিশেষভাবে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল বিশেষ ভাইরাস আক্রমণের প্রতিক্রিয়ামূলক অসুস্থতা conjunctivitis। জ্বর ও মাথাব্যথার পাশাপাশি বিশেষ যেটা বিড়ম্বনা দিতো তা হলো চোখ লাল হয়ে ফুলে যাওয়া। সাধারণেরা একে চোখ ওঠা বা চোখ ফোটা বলে। সম্ভবত সেবারই পশ্চিমবঙ্গসহ সারা দেশেই এটা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে অনেকে এই প্রথম রোগটির সাথে পরিচিত হয়। আবার এই ক'দিন আগে পূর্ববাংলাকে স্বাধীন বাংলাদেশ করতে "জয় বাংলা" স্লোগান দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্রচুর শরণার্থী এসেছে সেখান থেকে। তাদের সমর্থনে চারিদিক "জয় বাংলা" ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে। এই দুই নতুন ঘটনার একটা মেলবন্ধন হয়ে গেল কখন যেন। লোকে ভাইরাসজনিত ওই অসুস্থতার নাম দিল "জয় বাংলা"। কেউ আক্রান্ত হলে বলা হতো "অমুকের 'জয় বাংলা' হয়েছে।" তখন অবশ্য অনেককিছুরই নামে "জয় বাংলা" চালু হয়ে গিয়েছিল। তবে পশ্চিমবাংলায় এখনও রোগটির এরকম পরিচিতি রয়ে গেছে। আহমদ ছফার একটি উপন্যাসে শরণার্থী-কথক এ প্রসঙ্গ টেনে বলেছে:

> জয়বাংলা সাবান, জয়বাংলা ছাতা কতকিছু জিনিস বাজারে বাজারে ছেড়েছে কলকাতার ব্যবসায়ীরা। দামে সস্তা টেকার বেলায়ও তেমন। বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের ট্যাকের দিকে নজর রেখে এ সকল পণ্য বাজারে ছাড়া হয়েছে। কিছুদিন আগে যে চোখওঠা রোগটি ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, কলকাতার মানুষ মমতাবশত তারও নামকরণ করেছিল জয়বাংলা। এই সকল কারণে খুব ভদ্র অর্থেও কেউ যখন আমাদের জয়বাংলার মানুষ বলে চিহ্নিত করে অল্পস্বল্প বিব্রত না হয়ে উপায় থাকে না। (আহমদ ছফা *অলাতচক্র* ২০১২: ৮)

তবে "বিশ্বদূতের আসরে"র চলতি কলামে বিষয়টিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতেই বর্ণনা করা হয়েছিল। আড্ডার এক পর্যায়ে সুধীর নামক ইতিহাসের ছাত্র বলেছে:

> ফরাসী বিপ্লবের সময়ও এমনটি ঘটেছিল। হঠাৎ দেশশুদ্ধ লোকের মাথা ধরতে লাগলো, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, তিনদিন মাথা তুলতে না পারা এমনি আরও কত কি! দলনায়ক রব্‌স পিয়ের এই হেড-এক-কে লিবার্তি বা মুক্তি নামে অভিহিত করেন। রুশ বিপ্লবের সময়ও সারা ইউরোপে ফ্লুর উৎপাত শুরু হয়। জনসাধারণ এর নাম দিলে বলশেভিক। তখনকার পত্রপত্রিকা নেড়ে-চেড়ে দেখোগে আমি বাজে কথা বলছি না। জয় বাংলা একটা আকস্মিক অভাবনীয় ঘটনা। এই চোখ ওঠাও তাই। এর ভেতর শ্লেষ বা বক্রোক্তি কিছুই নেই। (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৮: ১১২)

বস্তুত দেখা গেল, আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে বিশ্বের দুটো বড়ো ঘটনার সাথে তুলনা করেছেন "বিশ্বদূত"।

আমাদের সেই সংগ্রামমুখর দিনগুলোতে শুধু কলম চালিয়েই যে বিশ্বমিতালী সঙ্ঘ বা *লিপিমিতা* পত্রিকা দায় সারেনি, সক্রিয় সহযোগিতাও দিয়েছিল, সেকথাটি তুলে ধরা যেতে পারে। স্বাধীনতা যুদ্ধে ১৩৭৮-এর নববর্ষ সংখ্যার সাথে পত্রমিতাদের নিকট মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য পত্রিকার পক্ষ থেকে আলাদাভাবে আবেদন জানানো হয়েছিল। আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৮ সংখ্যা থেকে পত্রিকাটি "বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ও মুক্তি ফৌজের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার" নামে এই উদ্যোগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের পাশাপাশি সাহায্যদাতাদের নাম ও প্রদত্ত অর্থসাহায্যের পরিমাণ প্রকাশ করেছে। তালিকায় দেখা যাচ্ছে এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত অর্থ সাহায্য এসেছিল।

অবশ্য প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ যে আশানুরূপ ছিল না, সেটি গোপন করেননি উদ্যোক্তারা। মুক্তিফৌজসহ উদ্বাস্তুদের জন্য বস্ত্র, শিশুখাদ্য, ঔষধপত্রের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করার ইচ্ছা ছিল সঙ্ঘের। তাদের আশা ছিল অন্তত হাজার খানেক টাকা সংগৃহীত হবে, কিন্তু এ পর্যায়ে মোট টাকা উঠেছিল একশত তিরানব্বই মাত্র। তাই তালিকা প্রদানের আগে "দুঃখের সঙ্গে" বলা হয়েছে:

> প্রত্যহ পূর্ব বাংলা থেকে যে ভাবে অগণিত উদ্বাস্তু আসছেন তাতে পশ্চিম বঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বার কথা। অথচ এদেরকে আহার, বাসস্থান, পরিধানের বস্ত্র ও চিকিৎসার সুবিধাদান দিতেই হবে, নচেৎ তাদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। তারাও আমাদের ভাই-বোন, পিতৃ-মাতৃ স্থানীয়। আমরা যদি দু বেলা দু মুঠো খেতে পাই ওদেরকেও তা থেকে ভাগ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। প্রতিটি সভ্য সভ্যার কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ তারা যেন সাধ্যানুযায়ী অর্থ পাঠিয়ে আমাদের দেশের, জাতির ও সঙ্ঘের সুনাম বজায় রাখতে সক্ষম হন। (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৮: ১৭৩)

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সংগঠন ও পত্রিকাটির আবেগ অকৃত্রিমভাবে উন্মোচিত হয়েছে। এরপর জানানো হয় যে, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে অর্থ প্রেরণ করা যাবে। পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকটি সংখ্যায় অর্থসাহায্যের তালিকা দেখা গেছে।

পরবর্তী সংখ্যা বের হতে আরো একটু বিলম্ব ঘটে, ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক—তিনটি মাস মিলিয়ে যৌথ সংখ্যা বের হয়। এই ১২ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় আরেকটি নিয়মিত বিভাগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশেষ গুরুত্ব-নির্দেশক ঘটনা হিসেবে প্রাসঙ্গিক হলো। পত্রিকাটির ১১ বর্ষ ৩ সংখ্যা থেকে "স্মৃতিবাসরে বিশ্ব পরিচয়" নামক বিভাগ চালু হয়েছিল। কথারম্ভে সংকলক শ্রীডুবুরী বলেছেন:

> মহাসাগরের বুকে ডুবুরিরা নেমে যেমন মণি মুক্তা বিভিন্ন রত্ন আহরণ করে এনে তুলে দেয় তাদেরই আপনজনের হাতে, তেমনি আমিও মহাকালের গর্ভ থেকে স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে সংগ্রহ করে মিতাভাইবোনদের করপটে উপহার দিতে মনস্থ করেছি। (মাসিক *লিপিমিতা*, হুগলী, ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৮: ২০৭)

এবারের কিস্তিতে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ১৩ মে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা টানা হয়েছে। মাত্র চার পৃষ্ঠাব্যাপী এই ইতিহাস-বিবৃতিতেও নিম্নোক্তভাবে স্থান পেয়েছে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের কথা:

> ১৯৭১, ২৫ শে মার্চ—গভীর রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের পাঠান বাহিনী পূর্ব বাংলার ঢাকা ও চট্টগ্রামে আক্রমণ করে বহু ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। শেখ মুজিবুর রহমানের অধিনায়কত্বে চালিত আওয়ামী লীগকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়। মুক্তিফৌজ আনসারবাহিনী পুলিশবাহিনী প্রভৃতি সকলে মিলে আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত পাকহানাদারদের বিরুদ্ধে গেরিলা সংগ্রাম শুরু করে। (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৮: ২১০)

"বিশ্বদূতের আসরে" বিভাগে "শারোদৎসব" শিরোনামে নাতিদীর্ঘ সম্পাদকীয় ছিল। এতে বিশ্বদূত দেবী দুর্গার কাছে কিছু প্রার্থনা নিবেদনের মধ্যে বলেন: "...আর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে স্বদেশে স্বগৃহে ফিরে যার মত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করো।" (মাসিক *লিপিমিতা*, হুগলী, ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৮: ১৭৮)

এ সংখ্যায় মুক্তিযুদ্ধ তথা বাংলাদেশের উপর কবিতা ছিল তিনটি। বীরভূমের রাজমোহন সরকারের "আনন্দময়ীর আগমনে" কবিতার নামকরণ কবি নজরুলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত, ওই বিখ্যাত কবিতাটির অনুসরণেই এটি লেখা। কবি বলছেন:

> কি হবে মা বাংলায় এসে? বাঙালী মরিছে ডুবে।
> বন্যার জলে ভেসে গেছে দেশ, যুদ্ধ লেগেছে পুবে।
> রক্তে রাঙা বাংলার বুকে কি নিয়ে এলে মা তুমি?
> বোমা আর বন্দুক ছাড়া এতটুকু নাই জমি।
>
> (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৮: ২২৬)

তবে নজরুল এমন এক পরিবেশে কবিতাখানি লিখেছিলেন যখন তাঁর প্রিয় দেশ পরাধীনতার গভীর অন্ধকারে ডুবে ছিল, স্বাধীনতাসূর্যের সামান্য আলোকরশ্মিও দেখা দেয়নি তখন। আর রাজমোহন সরকার লিখছেন সে আরাধ্য স্বাধীনতাটির যখন আগমনী বার্তা শোনা যাচ্ছিল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির কণ্ঠ থেকে। তাই তো উপসংহার আর নজরুলের মতো তিক্ততা-ক্ষোভে শেষ হয়নি। একালের কবি বলতে পেরেছেন:

> এসেছো যদি শুধু দেখে যাও বাংলা, বাঙালীর দেশ
> আমরা দিয়াছি দুয়ার খুলিয়া, ভালোবাসার নাই শেষ।
>
> (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৮: ২২৬)

উত্তরপাড়ার শান্তনু চৌধুরী এবার আর রূপকধর্মিতায় আবদ্ধ থাকেননি, *ঝড় ওঠাও* কবিতায় স্পষ্টতই বলেছেন:

ওই হানাদার আজ আসি'
সোনার বাংলা আজ পুড়ায়ে,
চাই উড়ায়ে—
উল্লাসে আজ সব নাশি—
শক্তিতে আজ সবাই নাচি' ধরেই কাছি
জয় জগন্নাথ রথ ছুটাও।
আঘাত হানি ওই লুঠেরার
নিঃশেষেই আজ শির লুটাও।
ঝড় উঠাও-ঝড় উঠাও-ঝড় উঠাও॥

(মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৮: ২২৮)

বিপরীতক্রমে রবীন্দ্রনাথ দরজীর কবিতাতেই বরং যুদ্ধের কথা ছিল না। তবে বৈচিত্র্য ছাড়াও আবেগের ভিন্ন একটা মাত্রা ছিল বলেই হয়তো সম্পাদক তাঁর কবিতাটি এ সংখ্যার জন্য নির্বাচন করেছিলেন। *পূর্ব্ব বাংলার স্মরণে* কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ দরজী পাঠিয়েছিলেন দিল্লি থেকে। এখানে প্রবাসী কবি তাঁর শৈশবের কথা স্মরণ করেছেন। নদীতীরের গ্রামে ছিল বসবাস। পল্লীজননীর স্নেহতলে ভাইবোনদের নিয়ে ছিল সেদিনের মধুময় দিনগুলি। স্মৃতিচারণে পারিপার্শ্বিকতার যা এসেছে, তা আবহমান গ্রামবাংলারই ছবি। শৈশব, মা ইত্যাদি অনুষঙ্গেই নামটা হতে পারতো। কিন্তু "পূর্ব্ব বাংলা" বলতে আসলে সে সময়ের পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা উন্মোচিত হয়েছে। এ সংখ্যায় "পুস্তক পরিচয়" বিভাগে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের *সিগারেট* গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করার সময় উল্লেখ করা হয়েছে, "প্রথম কয়েকটি কবিতা স্বাধীন বাংলাকে নিয়ে লেখা।" (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৮: ২১৯)

পরবর্তী ১২ বর্ষ ৪ সংখ্যা ছিল অঘ্রান-পৌষ-মাঘ মাস মিলিয়ে যৌথ সংখ্যা। ততোদিনে যুদ্ধ প্রায় শেষ পর্যায়ে, সাফল্যের কাছাকাছি চলে এসেছে বীর বাঙালি মুজিবসৈনিকেরা। "পুস্তক পরিচয়" বিভাগে এবারে ছিল হুগলী থেকে প্রকাশিত *সন্দীপন* পত্রিকার শারদ সংখ্যা নিয়ে আলোচনা। সেটিতে যে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম প্রসঙ্গ এসেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে সন্তোষের সুরে: "স্বাধীন বাংলাকে অবলম্বন করে দু-একটি কবিতা ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিকে নিয়ে লেখা বিশেষ কোন গল্পের সন্ধান আমরা পেলাম না।" (মাসিক *লিপিমিতা*, হুগলী, অঘ্রান-পৌষ-মাঘ ১৩৭৮: ৩০২) বোঝা যায়, সেসময় পত্রিকাটি ও তার মিতাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম। *নীরব কেন কবি* শীর্ষক কলকাতার মিলন কুমার নাথের প্রবন্ধটিও তার প্রমাণ। কবি নজরুলকে নিয়ে রচিত প্রবন্ধটি। দীর্ঘ লেখাটিতে নজরুলের প্রেমের কবিতার কথা সামান্যই এসেছে, বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতা ও বিদ্রোহী সত্তার আলোচনা। বাংলাদেশের কথা যেভাবে এসেছে:

> স্মৃতিভারে বেদনাহত মন অব্যক্ত যন্ত্রণায় যখন অস্থির তখনই চোখের তারা দুটো নেচে উঠলো সংবাদপত্রের শুভ-বার্তায়। জানলাম বর্বর ইয়াহিয়ার সরকার যে নামটিকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছিল অনাদরে ও অবজ্ঞায়—বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সেই নামটি আজও ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল, দেবতার মত শ্রদ্ধেয়, আপন জনের মত একান্ত কাছের একজন। অর্ঘ্য স্বরূপ তারাও পাঠাতে চায় প্রণাম—ইতিহাসের বীর সৈনিকের পদ প্রান্তে। (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী অঘ্রান-পৌষ-মাঘ ১৩৭৮: ২৬১)

বিপরীতে প্রশ্ন তুলেছেন: "আমরা নীরব কেন? আমাদের বিস্মৃতির অতলে সেই নামটা কি হারিয়ে গেছে?"

তবে এ সংখ্যায় বঙ্গবন্ধু বা বাংলাদেশ নিয়ে কোনো সৃজনশীল লেখা ছিল না। তার কারণ অন্যবিধ। মিতাদের নিয়মিত চাঁদা ও অর্থসাহায্যে পত্রিকাটি চলতো। কাজেই তাদের মনোনীত লেখাগুলো স্থান দেওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মিতাদের আবেদন-আকর্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছিল এমন নয়। বস্তুত পূর্বে যেসব লেখা মনোনীত হয়েছিল সেগুলোর কিছু মুদ্রণের স্বাভাবিক সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল। কাজেই সেগুলো থেকে কিছু লেখা পত্রস্থ হয়। আর এদিকে বাঙালির বীরত্বে প্রাণিত হয়ে মিতারা সাহিত্যচর্চা করে গেছেন।

তারই ফলাফল আমরা পেলাম পরবর্তী ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮ সংখ্যায়। ইতোমধ্যে বাঙালিদের প্রথম জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ অর্জিত হয়ে গেছে। তারপরও পত্রিকা কর্তৃপক্ষ যুদ্ধকালে লেখা মিতাদের বেশকিছু লেখনি এ সংখ্যায় স্থান দিয়েছেন। কবিতাই রয়েছে ছয়টি। এছাড়া বর্ষবরণমূলক একটি প্রবন্ধের মূল প্রসঙ্গ ছিল বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন। নিয়মিত একাধিক বিভাগে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ছিল। যেমন, শুরুতে ছিল *বিশ্বদূতের আসরে* বিভাগটি। এবারের কলাম ছিল দুটো উপ-শিরোনামে বিভক্ত। *ঐতিহাসিক* ১৯৭১ অংশের সম্পাদকীয়তে মূলত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের গৌবরদীপ্ত অর্জনকে উদ্‌যাপন করা হয়েছে:

> হে মহাকালের অমৃত সন্তান! তোমায় জানাই শতকোটি প্রণাম। দুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতের ললাটপটে যে গৌরবময় জয়তিলক এঁকে দিলে তা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। হে মহাভাগ! শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বকে তুমিই বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে উপযুক্ত স্থানে তুলে ধরতে চলেছ, তোমায় সহস্র কোটি প্রণাম। (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮: ৩১০)

১৯৭২ সালের আগমনে "আন্তর্জাতিক নববর্ষের শুভেচ্ছা" জানিয়ে লিখিত কলামটি শেষ করেছেন এভাবে "জয় হিন্দ্! জয় বাংলা! ওঁ শান্তি!" (মাসিক *লিপিমিতা*, হুগলী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮: ৩১১) এ সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের উদ্বাস্তু ও মুক্তি ফৌজের জন্য সাহায্য ভাণ্ডারে ১০১.৭৫ টাকা জমা পড়েছে।

এবারে কবিতাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক। বর্ধমানের মিতা সুবীর নাথের কবিতার নাম ছিল *তোমাদেরই হবে জয়*; নামকরণে কবির বক্তব্য স্পষ্ট; অংশবিশেষ:

জয় তোমাদের হবেই ভাই
তোমাদেরই হবে জয়
তোমাদের চোখে কঠিন শপথ

জেনেও কঠিন তোমাদের পথ
মৃত্যুর সাথে লড়ছ পাঞ্জা
মৃত্যুরে করে জয়।
বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা
হৃদয় অকুতোভয়,
তোমাদেরই হবে জয়।

(মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮: ৩৩৮)

কোচবিহারের বিষ্ণুভক্ত সরকারের কবিতার শিরোনাম ছিল *আমি কি পারি না*। নামকরণে আত্মসমঝোতার কথা পরিব্যক্ত। জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে লেখক মনে করছেন নিজের সুখ বা শখ মেটাবার সময় এটি নয়। তাঁর ভাষায়:

কবিতা লেখার সময় এটা নয়
'রাজধানী এক্সপ্রেসে' ভারত পরিভ্রমণ করবো
অথবা—
'সম্রাট অশোকে' চেপে সাগর পাড়ি দেবো;
এ কল্পনা এখন আর আমার সাজে না।
ওরা মাতৃভূমির জন্য লড়ছে। আমিও বাঙ্গালী।
আমি কি পারি না ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে?

(মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮: ৩৩৮)

ঢাকুরিয়ার সুপ্রতীম দেবের কবিতার নাম *সংগ্রামী বাংলা*; বাংলার চিরকালীন প্রকৃতিকে তিনি সংগ্রামী প্রতীকে চিত্রিত করেছেন নিম্নোক্তভাবে:

বান এসেছে পদ্মা নদীতে
চোখের জলে সাগর গর্জায়
চোখের জলে আগুন জ্বলেরে
বাংলা দেশে মানুষ গান গায়
বাজ পড়ে আর বিদ্যুৎ চমকায়।

(মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮: ৩৩৯)

প্রাণ রায় অবশ্য বাংলার সেই প্রিয় শান্ত-শ্যামল প্রকৃতিকে ভুলতে পারেননি। স্মৃতিচারণায় স্মরণ করেছেন সে প্রকৃতিকে; তাই নতুন প্রতীকে রূপায়ণ না করে স্মৃতিকাতর কবি কবিতাটির নাম দিয়েছেন *চুরি গেছে প্রাণ*-এর অংশবিশেষ:

আমার হৃদয় জুড়ে এই ত সেদিনও তার মুখ
জেগেছিল, গেয়েছিল ঝিল্লির গান
আম জাম কাঁঠালের পাতায় পাতায়, ছিল প্রাণ
বুক জুড়ে ছিল, ছিল শান্তি, ছিল দুঃখ-সুখ।
তারপর, উড়ো এক বাজ পাখী এসে
সেই সব ঘাস-পাতা জোনাকির বুক থেকে
কেড়ে নিয়ে চলে গেছে প্রাণ।

(মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮: ৩৪০)

বাঁকুড়ার অমিয় মুখোপাধ্যায় *বাংলা মার প্রতি* কবিতায় উদ্বাস্তুর দেশত্যাগের দুঃখকে রূপায়িত করেছেন:

এবার তবে আসি মা গো
এবার তবে আসি,
ছিলাম সুখী, হলাম দুখী
নয়ন জলে ভাসি।

(মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮: ৩৪২)

কারণ *জঙ্গী শাহী খান* সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। সুখের সংসারকে শ্মশান করেছে। আর তাই—

কি সুখে আর থাকবো মা গো
শ্মশান মাঝে পড়ে,
সীমান্ত পার হতেই হল
প্রাণের মায়া ছেড়ে।

(মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮: ৩৪২)

দেশ মা যেন তাকে ভুলে না যায় এবং সেও জন্মভূমিকে ভুলতে পারবে না এই আকাঙ্ক্ষা ও অঙ্গীকারে শেষ হয়েছে কবিতাটি।

তবে নদীয়ার অসিত বরণ হাজরা অবশ্য সংগ্রামমুখর পূর্ব বাংলা আর আশ্রয়দাতা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের তুল্যমূল্য বিচার করে বস্তুত সংগ্রামী বাংলাকেই উপরে তুলে ধরেছেন। শিল্পকুশলতার কারণে তাঁর "এপার-ওপার" কবিতার পুরোটাই তুলে দেওয়া হলো:

ওপারে দাঁড়ানো মায়ের জন্যে এপারের
বোবা কান্না
ঝ'ড়ে পড়া দেখে কবি মন তাকে বলেনি
মুক্তো-পান্না
বরং বলেছে : অশ্রু তো নয়,–দু'চোখেতে
লোনা সিন্ধু
ব্যথার বাষ্পে রূপায়িত হয়ে ঝরাবেই
বারি বিন্দু
ইনকিলাবের মলাটের ছবি এঁকে এঁকে
আমি জংগী.
ওপারে মৃত্যু মুঠোয় মুড়িয়ে হাতছানি
দ্যায় সংগী!
অনুরক্তের সাফল্য লেখে তনুর –রক্তে
কাব্য!
আনন্দে– কেঁদে ভাবি কবে মা-কে
ওপারের মতো ভাববো!!

(মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮: ৩৩৯)

কলকাতার অরুণ চট্টোপাধ্যায়ও বিশ্লেষণ করে বুঝেছেন পূর্ব বাংলার বাঙালিদের দেশপ্রীতিই শ্লাঘনীয়। তাঁর *বাহাত্তুরে* শীর্ষক প্রবন্ধটি অবশ্য শুরু হয়েছিল ব্যঙ্গের বহিরাবরণে–প্রথম অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ:

> একটা মাস যায়, আর একটা মাস আসে মাঝখানে যে চিপ্‌পাখান, তার নাম হইল 'হাক্‌রাইন।' ঢাকাই গাড়োয়ানের কমিকের রেকর্ড আমরা ছোট বেলায় শুনেছি, কিন্তু ভেবে দেখুন তো, ইয়াহিয়ার সৈন্য যায়, আর বাংলা দেশ স্বাধীনতা পায়। এই—মাঝখানের যে চিপ্‌প্‌খান অর্থাৎ ফাঁকটা হাক্‌রাইন বা সংক্রান্তি কি না? (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮: ৩৩০)

শিরোনামের *বাহাত্তুরে* শব্দটি লেখক শ্লেষ অলংকার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। একদিকে তা নতুন ইংরেজি বর্ষ বাহাত্তর বটে; অপরদিকে *বাহাত্তুরে* বলতে বুদ্ধিহীন, ঝামেলা সৃষ্টিকারী, অকর্মণ্য বৃদ্ধ, বার্ধক্যবশত বলবুদ্ধিহীন ব্যক্তি ইত্যাদি বোঝায়। লেখক মনে করেন দ্বিতীয় অর্থের এই নেতিবাচকতা ভারতীয়দের মধ্যে রয়ে গেছে। তাই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ থেকে দিশা নিয়ে নতুন বছরে সেই নেতি থেকে তাঁর স্বদেশ যেন মুক্তি পায়, সেই প্রার্থনা করেছেন। প্রবন্ধটির শেষাংশ:

> আমরা ভুল করেছি এবং ভুলের মাশুলও অনেক গুণেছি। আজ পুবে নূতন স্বাধীনতার সূর্য উঠেছে। এবং একথা মানতেই হবে যে, বাংলা দেশের মানুষ আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের থেকে দেশপ্রীতিতে অনেক অগ্রসর। তার প্রধান কারণ হল ওরা এখন বলিদান দিতে পেছপা নয়।
>
> 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব' শেখ মুজিবর রহমানের এই প্রতিজ্ঞা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, এ কথা সকলেই জানেন।
>
> সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর, এই সময়ের মধ্যে ঘটিতে অনেক জল ভরা হয়েছে। অনেক জল ফুটো দিয়ে ঝরে গেছে। এখন বাহাত্তরে পড়ে যদি আমাদের বাহাত্তুরে দশা ছাড়ে তবেই মঙ্গল। (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮: ৩৩১)

'স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়'-এর এবারের কিস্তিতে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী বিশ্ব-ইতিহাসের কয়েকটি প্রসঙ্গ চয়ন করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে:

> ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১—
> ভারত প্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দান করে।
> ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১—
> লেঃ জেনারেল নিয়াজী ও মেজর ফরম্যান আলী সহ ৯৩ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভারতের পূর্ব রণাঙ্গনের লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে।
> ৮ই জানুয়ারী, ১৯৭২—
> বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে বিমান যোগে ইংলণ্ডে উপনীত হন। (মাসিক *লিপিমিতা* হুগলী ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮: ৩৫৮)

এভাবে দেখি স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দেওয়ার পর ২৫ মার্চ কালরাত্রে বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার থেকে শুরু বাঙালির বিজয় অর্জনের পর জাতির পিতার মুক্তিলাভ পর্যন্ত ঘটনাবলি

লিপিমিতা অনুসরণ করেছে। যথার্থই পত্রিকাটি মনে করেছেন বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন, বাঙালির মুক্তি আর বঙ্গবন্ধুর সেদিনের মুক্তিটি ছিল সমার্থক, পরস্পরের পরিপূরক। পত্রিকাটির লেখক-পাঠকেরা জাতির জীবনের এই অভূতপূর্ব ঘটনাকে আত্মস্থ করেছে, গর্বিত হয়েছে, একই সাথে স্বাজাত্যপ্রীতি ও মানবতাবোধে উজ্জীবিত হয়ে লেখনীতে সচেতনতা দেখিয়েছেন এবং কর্ম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

"আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ।" (যাযাবর ১৯৮৪:১০) *দৃষ্টিপাত* গ্রন্থে যাযাবরের এই উক্তি আপ্তবাণীতে পরিণত হয়েছে বক্তব্যের যাথার্থ্যের কারণে। আধুনিক বিজ্ঞানের কারণে চিঠির মতো মাধ্যমটি বিলুপ্ত হয়েছে যা যোগাযোগ-সংঘটক ছাড়াও ছিল আবেগ-প্রকাশক। বিজ্ঞান ও বিচার কোনোটিতেই আবেগের স্থান নেই। সেই বিচারে বিশ্বমিতালী সঙ্ঘের সদস্যরা যাঁরা এক সময়ে পত্রালাপের মধ্য দিয়ে পরিচিত হয়েছিলেন, বাঙালির জীবনের এই গৌরবময় ঘটনাকালে তাঁরা একাত্ম হয়ে যেসব গদ্য-পদ্য রচনা করে অন্তরের আবেগের বাণীরূপ দিয়েছেন, সাহিত্যের মান বিচারে সেগুলো কতোটা উত্তীর্ণ হয়েছিল সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। আমরা সেই বিচার-বিশ্লেষণের দিকে খুব বিশেষ মনোযোগী হইনি বর্তমান আলোচনায়। তবে মানুষের ক্ষেত্রে আবেগ অনিবার্য সত্য, তাই তা মানুষের ইতিহাসেরও অংশ। *লিপিমিতা*র পাতায় পাতায় এমনি ইতিহাস রচিত হয়েছিল। তারকাঁটার সীমানা ছাড়িয়ে একাত্তরে দুই বাংলার মানুষের একাত্ম হওয়ার সেই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস আমরা এখানে স্মরণ করলাম।

তথ্যসূত্র

মাসিক *লিপিমিতা*, জগন্নাথ জানা সম্পাদিত, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ১২ সংখ্যা ১/ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮।

বর্ষ ১২ সংখ্যা ২/ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৮।

বর্ষ ১২ সংখ্যা ৩/ ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৮।

বর্ষ ১২ সংখ্যা ৪/ অঘ্রান-পৌষ-মাঘ ১৩৭৮।

বর্ষ ১২ সংখ্যা ৫/ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮।

আহমদ ছফা (২০১২), *অলাতচক্র*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড, (সম্পাদক: হাসান হাফিজুর রহমান), তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৯।

যাযাবর (১৯৮৪), *যাযাবর অমনিবাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১১), *ছিন্নপত্র*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১১), *ছিন্নপত্রাবলী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

রুদ্রমঙ্গল
মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা ॥ ১৪২৭-১৪২৮ ॥ ২০২০-২০২১ ॥ ISSN 2415-4695
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*: বাঙালি জাতির আত্মকথন

মোহসিনা হোসাইন*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। এটি কেবল আত্মজৈবনিক গ্রন্থই নয়, বিংশ শতাব্দীর বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জীবন এবং জাতীয় রাজনীতির বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষ্য এটি। রাজনীতির এই মহাকবির সাহিত্যগুণসম্পন্ন লেখনির ক্ষুরধার পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে। তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য, বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। অনিবার্যভাবেই জাতির ক্রান্তিকালের সংগ্রামমুখর দিনগুলোর ইতিবৃত্ত উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। শেখ মুজিবুর রহমানের ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনের সমান্তরালে ৪৩'র দুর্ভিক্ষ, ৪৬'র দাঙ্গা, ৪৭'র দেশভাগ, আওয়ামী লীগ গঠন, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট প্রভৃতি বাঙালি জাতির ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাসমূহ উঠে এসেছে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে। ব্যক্তিক জীবনকাহিনীর সীমা ছাপিয়ে আত্মজৈবনিক গ্রন্থটি কিভাবে বাংলার রাজনৈতিক আখ্যান তথা বাঙালি জাতির জীবনী হয়ে উঠেছে, তা বিশ্লেষণ করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখতে শুরু করেন তাঁর অসমাপ্ত জীবনের গল্প। ইতিহাসের এই মহানায়কের তিরোধানের ২৯ বছর পর অসম্পূর্ণ এই আত্মজীবনী তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার হাতে আসে। তারও বছরকয়েক পরে তা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* নামে মলাটবদ্ধ হয়ে পাঠকের হাতে পৌঁছায়। বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো কাটাতে হয়েছে কারাগারে। রাজনীতির বিপদসংকুল পথে হাঁটতে গিয়ে বহুবার মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন, ফাঁসির মঞ্চকেও তোয়াক্কা

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল

করেননি। এই অনন্য সাধারণ সংগ্রামগাঁথা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য উৎসর্গীকৃত শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের এ আখ্যান আজ বাংলাদেশের ইতিহাস গবেষণায় এক প্রামাণ্য দলিল। প্রসঙ্গত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হারুন-অর-রশিদের মন্তব্য লক্ষণীয়—

> অসম্পূর্ণ হলেও আমাদের জাতীয় রাজনীতির ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব নিয়ে এটি লিখিত। তাই এ গ্রন্থ যে একটি অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। (হারুন-অর-রশিদ ২০১৩: ৫৩)

শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* কোনো দিনলিপি নয়, বরং লেখকের স্মৃতিচারণমূলক আত্মজীবনী। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কাল পরিসরে পাক-ভারতের রাজনৈতিক পরিক্রমা আর রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এক নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদের লেখা এ গ্রন্থ। লেখক নির্লিপ্ত ও আবেগবর্জিত ভাষায় লিখেছেন সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও ব্যক্তিগত দর্শন। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ ও ভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভ, বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য ভাষাসংগ্রামীকে গ্রেপ্তার, ঢাকায় জিন্নাহর রাষ্ট্রভাষা উর্দু ঘোষণা ও ছাত্রদের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য, টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মওলানা ভাসানী ও শামসুল হকের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়সহ নানা ঘটনা উঠে এসেছে এতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বদান, রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে রাজবন্দিদের ওপর গুলি ও হত্যা, ঢাকায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে হত্যা ও খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রধানমন্ত্রী হওয়া, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ভাষাসংগ্রামীদের আত্মত্যাগ, আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল ও শেখ মুজিবুর রহমানের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়া, যুক্তফ্রন্ট গঠন, নির্বাচন ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ও পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ বাতিলসহ জাতীয় রাজনীতির নানা বিষয় উঠে এসেছে।

জন্মবৃত্তান্ত ও বংশপরিচয় দিয়ে গ্রন্থের সূচনা হলেও বর্ণিত ঘটনাক্রম দ্রুত ধাবিত হয়েছে দেশের রাজনীতির মঞ্চে। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের শুরু মোটামুটি ১৮ বছর বয়সে, ১৯৩৮ সালে। সেবছর বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গোপালগঞ্জে আগমন উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি করার ভার পড়েছিল স্কুলছাত্র শেখ মুজিবের ওপর। গোপালগঞ্জে সেবারই প্রথম শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর রাজনীতির আদর্শিক গুরু সোহরাওয়ার্দীর আলাপ-পরিচয়। পরের বছর শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় যান। তবে তিনি রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত হন ১৯৪১ সালে, মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর।

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় শেখ মুজিবুর রহমান পুরোপুরি মাঠ পর্যায়ের কর্মী হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এভাবেই ক্রমান্বয়ে মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন শেখ মুজিব। গোপালগঞ্জের ডানপিটে সাহসী কিশোর শেখ মুজিবের নেতা হয়ে ওঠা, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন, উপলব্ধি, চেতনা, স্বপ্ন, বোধ আর বোধির বিবর্তনরেখার পরিচয় পাওয়া যায় *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে। রাজনৈতিক আশীর্বাদপুষ্ট, প্রভাবশালী বা ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম না নিয়েও তিনি কীভাবে হয়ে উঠলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলার গণমানুষের নেতা, বাংলার সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, বাঙালি জাতিকে দেখালেন স্বাধীনতার স্বপ্ন, নেতৃত্ব দিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে—এসব প্রশ্নের সদুত্তর নিহিত আছে এ গ্রন্থে।

দেশ ও মানুষের কল্যাণে ত্যাগের মহান ব্রত নিয়েই রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ রাজনৈতিক জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস। দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে ক্রমশ রাজনীতির শীর্ষে উঠে আসেন তিনি। বইখাতা ফেলে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, দাঙ্গার সময় চাল বোঝাই ঠেলাগাড়ি ঠেলেছেন, রাজনীতির খরচ মেটানোর জন্য রেস্টুরেন্ট খুলেছেন, রাস্তায় হকারি করে পত্রিকা বিক্রি করেছেন, ফুটপাতে ঘুমিয়েছেন। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র ভূমিকাংশে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা লিখেছেন—

> এই লেখাগুলো বারবার পড়লেও যেন শেষ হয় না। আবার পড়তে ইচ্ছা হয়। দেশের জন্য, মানুষের জন্য, একজন মানুষ কিভাবে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন, জীবনের ঝুঁকি নিতে পারেন, জেল জুলুম নির্যাতন সহ্য করতে পারেন তা জানা যায়। জীবনের সুখ-স্বস্তি, আরাম, আয়েশ, মোহ, ধনদৌলত, সবকিছু ত্যাগ করার এক মহান ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ভূমিকা)

*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে লেখকের জীবনীর সমান্তরালে বাংলাদেশের জন্মের প্রাক-ইতিহাস, সমকালীন রাজনীতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে লেখকের চিন্তাভাবনা ও মতামত প্রভৃতি রূপায়িত হয়েছে। পাক-ভারত রাজনীতিতে গুরুত্ববহ অবদান রেখেছেন যেসব নেতৃবৃন্দ, তাঁদের অবদানের কথা তাৎপর্যের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তৃণমূল থেকে উঠে আসা তুমুল জনপ্রিয় একজন নেতা। আন্দোলন আর সংগ্রামের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে সেই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব নেতার সঙ্গে তাঁর মিথস্ক্রিয়া ঘটে এবং সেইসব নেতাদের পরিচয় পাওয়া যায় এ গ্রন্থে। রাজনৈতিক জীবনে মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, মানিক মিয়া, মাওলানা আকরম খাঁ, তাজউদ্দীন আহমদসহ অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ও মতের মিল-অমিল সবিস্তারে উঠে এসেছে এ আত্মজৈবনিক গ্রন্থে।

শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রচিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে লাহোর প্রস্তাবের বহুমাত্রিক রাষ্ট্রধারণার (স্টেটস) আলোকে যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভারত ও (পশ্চিম) পাকিস্তানের বাইরে তৃতীয় স্বাধীন "অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি আবুল হাশিম ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা কিরণ শংকর রায়সহ অনেকেই। শেখ মুজিবুর রহমান এর সমর্থনে ও বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে কলকাতায় সভা-সমাবেশ করেন। লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী, ভারতের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ডের বাইরে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বাংলার ইতিহাসের এ তাৎপর্যবহ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে—

> পাকিস্তান দুইটা হবে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। একটা বাংলা ও আসাম নিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান' স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র; আর একটা 'পশ্চিম পাকিস্তান' স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে—পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে। অন্যটা হবে হিন্দুস্থান। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২২)

১. প্রস্তাবটির মূলকথা ছিল "Resolved that... the areas in which the muslims are numerically in a majority as in the north-western and eastern zones of India should be grouped to constitute 'independent states' in which the constituent units shall be autonomous and sovereign." অর্থাৎ "ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সব স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠা করা, যাদের অঙ্গরাজ্যসমূহ হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।" (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৩৯) লাহোর প্রস্তাবে কার্যত তৎকালীন ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চলে (উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব) দুটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। (হারুন-অর-রশিদ ২০০১: ১২২-১২৪)

১৯৪৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর পরিকল্পনা এবং শেখ মুজিবের কর্মনিষ্ঠা ও দক্ষতায় মুসলিম লীগকে অভিজাতদের গণ্ডি থেকে বের করে সাধারণের রাজনৈতিক দলে রূপ দেওয়া হয়। শেখ মুজিবের অসাধারণ সাংগঠনিক নৈপুণ্যে এবং অসামান্য অবদানে মুসলিম লীগ অবিভক্ত বাংলায় সরকার গঠন করে। একই বছর ব্রিটিশদের বিদায়ের প্রাক্কালে বাংলায় সংঘটিত হয় স্মরণকালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। শেখ মুজিবুর রহমান তখন দুর্ভিক্ষপীড়িত বুভুক্ষু মানুষের মুঠে একমুঠো অন্ন তুলে দিতে লঙ্গরখানা খোলাসহ দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার চিত্র লেখকের ভাষায় পেয়েছে মর্মান্তিক রূপ—

> সেই বাংলাদেশের এই দুরবস্থা চোখে দেখেছি যে, মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মার দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্যে কাড়াকাড়ি

> করছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই। বাড়ির দুয়ারে এসে চিৎকার করছে, 'মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও, মরে তো গেলাম, আর পারি না, একটু ফেন দাও।' (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ১৮)

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় সংঘটিত ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু সম্প্রদায় মুসলিমদের হতাহত করে। এর প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালী ও বিহারে মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দুদের আক্রমণ করে। দাঙ্গা রোধ করতে বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও দাঙ্গাক্রান্তদের শুশ্রূষায় তাঁর স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করার প্রসঙ্গও রয়েছে গ্রন্থে।

এভাবেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণের আখ্যান চিত্রিত হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র পরতে পরতে; লেখকের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে তাঁর সমকালীন জীবন, রাজনৈতিক উত্থানপতন ও বাঙালির স্বাধিকার চেতনার ইতিহাস। দেশভাগের প্রসঙ্গে কলকাতা ও আসামকে ভারতের সীমানার অন্তর্ভুক্ত করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কূটচাল ও হঠকারিতা হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে শেখ মুজিবের দৃষ্টিতে। সোহরাওয়ার্দীও সেই ষড়যন্ত্রের শিকার বলে মনে করতেন তিনি—

> পাকিস্তান হওয়ার সাথে সাথেই ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে দিল্লিতে এক ষড়যন্ত্র শুরু হয়। কারণ, বাংলাদেশ ভাগ হলেও যতটুকু আমরা পাই, তাতেই সিন্ধু, পাঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্তানের মিলিতভাবে লোকসংখ্যার চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা বেশি। সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও কর্মক্ষমতা অনেককেই বিচলিত করে তুলেছিল। কারণ, ভবিষ্যতে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চাইবেন এবং বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও থাকবে না। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৭৫)

বাঙালির ইতিহাসের অন্যতম তাৎপর্যবহ ঘটনা ভাষা আন্দোলন। এর মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালির অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ। ভাষার প্রশ্নেই তদানীন্তন পাকিস্তানে প্রথম প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল বাঙালিরা। পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যাগুরু হলেও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে চায়নি পাকিস্তানি শাসকরা। উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল তারা। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে ভাষা-আন্দোলনের সূচনা-বিস্তার, ভাষা-আন্দোলনের প্রথম পর্ব ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫২ সালের চূড়ান্ত পর্ব, বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক ঘটনা বিশদ বর্ণনা করেছেন লেখক। ভাষা-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার সমান্তরালে এসব প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সবিস্তারে।

পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন বসে ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। অধিবেশনে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা করার প্রস্তাব আনেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ২৫ ফেব্রুয়ারি এ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা শুরু হয়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, "বাংলা একটি প্রদেশের ভাষা হলেও রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ভাষা। সে হিসাবে বাংলার পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। আমি মনে

করি, বাংলা আমাদের রাষ্ট্রের সাধারণ ভাষা।" (আহমদ রফিক ২০১২: ৭০) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে স্মরণ করিয়ে দেন—

> উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমানের দাবির মুখে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এক কোটি মুসলমানের ভাষা উর্দু। পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং সাধারণ ভাষা মুসলমান জাতিরই হতে হবে। তাই এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। (আহমদ রফিক ২০১২: ৭০)

পূর্ব পাকিস্তানের সিংহভাগ মানুষ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দেখতে চায়—এমন ভিত্তিহীন তথ্যের অবতারণা করেন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনও। বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সূচনা করে দুর্বার আন্দোলনের। ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস ও অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ"। ১১ মার্চকে ঘোষণা করা হয় "বাংলা ভাষা দাবি দিবস"। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ আন্দোলনরত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন শেখ মুজিবসহ অনেক ছাত্রনেতা। ভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভ পর্যায়ে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন তাঁদেরই একজন। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হককেও একই দিনে গ্রেপ্তার করে পাঠানো হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। ভাষা আন্দোলনের শীর্ষ সংগঠকদের কারাগারে আটকে রেখেও আন্দোলন দাবিয়ে রাখতে পারেনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। সারা দেশে, বিশেষ করে শহরের বিদ্যাপীঠগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল এ আন্দোলন। কারাগারে বন্দি থাকাকালীন বঙ্গবন্ধুর একদিনের ঘটনার বর্ণনা থেকে তার প্রমাণ মেলে। বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

> আমাদের এক জায়গায় রাখা হয়েছিল জেলের ভিতর। যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিল, তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। তিনতলা দালান। দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হত না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না'—নানা ধরনের স্লোগান। এই সময় শামসুল হক সাহেবকে আমি বললাম, 'হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।' (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৯৩-৯৫)

বঙ্গবন্ধু জেল থেকে মুক্তি পান ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ সন্ধ্যায়। পরের দিন আমতলায় (বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনের চত্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় সভাপতিত্ব করেন তিনি। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভায় পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। প্রতিবাদ-বিক্ষোভে ফেটে পড়েন উপস্থিত ছাত্রসমাজ, সেখানেও সরব উপস্থিতি ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের। ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করে এগিয়ে নিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন যাঁরা, বঙ্গবন্ধু ছিলেন তাঁদেরই একজন।

১৯৫২ সালে শুরু হয় ভাষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব। ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন। বঙ্গবন্ধু তখন নিরাপত্তা আইনে কারাবন্দি। কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায়ও থেমে থাকেনি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা। কোর্টে হাজিরা দেওয়ার সময় কিংবা এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তরিত করার পথে কৌশলে নেতাদের কাছে খবর পৌঁছাতেন, কর্মসূচির ব্যাপারে পরামর্শ ও নির্দেশনা দিতেন। ভাষা-আন্দোলনের কর্মীদের নির্দেশনা দেওয়ার বিবরণ আছে অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে—

> আমি হাসপাতালে আছি। সন্ধ্যায় মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ দেখা করতে আসে। আমার কেবিনের একটা জানালা ছিল ওয়ার্ডের দিকে। আমি ওদের রাত একটার পর আসতে বললাম। আরও বললাম, খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহাবুব আরও কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকে খবর দিতে। ...বারান্দায় বসে আলাপ হলো এবং আমি বললাম, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে। আওয়ামী লীগ নেতাদেরও খবর দিয়েছি। ...তোমরা আগামীকাল রাতেও আবার এস। ...পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসল। সেখানেই ঠিক হলো আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে।...আমি আরও বললাম, 'আমিও আমার মুক্তির দাবি করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করব। আমার ছাব্বিশ মাস জেল হয়ে গেছে।' (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ১৯৬-১৯৭)

১৯৫২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফরিদপুর কারাগারে নেওয়া হয়। সঙ্গে ছিলেন রাজবন্দি মহিউদ্দিন আহমেদও। ১৬ ফেব্রুয়ারি আমরণ অনশন শুরু করেন তাঁরা দুজনেই। এরই মধ্যে কারাগারে বিনা বিচারে কেটে গেছে দুই বছরেরও বেশি সময়। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্ররা। পুলিশের গুলিতে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেক তাজা প্রাণ। আহত হন আরও অনেকে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়—

> ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। রেডিওর খবর। ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসেছিল। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', আরও অনেক স্লোগান। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২০৩)

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে শেখ মুজিব অনন্য ভূমিকা পালন করেন। দীর্ঘদিন কারাভোগ করেন মায়ের ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখার দাবিতে। এ প্রসঙ্গে গবেষক আশরাফ হোসেনের মূল্যায়ন—

> ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান কয়েকবার কারাগারে আটক ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতেও তিনি কারাগারে ছিলেন। (আশরাফ হোসেন ২০১৪: ৩৫)

হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু—এমন কঠিন ব্রত নিয়ে অনশন পালন করতে থাকেন বঙ্গবন্ধু। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য পূর্ব পাকিস্তান অ্যাসেম্বলিতে মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন আনোয়ারা খাতুন এমএলএ। দিনের পর দিন অনশন করার পর বঙ্গবন্ধু শারীরিকভাবে ভেঙে পড়েন। বঙ্গবন্ধুর কঠিন সংকল্পের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানে শাসকগোষ্ঠী। ১২ দিন অনশনের পর ২৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া হয়। তত দিনে একটানা জেলে কেটে গেছে দীর্ঘ ২৭টি মাস। এক দিন পর ছাড়া পান মহিউদ্দিন আহমেদও। রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হারুন-অর-রশিদ লিখেছেন—

> ভাষা-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর বিশিষ্ট ভূমিকা পালন আকস্মিক ছিল না। বাংলা, বাঙালি আর বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ নতুন নয়। বাঙালি সত্তা ছিল তাঁর রক্ত কণিকায়। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষার পক্ষে ও বাংলার নামের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাঁর যুগান্তকারী বক্তব্য সকলেরই জানা। (হারুন-অর-রশিদ ২০১৩: ৪২)

সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে। অনিবার্যভাবেই, অসমাপ্ত আত্মজীবনীর একটি অংশ জুড়ে আছে কারাগারের দিনলিপি। পাকিস্তানি শোষণের যন্ত্রণাদগ্ধ কারাগার থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করতে বঙ্গবন্ধুকে বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বিস্ময়কর হলেও সত্য, তাঁকে পাকিস্তানি শাসনের ২৪ বছরের মধ্যে অর্ধেকটা সময়ই কাটাতে হয়েছে কারাগারের অন্ধকারে। অবশ্য প্রতিবাদী ও স্বাধীনচেতা এই নেতা প্রথমবার জেলে গেছেন ব্রিটিশ শাসনামলে। ১৯৩৮ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁকে একবার জেলে কাটাতে হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কারাবরণ করেন ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ। ভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভিক সময়ে ঢাকায় সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন তিনি। হারুন-অর-রশিদ লিখেছেন—

> কখনো একই বছরে তিন বার; কখনো একই সঙ্গে তিন বছর কারাভোগ (১৯৬৬-১৯৬৯); কখনো ১৭-১৮ মাস বন্দি থাকার পর মুক্তি পেয়ে পুনরায় জেলগেটে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪ এ সময়েও তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেন। একনাগাড়ে ২৭ মাস পর্যন্ত কারাগারে কাটিয়েছেন (১৯৪৯-১৯৫২)। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের পর তিনিই ছিলেন ঐ মন্ত্রিসভার একমাত্র সদস্য যাকে গ্রেপ্তার করা হয়। যতটুকু সময় কারাগারের বাইরে থাকার সুযোগ পেয়েছেন তাও হয় হুলিয়া, না হয় গোয়েন্দাদের কঠোর নজরদারির মধ্যে কেটেছে। তাই, পাকিস্তান রাষ্ট্র ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্য এক বৃহত্তর কারাগার। (হারুন-অর-রশিদ ২০১৩: ৫৩)

আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্তরীণ জীবনের নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। কারাগারের সেই রোজনামচা হয়ে উঠেছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকারের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে রাখা হয়েছিল ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে। সেবার তাঁকে কারাগারে কাটাতে হয়েছিল প্রায়

আড়াই মাস। রাজবন্দি হলেও প্রথমদিকে তাঁকে কারাগারে রাখা হয়েছে সাধারণ কয়েদি হিসেবে। কারাগারে অবর্ণনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। "কারাগারের রোজনামচা" শীর্ষক গ্রন্থে কারাগারের কষ্টের দিনলিপি বঙ্গবন্ধু বর্ণনা করেছেন এভাবেই—

> ১৯৪৯ সালে আমাকে গ্রেপ্তার করে সকালে জেলে এনে রাখলো; কারণ আমাকে ডিভিশন দেওয়া হয় নাই। আরও কয়েকজন রাজবন্দি ছিল নিচের একটা রুমে। তাদের কাছে আমাকে রাখা হলো। আরও হাজতিও ছিল সেই রুমে। খাবার দিল ডাল, একটা তরকারী, আর ভাত—কি আর করা যাবে, খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম—খেয়ে নিলাম। যা পাক করেছে, তেলের গন্ধ, ময়লা—বিশেষ করে চাউলের ভিতর কাঁকর, ডাল দিয়ে চারটা মুখে দিলাম। জান তো বাঁচাতে হবে। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১৭: ৪৩)

বঙ্গবন্ধুর বর্ণনায় উঠে এসেছে, তখনকার দিনে কারাগারে কমিউনিস্ট বন্দিদের থেকে অন্যান্য বন্দিকে আলাদা রাখা হতো, যাতে অন্যরা কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত না হন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দিদের সুবিধা আদায়ের দাবিতে অনশনরত শিবেনের মৃত্যু (১৯৪৯), একই দাবিতে রাজশাহী জেলে অনশনরত রাজবন্দিদের ওপর গুলিবর্ষণ (১৯৫০), কৃষকনেতা বিষ্ণু চ্যাটার্জিকে ডাকাতি মামলার আসামি করে পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো, গান্ধীবাদী সমাজকর্মী চন্দ্রঘোষকে ভারতের গুপ্তচর আখ্যায়িত করে নিরাপত্তা আইনে বন্দি করে কারাগারে পাঠানোসহ সেই সময়ের নানা ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। ব্রিটিশ আমলেও দীর্ঘ সময় কারাবরণকারী বাবু ফণিভূষণ মজুমদার, কৃষক আন্দোলনের নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশসহ আরো কয়েকজন স্বাধীনতাসংগ্রামীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা হয়। এভাবেই বাংলার স্বাধিকার সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, যখন বর্ণনাকার স্বয়ং সেই ইতিহাসের সক্রিয় ও অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জেল জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের কারণে পরিবারকে সময় দিতে পেরেছেন খুব অল্পই। এ নিয়ে বরাবরই চাপা কষ্ট লালন করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাবাকে খুব কম সময়ের জন্যেই কাছে পেয়েছিলেন সন্তানরা, মায়ের কাছে বড় হয়েছেন। স্ত্রীর এই অসামান্য ত্যাগ এবং অবদানের কথা বারবার স্মরণ করেছেন লেখক। পুত্র কামালের এক মাস বয়সে শেখ মুজিব জেলে গিয়েছিলেন বলে কামাল তাঁকে চিনতে পারেননি। লেখকের অন্তর্জাত অপত্য স্নেহের আবেগ নিঃসৃত হয়েছে স্মৃতি অনুষঙ্গে—

> একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, 'হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।' আমি আর রেণু দু'জনই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, 'আমি তো তোমারও আব্বা।' কামাল আমার কাছে আসতে চাইতো না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২০৯)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অধিকাংশ সময় কেটেছে রাজনীতি করে; দেশ ও দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিয়োজিত থেকে। দেশের জন্য লেখক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সাধ-আহ্লাদ, সংসার জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। আপাদমস্তক দেশ-অন্তপ্রাণ বঙ্গবন্ধুর কারণে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতাকে। মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন্নেছা রেণু সন্তানদের লালন পালন ও সংসার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সর্বদা বঙ্গবন্ধুকে সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছেন। বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রামে প্রতিনিয়ত পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়েরা খাতুন। রাজনীতি করতে গিয়ে পরিবার থেকে কখনোই বাধাপ্রাপ্ত হননি। বরং তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান সবসময় উৎসাহ যোগাতেন এবং স্ত্রীর কাছ থেকেও পেতেন মানসিক শক্তি। শেখ লুৎফর রহমান শেখ মুজিবকে বলেছিলেন—

> বাবা রাজনীতি কর আপত্তি করব না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছ এ তো সুখের কথা, তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না। আর একটা কথা মনে রেখ, 'sincerity of purpose and honesty of purpose' থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২১)

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন তথা ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ। এ দুটি সংগঠন গড়ার পেছনে বঙ্গবন্ধু অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, ছুটে গেছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছিল, পাকিস্তান তাদের সেই প্রত্যাশিত রাষ্ট্র নয়। শুরুতেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ, আঞ্চলিক বৈষম্য ও জাতি নিপীড়নের শিকার হয় বাঙালিরা। বঙ্গবন্ধু ক্রমান্বয়ে উপলব্ধি করেছেন ঔপনিবেশিকতা শেষ হয়ে সূচনা ঘটেছে নব্য ঔপনিবেশিকতার। শাসকের নাম আর রঙ বদলালেও বদলায়নি শাসকদের চরিত্র। পাকিস্তানের স্বাধীনতাকে বঙ্গবন্ধু আখ্যায়িত করেছিলেন "ফাঁকির স্বাধীনতা" বলে। প্রসঙ্গত গবেষকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র উন্মোচিত হয়। জাতীয় মুক্তি অর্জন ব্যতীত এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের যে কোন উপায় নেই, বঙ্গবন্ধু দ্রুত তা উপলব্ধি করলেন। আর আন্দোলন-সংগ্রামের এই নবতর পর্যায়ে বেশি আবশ্যক দৃঢ়ভিত্তিসম্পন্ন সংগঠনের, এ কথাও তিনি সহজে উপলব্ধি করতে পারলেন। অধিকন্তু বঙ্গবন্ধুর জীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, সাংগঠনিক শক্তিতে গভীর আস্থা। তাই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পর প্রথমে ছাত্রলীগ এবং আরো কিছু পরে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। (হারুন-অর-রশিদ ২০১৩: ৪৫)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র থাকাকালীন বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সরকার বিরোধী ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ। দ্রুততম সময়ে ছাত্রলীগকে শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামোর ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হন বঙ্গবন্ধু। ভাষা আন্দোলনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৯ সালে ছাত্রলীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর সভাপতির ভাষণ থেকে ছাত্রলীগের ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতায় বলেছিলেন—

> পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ যে নেতৃত্ব দিয়েছে, পূর্ব বাংলার লোক কোনোদিন তা ভুলতে পারবে না। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার আপনারা করেছেন এদেশের মানুষ চিরজীবন তা ভুলতে পারবে না। আপনারাই এদেশে বিরোধী দল সৃষ্টি করেছেন। শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ১২৬)

১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতারা যখন নবগঠিত রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়ে ক্রমান্বয়ে পাঞ্জাবি আমলাদের হাতে দেশ তুলে দিচ্ছিলেন, সেই প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব উপলব্ধি করলেন একটি বিরোধীদলের প্রয়োজনীয়তা। ক্ষমতাসীনদের কাছে কোণঠাসা অবস্থায় থাকা মুসলিম লীগের দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গঠন করা হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। নবগঠিত এই দলের সাংগঠনিক কাঠামো সুগঠিত হয়েছিল শেখ মুজিবের হাতে। আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ১ বছর ১০ মাসের মাথায় প্রতিষ্ঠিত হয় এটি। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক ও "নিরাপত্তা বন্দি" হিসেবে জেলে অন্তরীণ বঙ্গবন্ধুকে করা হয়েছিল দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক। বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি মওলানা ভাসানী ও শামসুল হক কিছুদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার হন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে মুক্তিলাভ করেন বঙ্গবন্ধু। শামসুল হক কারাগারে বন্দি থাকায় ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৫৩ সালে ছাত্রলীগ ও ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগের নাম থেকে "মুসলিম" শব্দ বাদ দেন বঙ্গবন্ধু। যার ফলে সংগঠন দুটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৫৪ সালের মে মাসে বঙ্গবন্ধু পুনরায় গ্রেপ্তার হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়কাল ছিল আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক বিস্তার কাল। আওয়ামী লীগকে একটি শক্তিশালী দলে পরিণত করতে বঙ্গবন্ধু অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। শিকার হয়েছেন মুসলিম লীগ সরকারের অবর্ণনীয় জেল-জুলুম-অত্যাচারের। অবিরাম ছুটে গেছেন দেশের এক জেলা থেকে আরেক জেলায়, এক মহকুমা থেকে আরেক মহকুমায়। কখনো তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কখনো মওলানা ভাসানী, কখনো অন্য নেতারা।

বঙ্গবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠার প্রায় সাড়ে চার বছর পর ১৯৫৩ সালের ১৪-১৬ নভেম্বর ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন হয়। তত দিনে দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হন বলে বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। সম্মেলনে মওলানা ভাসানী সভাপতি, বঙ্গবন্ধু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এভাবেই তাঁর ব্যক্তিজীবন একীভূত হয় জাতীয় জীবনের ঘটনাক্রমের ধারায়। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* হয়ে ওঠে দ্রোহের এক রক্তস্নাত আঙিনা। গবেষক নূহ-উল-আলম লেনিন লিখেছেন—

> বাঙালি জাতিসত্তার অখণ্ড চৈতন্য-অসাম্প্রদায়িক জাতি-চেতনা নির্মাণে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৯৪৮-৫২-এর ভাষা সংগ্রাম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। ভাষা সংগ্রামের পথ বেয়ে ২১ দফা কর্মসূচির সপক্ষে '৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, '৬২-এর সামরিক

> শাসনবিরোধী আন্দোলন এবং ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বাঙালির স্বাধিকারের দাবি হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। (নূহ-উল-আলম লেনিন ২০০৭: ৩৯)

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়—ভারত ও পাকিস্তান। লাহোর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলো নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হলেও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একটিমাত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান জন্ম হবে বলে ঘোষণা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি অংশ নিয়ে—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব ছিল এক হাজার ২০০ মাইল। দূরত্ব ছাড়াও দুই অংশের মধ্যে ভাষাগত সমস্যা ছিল প্রকট। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য ও অবহেলা। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক—সব ক্ষেত্রে চলে বৈষম্য-শোষণ-নিপীড়ন। দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক নেতাদের মনে নেমে আসে চরম হতাশা। এ সমস্তকিছুই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে। পাকিস্তানের শুরুতেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের প্রতি শোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ কেন করল, এর ব্যাখ্যায় বঙ্গবন্ধু যা বলেন, তা ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—"তাদের একটা ধারণা ছিল, পূর্ব বাংলা শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে থাকবে না।" (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২৪০)

১৯৫২ সালের অক্টোবরে চীনের শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন লেখক। এতে সাঁইত্রিশটি দেশের ৩৭৮ জন সদস্য অংশ নেন, বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেন। এখানেই প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব-পাকিস্তানের হয়ে গর্বিত চিত্তে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। লেখকের ভাষায়—

> পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য। বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু লোকের ভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে না জানে এমন শিক্ষিত লোক চীন কেন দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও আমি খুব কম দেখেছি। আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারি। তবু আমার মাতৃভাষায় বলা কর্তব্য। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২২৮)

পাকিস্তানের সমসাময়িক সময়ে স্বাধীন হওয়া কমিউনিস্ট নতুন চীন সফরে গিয়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। চীনের অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনার ব্যাপারেও তিনি সমর্থন করেছেন এবং নিজের দেশের সরকারের উদাসীনতা ও বিলাসিতার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। শান্তি সম্মেলনের ভ্রমণ একদিকে যেমন শেখ মুজিবের ভেতরে স্বাধিকার চেতনাকে শাণিত করে, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ তৈরিতেও সুদূরপ্রসারি প্রভাব ফেলে। সমাজতন্ত্রের মূলনীতি সাম্য ও গণমানুষের অধিকারে বিশ্বাস করতেন তিনি। সমাজতন্ত্রের প্রতি মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

> আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২৩৪)

১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানী যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। নামসর্বস্ব দলগুলো এতে ঢুকে পরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে আশঙ্কা করে শেখ মুজিব প্রথমে আপত্তি করলেও পরে মেনে নেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে করা হয় চেয়ারম্যান। আওয়ামী লীগ, ফজলুল হকের কৃষক, প্রজা পার্টি ও যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দল থেকে নমিনেশন দেওয়া হয়। নির্বাচনের দিনকয়েক আগে সোহরাওয়ার্দী এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, "মুসলিম লীগ নয়টির বেশি সিট পেলে আমি আশ্চর্য হব।" অবাক করা বিষয়, তাঁর ভবিষ্যতবাণী পুরোপুরি ফলেছিল, মুসলিম লীগ ৯টি আসনই পেয়েছিল।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল আসনে জয়লাভ করে। কেন্দ্রীয় সরকার অন্যায়ভাবে নির্বাচন বাতিল করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করে। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে করা হয় পূর্ব বাংলার গভর্নর। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে ভয় পেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ও তাদের তাঁবেদার আমলারা। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন—

> যুক্তফ্রন্ট ইলেকশনে জয়লাভ করার পরে বড় বড় সরকারি আমলাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। অনেকে প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম লীগের প্রচার করেছিল। আওয়ামী লীগ প্রথমে মন্ত্রিসভায় যোগদান না করায় তাদের প্রাণে পানি এসেছিল। যোগদান করার পরে তারা হতাশ হয়ে পড়ল এবং ষড়যন্ত্রে যোগদান করল। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২৬৬)

> ২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল: মুসলিম আসন ২৩৭টি—যুক্তফ্রন্ট ২২৩ (আওয়ামী লীগ ১৪০, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৪, নেজামে ইসলামী ১২, যুবলীগ ১৫, গণতান্ত্রিক দল ১০, কমিউনিস্ট পার্টি ৪; ও স্বতন্ত্র ৮); মুসলিম লীগ ৯; খিলাফত-ই-রব্বানী ১; স্বতন্ত্র ৪। সাধারণ আসন (অমুসলিম সদস্য) ৭২টি—কংগ্রেস ও অন্যান্য ৭২। (রঙ্গলাল সেন ১৯৮৬: ১২৩-১২৫)

দেশপ্রেম, ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের মানসিকতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যায় অনন্য উচ্চতায়। সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসা অর্জন করেন তিনি। স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল সুদূরপ্রসারি, নিঃস্বার্থ। পশ্চিম পাকিস্তানের নব্য ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। এ আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বাংলার গ্রাম-গঞ্জে, নগর-বন্দরে। গবেষক যথার্থই লিখেছেন—

> আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত সভা করেছেন, জনমত গঠন করেছেন। এ দেশের প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণও দীর্ঘ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনা করেছেন। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমেই স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতা শুধু একটি যুদ্ধের মাধ্যমে আসেনি। এই যুদ্ধের পটভূমি দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে রচিত হয়েছিল। (আনু মাহমুদ ২০১১: ৩৬)

বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায় *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র পাতায় পাতায়। গ্রন্থটি পাঠান্তে মনে হয়, লেখক যেন নিজের প্রসঙ্গে বলার

চেয়ে সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ঘটনা ও অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান উল্লেখেই বেশি আগ্রহী। বাংলাদেশের জলে যাঁর ছবি, এমনভাবে তিনি ছাড়া আর কে ভাবতে পারেন! স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যবর্তনের পর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।" (বঙ্গবন্ধু পরিষদ ১৯৯৯: ২৬৯)

বাঙালি জাতির স্বাধীনসত্তায় উন্নীত হওয়ার দুর্গম সোপান অতিক্রমণের প্রতিটি ধাপ উঠে এসেছে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র সবিস্তার বর্ণনায়। বাংলাদেশের সার্বভৌম ভূখণ্ডে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তর কঠিন পথে এই মহান নেতার যাপিত জীবন ও সংগ্রাম ছিল ওতপ্রোত। তাই *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* কেবল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনকাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, হয়ে উঠেছে দেশপ্রেমের এক অনুপম কাব্যগাঁথা, বাঙালি জাতির আত্মকথন।

তথ্যসূত্র

আনু মাহমুদ (২০১১), *জাতিরাষ্ট্রের জনক বঙ্গবন্ধু*, দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা।

আশরাফ হোসেন (২০১৪), *বঙ্গবন্ধু: তাঁর রাজনীতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট*, উত্তরণ, ঢাকা।

আহমদ রফিক (২০১২), *ভাষা-আন্দোলন: ইতিহাস ও উত্তরপ্রভাব*, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

নূহ-উল-আলম লেনিন (২০০৭), *বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির স্বপ্ন*, ঝিনুক প্রকাশনী, ঢাকা।

বঙ্গবন্ধু পরিষদ (১৯৯৯), *বাঙালির কণ্ঠ*, ঢাকা।

রঙ্গলাল সেন (১৯৮৬), *পলিটিক্যাল এলিটস ইন বাংলাদেশ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১২), *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১৭), *কারাগারের রোজনামচা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হারুন-অর-রশিদ (২০০১), *বাংলাদেশ : রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন, ১৯৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা।

হারুন-অর-রশিদ (২০১৩), *বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনী পুনর্পাঠ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

রুদ্রমঙ্গল
মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা ॥ ১৪২৭-১৪২৮ ॥ ২০২০-২০২১ ॥ ISSN 2415-4695
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

অসাম্প্রদায়িকতা: বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও বিবৃতি

মো. আল-আমিন*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক আদর্শ উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ এবং বিবৃতি অধ্যয়ন করে এটা অনুধাবিত হয়েছে যে, শৈশবে মুসলিম লীগের সাথে সম্পৃক্ত হলেও তিনি ছিলেন আজন্ম অসাম্প্রদায়িক এবং মুসলিম লীগের সাথে তথা পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে তাঁর সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সামাজিকীকরণ এবং সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা থাকলে সাম্প্রদায়িকতার সাথে তাঁর আদর্শের দ্বান্দ্বিক অবস্থান ছিল, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৯৪৬ সালে কলকাতাসহ বিভিন্ন দাঙ্গার বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান। এভাবেই অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতার আন্দোলন এবং স্বাধীনতার পরবর্তীতে তিনি অসাম্প্রদায়িকতাকে সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার রূপে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিতে রূপায়িত করেই সমাপ্ত হয়নি বরং বঙ্গভূখন্ডে আর যাতে ধর্মের নামে রাজনীতি না হয়, তথা সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন না হতে পারে সে লক্ষ্যে আমৃত্যু সংগ্রামের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম এবং বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন।

১. ভূমিকা

রাজনীতির ধারা প্রবহমান, যেখানে জীবন, সমাজ এবং এর উপাদানসমূহ নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট। সমাজের আর সব উপাদানের ন্যায় রাজনীতিরও রয়েছে আপন চারণভূমি, পরিবেশ ও পরিসর, যেখানে ভাষাবোধেরও ভিন্নতা রয়েছে। রবার্ট ডালের মতে, "রাজনীতি মানুষের জীবনের এক অপরিহার্য বাস্তবতা। প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনোভাবে, কোনো না কোনো সময়ে কোনো না কোনো ধরনের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে জড়িত হয়।" (Dahl 1976: 1) রাজনীতিকে যেমন এড়িয়ে চলা যায় না, তেমনি এর নিজস্ব ভাষাকে ধারণ এবং বাহন না করে রাজনীতিতে অনুঘটক হিসেবে নিজেকে

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল

উপস্থাপন করা যায় না। রাজনীতিকরা নিজস্ব আলয়ে এবং ভঙ্গিতে রাজনীতিকে চর্চা করে এবং শাসন-ব্যবস্থার সুবিধার জন্য তথা রাজনীতিকে নিজস্ব রূপে রূপায়িত করার জন্য স্ব স্ব উপযোগী ভাষা এবং শব্দ, এমনকি সাংকেতিক ভাষাও আমদানি বা রূপায়ণ করে থাকেন, যার দ্বারা মূলত কর্মীদেরকে আকৃষ্ট এবং দলকে আপন ভুবনে উপস্থাপিত করেন। এক্ষেত্রে, আব্দুল হাই বলেন, "ভাষা রাজনীতিকদের হাতের পুতুল হয়ে ওঠে। সে ভাষা দিয়ে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য যেমন প্রচার করিয়ে নেন, তেমনি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে কুণ্ঠিত হন না।" (হাই ১৯৬৯: ১৯৮) রাজনীতির ভাষার বিভিন্ন প্রায়োগিকরূপের মধ্যে ভাষণ এবং বিবৃতি সর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রায়োগিক। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অসংখ্য রাষ্ট্রনায়ক রয়েছেন যারা তাঁদের রাজনৈতিক কর্মযোগের পাশাপাশি বিশ্ববিখ্যাত ভাষণের মাধ্যমে মানব মুক্তির নায়ক হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসে স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়েছেন। Jacob F. Field (জন্ম: ১৯৮৩) তাঁর গ্রন্থে ৪১ জন সামরিক-বেসামরিক জাতীয় বীরের ভাষণ উপস্থাপন করেছেন। যেখানে গ্রীক নগর রাষ্ট্র এথেন্সের বিখ্যাত পেরিক্লিস থেকে শুরু করে আব্রাহাম লিংকনসহ ১৯৮৭ সালে বার্লিন ওয়ালের সম্মুখের ভাষণও স্থান পেয়েছে। যাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠভাষণের স্থান পেয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণটি যা বাঙালি জাতির ইতিহাসে অনন্য দলিল। (Field 2013: 201-205) ৭ মার্চের ভাষণটি বর্তমানে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব-ঐতিহ্যের দলিল হিসেবে স্বীকৃত। শুধু ৭ মার্চের ভাষণে নয়, বরং বঙ্গবন্ধু সমগ্র জীবনব্যাপী বাঙালি জাতির মুক্তিকল্পে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ বা বাহন করেছেন তা তাঁর ভাষণে এবং বিবৃতিতে বারংবার উপস্থাপিত হয়েছে। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে, জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) সাহেবদের সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই তিনি অসাম্প্রদায়িক বাঙালির বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে, বক্তৃতা বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে হুঙ্কার তুলেছেন। বর্তমান নিবন্ধে প্রথমে ভাষণ এবং অসাম্প্রদায়িকতার তাত্ত্বিক কাঠামো বিনির্মাণের চেষ্টা করা হবে এবং পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে যে অসাম্প্রদায়িক দর্শনের উন্মেষ তা উৎঘাটনের সাথে সাথে পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এই অসাম্প্রদায়িকতার রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যে রূপায়ণ করেছে তা উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

২. অসাম্প্রদায়িকতা এবং রাজনৈতিক ভাষণ

বঙ্গবন্ধুর জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র সাড়ে তিন বছর ক্ষমতায় ছিলেন। ক্ষমতার চেয়ে তার বাইরে গিয়ে বেশিরভাগ সময়ই তিনি ব্যয় করেছেন, ঔপনিবেশিকতা, অনিয়মতান্ত্রিকতা এবং সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে। প্রথমে তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা এবং পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তানি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক

এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁকে জীবনের অধিকাংশ সময়ই জেলে কাটাতে হয়েছে। তাঁর এই সংগ্রামী জীবনের মৌল আদর্শ অসাম্প্রদায়িকতা: যা ভাষণ, বিবৃতি এবং সাম্প্রতিক প্রকাশিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* এবং *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থসমূহের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে, তবে তাঁর আদর্শিক চেতনা অসাম্প্রদায়িকতা মূলত রাজনৈতিক বয়ান এবং ভাষণের মাধ্যমেই জনসম্মুখে এসেছে। আলোচ্য অংশে প্রথমে অসাম্প্রদায়িকতা এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ভাষণের উপর একটি তাত্ত্বিক কাঠামো বিনির্মাণের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

সাধারণভাবে অসাম্প্রদায়িকতা বলতে সম্প্রদায়হীনতা নয় বরং তার ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার পক্ষাবলম্বন করা। ধর্মনিরপেক্ষতার ন্যায় অসাম্প্রদায়িকতাও ধর্মহীনতা নয় বরং সকল ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি নিরপেক্ষ থেকে সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার ভোগের প্রয়াসই অসাম্প্রদায়িকতা। সকল ধর্মের, সকল বর্ণের এবং সকল পেশার মানুষ যখন পারস্পারিক সম্প্রীতি বজায় রেখে আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালিত হবে এবং তা জীবনাদর্শ হিসেবে ধারণ করবে তখন তাকে অসাম্প্রদায়িকতা বলে। অসাম্প্রদায়িকতা শব্দ চয়নের সাথে সাথে সাম্প্রদায়িকতা প্রত্যয়টি চলে আসে, যা অসাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে অনুধাবনের পূর্বশর্ত। তাই অদ্য আলোচনায় সাম্প্রদায়িকতা ধারণাটি প্রাধান্য পাবে।

সাম্প্রদায়িকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Communalism (কমিউনালিজম) সম্পর্কে অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান বলেছে, "A strong sense of belonging to a particular community, especially a religious community, that can lead to extreme behaviour or violence towards others." (OLD, 2021) অধিকাংশ তাত্ত্বিকই সাম্প্রদায়িকতা অর্থে বিশেষ করে ধর্মীয় দ্বান্দ্বিক গোষ্ঠীসমূহকেই নির্দেশ করে, বিশেষ করে হিন্দু মুসলমানদের দ্বন্দ্ব বোঝাতে। তবে বিজ্ঞজনের মতে এই অর্থ ভারতীয় উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই সীমাবদ্ধ। সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের উৎসের সন্ধানে অধিকাংশই ব্রিটিশ "ভাগ কর শাসন কর" নীতিকে দায়ী করলেও, হিন্দু-মুসলমান সত্তার তাত্ত্বিক সীমানা বিন্যাস করেছিল একটি প্রাচ্যবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্পের অংশ, তবে ব্রিটিশরা এটিকে পূর্ণরূপে আপন স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিল:

> 'হিন্দু' শব্দের ইতিহাসের দিকে নজর দিতে পারি, যা মূলত ফারসি এবং ব্যুৎপত্তিগতভাবে সিন্ধু (ও ইন্ডিয়া, ইন্ডাস হিন্দ প্রভৃতি) শব্দের সাথে সম্পর্কিত। শব্দটি শুরুতে শুধু ভৌগোলিক পরিচিতিই বোঝাতো। অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকা তথা এর পূর্ব প্রান্তের অধিবাসীদের বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। তার মানে একসময় এ উপমহাদেশের মুসলমানরাও 'হিন্দু' ছিল 'ইন্ডিয়ান' অর্থে। (ত্রিপুরা ২০১৫: ৮৩)

কিন্তু প্রশ্ন হলো ব্রিটিশ আমলে কিভাবে আমূল পরিবর্তন হয়ে "হিন্দু" শব্দটি হিন্দু আর মুসলমান পরিচয়ের দলিল হিসেবে আর্বিভূত হলো। তবে যেভাবেই এর আর্বিভাব হোক

না কেন? ব্রিটিশরা তা লুফে নিতে কুণ্ঠিত হয়নি বরং "ভাগ কর শাসন কর" নীতির আমূল প্রয়োগ করে হিন্দু-মুসলমানদের দুটি আলাদা সম্প্রদায় হিসেবে উপস্থাপন করে নিজেদের শাসন করার বৈধতা ধরে রেখেছে অকুণ্ঠভাবে। এখানে উল্লেখ্য সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি উপমহাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু এটি শুধু ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং হিন্দু বর্ণ প্রথা কিংবা জাতের মধ্যে সংঘর্ষ বোঝাতে বা মুসলমান সিয়া-সুন্নি দাঙ্গা বা সংঘর্ষ বোঝাতেও সাম্প্রদায়িতা শব্দটির প্রচলন অনেকাংশেই দৃশ্যমান। সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে মত দিতে গিয়ে সুরঞ্জন দাস বলেন:

> সাম্প্রদায়িকতা বাংলার হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ফসল। ব্রিটিশ রাজের নাগপাশ থেকে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই বিষয়টি এমন সব ঘটনাবলির ফল, যেগুলিকে অনেক সময়ই স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে স্ববিরোধী বলে মনে হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠার সাথে সাথে সাম্প্রদায়িকতা আত্মপ্রকাশ করে। এর ফলে উপমহাদেশ ধর্মভিত্তিক দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। (Das 2014)

সুরঞ্জন দাসের সাথে সাথে জয়া চ্যাটার্জিও প্রায় একই সুরে কথা বলেছেন, তিনিও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাথে সাম্প্রদায়িকতার এ ধরনের সূত্রতা দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, "আদর্শ এবং রাজনৈতিক আচরণের দিক থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেকার সম্পর্ক জটিল এবং বিপরীতধর্মী শক্তির একটি সংশ্লেষিত রূপ।" (চ্যাটার্জি ২০১৪: ১) বদরুদ্দীন উমর ব্যক্তি দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্প্রদায়িতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতকে বিবেচনায় নিলে বা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিপাত করলে ধর্মগত বিদ্বেষই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা এবং এটি এই উপমহাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ এবং যার মূলে আছে প্রধানত হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়। আবার তিনি ধর্ম, ধর্মনিষ্ঠা ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ এবং পার্থক্য করতে গিয়ে বলেন,

> ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে যোগসম্পর্ক থাকলেও সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিষ্ঠা স্বতন্ত্র জিনিস।...ধর্মের আচার বিচার এবং তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে তাকে আমরা বলি ধর্মনিষ্ঠা। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা পৃথক জিনিস। কোন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয়া হয়, যখন সে এক বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্ম সম্প্রদায় এবং অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচারণ ও ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে। (উমর ২০১৫: ১১)

তাঁর মতানুসারে ধর্মনিষ্ঠার সাথে যোগ আছে ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার, তত্ত্ব এবং বিশ্বাসের সাথে অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার সাথে সম্প্রদায়ের সম্পৃক্তি বিদ্যমান। সাম্প্রদায়িকতার জন্য তাই কোন মতেই ধর্মে নিষ্ঠাবান তথা ধর্মপরায়ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। সাম্প্রদায়িকতার যে অভিব্যক্তি আমরা দেখলাম তাতে এটা অনুমেয় যে:

> এইভাবাবেগে যতোটা না স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রীতি, তার চেয়ে অনেক বেশি অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অপ্রীতি; যতোটা না স্নিগ্ধ হৃদয়বৃত্তি, তার চেয়ে অনেক বেশি অসূয়াবৃত্তি। বস্তুত অনুভব এবং কর্মে সাম্প্রদায়িকতা প্রধান উদ্দেশ্য স্ব-সম্প্রদায় নয়, বরং বিপরীত ধর্মীয় সম্প্রদায়। (হক ২০১৭: ৭০)

একারণেই সাম্প্রদায়িকগণ আপন সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নয়, বরং অপর সম্প্রদায়ের চেতনার আবেশে, অবসেশনে সাংঘর্ষিক রূপে আবির্ভূত হয়, সেবাপরায়ণে নয়। আবার অপর সম্প্রদায়ের প্রপীড়িত সাধনে যতোটা ভাবাবেগশীল, স্ব-সম্প্রদায়ের সেবায় ততোটা ব্রতী এবং ক্রিয়াশীল নয়। যে কারণে সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম একটি লক্ষণ হচ্ছে, ভাবাবেগ, আচরণ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় শুচিবায়ুগ্রস্ততা, এছাড়াও অপ্রীতি এবং অপর সম্প্রদায়ের মানুষের হাত থেকে আহার গ্রহণে অন্নপাপ, এমন কি অপর সম্প্রদায়ের স্পর্শে সুচি-অসুচিভাবও সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ। সাম্প্রদায়িকতার এমন আচরণেই হয়তো অনেকে মাংস ভক্ষণ না করে গোশত খাওয়া সমীচীন মনে করল, জলপানে তৃপ্ত না হয়ে পানি পান করল, এভাবেই হিন্দুর গান্ধী, মুসলিমের জিন্নাহ্; হিন্দুর মহাত্মা গান্ধী, মুসলিমের কায়েদে আযম; হিন্দুর রবীন্দ্রনাথ, মুসলিমের নজরুল; হিন্দুর গান্ধী টুপি, মুসলিমের জিন্নাহ্; হিন্দুর অবন ঠাকুর, মুসলিমের জয়নুল আবেদিন; হিন্দুর বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিমের আলীগড় বিশ্বাবিদ্যালয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথের *আমার পণ*—"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি/সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি..." শিশু পাঠের এ কবিতা ইসলামীকরণ করে পড়া হল, "ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি/সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।" (হাই ২০১৯: ৯৫) উপনিবেশিক এই বিভাজন অদ্যাবধি বিদ্যমান, যার দরুন অতিসম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের রচিত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের বিকৃতির ঘটনা ঘটেছে, যা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যেখানে জাতীয় সংগীতের, "আমার সোনার বাংলা/আমি তোমায় ভালোবাসি"কে বিকৃত করে ইসলামীকরণ করে বলা হয়েছে, "আমার সোনার মাওলা/আমি তোমায় ভালোবাসি।" সুতরাং ঔপনিবেশিকতার সৃষ্টি সাম্প্রদায়িকতা অদ্যাবধি বহমান, যদিও এর সৃষ্টিকারীরা বহুকাল পূর্বে এভূখণ্ড ত্যাগ করছে কিন্তু সঞ্জীবিত রয়েছে তাদের সৃষ্টি, এখনও ধর্মের নামে বলি হয় বহুপ্রাণ, সমাজ এবং সংস্কৃতি।

সাম্প্রদায়িকতার কারণ হিসেবে প্রথমেই চিহ্নিত করা হয়, ঔপনিবেশিকতার সৃষ্টি "ভাগ কর শাসন কর" নীতিকে জওহরলাল নেহরুসহ অনেকের অভিমত হলো, "সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি ইংরেজি ভেদ নীতির পরিণাম।" তবে এক্ষেত্রে তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং স্বার্থের সাথে এক করে দেখান। তাঁর মতে,

> In political matters, religion has been displaced by what is called communalism, a narrow group mentality basing itself on a religious community but in reality concerned with political power and patronage for the interested group. (Nehru 1989: 380)

তবে অধিকাংশ তাত্ত্বিকই সাম্প্রদায়িকতার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা বলেছেন। মুসলমানদের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অবশ্য প্রদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়নি। সম্প্রদায় হিসেবে তারা জীবিকা

নির্বাহ করত মূলত চাষী কৃষক এবং হিন্দু জমিদার কর্তৃক নিয়োজিত খেতমজুর হিসেবে। মুসলমান চাষীদের ওপর হিন্দু প্রাধান্য আরও দৃঢ় হয়েছিল ঋণের জন্য হিন্দু মহাজন-এর উপর মুসলমান খাতকদের নির্ভরতার মাধ্যমে। প্রচলিত খাজনা নিয়মিত পরিশোধ করা ছাড়াও পূজাবাবদ ও জমিদারিতে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি, যেমন জমিদার পরিবারে নতুন শিশুর জন্ম কিংবা বিবাহানুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য মুসলমান চাষীদের অতিরিক্ত চাঁদা এর বোঝা বহন করতে হতো। (Das 2014)

> আবার বাংলায় কিছু মুসলিম জমিদার থালেও মহিলারা উত্তাধিকার হিসেবে অংশ হওয়ার ফলে তা ক্রমশ ছোট হয়েছিল অন্যদিকে হিন্দু জমিদারদের ক্ষেত্রে তেমনটি দৃষ্টিগোচর হয়নি। আবার সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য ছিল চরম। (Das 1991: 17–19)

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অর্থনৈতিক বিভাজন এবং বৈষম্যকে অনেকেই সাম্প্রদায়িকতার কারণ বলে থাকেন। তবে কিছু তাত্ত্বিক সাম্প্রদায়িকতা বিষয়টি জটিল এবং ভারতীয় সমাজের একটি দীর্ঘকালের মজ্জাগত ব্যাধি বলে উল্লেখ করেন।

তাদের মতে,

> হিন্দু সমাজে প্রচলিত বর্ণপ্রথা অনুযায়ী বর্ণাশ্রম থেকে বর্ণবিভেদ ও বর্ণসংঘর্ষ উদ্ভূত, যা প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। বর্ণভেদের কারণে হিন্দু সমাজে হানাহানি এবং সংঘর্ষকেই কেউ কেউ সাম্প্রদায়িকতার কারণ হিসেবে বলে থাকে। (হাই ২০১৯: ৯১)

সামগ্রিক বিচারে সাম্প্রদায়িকতার সাথে যারা জড়িত তাদের ব্যক্তি স্বার্থকে অনেকেই সাম্প্রদায়িকতা বলবৎ থাকার কারণ বলে উল্লেখ করেন, যাকে কেউ কেউ আবার রাজনৈতিক স্বার্থ হিসেবেই দেখে থাকেন। যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাম্প্রাদায়িকতার বোধকে জনগণের ভাবাবেগে তাড়িত করে স্ব-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর সম্প্রদায়ের লোকদের উপর প্রপীড়ন অব্যাহত রেখেছেন, কিন্তু এর বিপরীত কার্যপ্রক্রিয়াও বিদ্যমান ছিল, যারা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ডাক দিতে পেরেছিলেন, যাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু অন্যতম, যা বিস্তারিতভাবে পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হবে। তাঁর অভিমত ছিল অনেকটা ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতোই। শহীদুল্লাহ্ ১৯৪৮ সালে ঢাকায় একটি ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন,

> আমরা হিন্দু মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয়; এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই। (হাই ২০১৯: ৯৬)

যার সারমর্ম হলো হিন্দু বা মুসলিম নয় বরং রক্তের ধারার ধারক হিসেবে বাঙালিত্ব সকলের ঊর্ধ্বে, যেখানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নয় বরং সম্প্রীতিই প্রধান, যাকে অসাম্প্রদায়িকতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ অর্থে অসাম্প্রদায়িতা পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ, যেখানে প্রত্যেকে তার নিজ ধর্ম পালন করবে কিন্তু অন্যের ধর্ম পালনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

অন্যদিকে, রাজনৈতিক ভাষণ এবং বিবৃতির অধ্যয়ন নিয়ে আলোচনা সুপ্রাচীন না হলেও ব্লচ (১৯৭৫) এবং পাইন (১৯৮১) এর ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। দুজনেই আলাদা আঙ্গিকে রাজনৈতিক ভাষণকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ব্লচের মতে, "রাজনৈতিক ভাষণ এমন একটি বার্তাপূর্ণ বয়ান যা প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক শ্রেণি বিন্যাসের অবস্থানগুলিকে নিশ্চিত করে।" (Borgstrom 1982: 313) তিনি অবশ্য এখানে বক্তার আনুষ্ঠানিক ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মী এবং শ্রোতার কাছে কিভাবে কর্তৃত্ব এবং বৈধতা আদায় করেন, তার সক্ষমতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অন্যদিকে, "পাইন এটিকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে দেখিয়েছেন, যেখানে যথোপযুক্ত শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে একজন রাজনীতিবিদ শ্রোতার সহানুভূতি এবং অনুমোদন অর্জন করতে এবং ধরে রাখতে সক্ষম হন।" (Borgstrom 1982: 313) এখানে তিনি কর্তৃত্বের পরিবর্তে প্রেষণার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। রাজনীতিবিদ এবং তার শ্রোতার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বক্তৃতার বিশেষ প্রভাব রয়েছে, অনেক সময় বক্তার বক্তৃতা বা বিবৃতির মাধ্যমেই শ্রোতা তার অনুগামী হয়ে ওঠে। তাত্ত্বিকরা এক্ষেত্রে বক্তা এবং শ্রোতার সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে ভাষণের কাঠামোর উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এক্ষেত্রে বেইলি (১৯৬৯) তিনটি মৌল কাঠামোর কথা উল্লেখ করেছেন রাজনৈতিক ভাষণের ক্ষেত্রে; পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং দর্শন বা মতাদর্শ। তাঁর মতানুসারে, রাজনীতিবিদ যখন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী আদর্শিক মানদণ্ডে কর্মসূচির মাধ্যমে ভাষণ প্রদান করবেন তখন অনেকাংশেই তা সফল হওয়া সম্ভব, যেখানে রাজনীতিবিদ অবশ্যই শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করবেন। সার্বিকভাবে রাজনৈতিক ভাষণ এবং বিবৃতি এমন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যেখানে রাজনীতিবিদ আদর্শ পরিকল্পনার মাধ্যমে তার মতাদর্শকে কর্মী এবং শ্রোতার মনোজগতে আলোড়ন সৃষ্টি তথা প্রভাববিস্তার করার লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করাকেই নির্দেশ করে। পরবর্তী অংশে রাজনৈতিক ভাষণ এবং বিবৃতির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু তাঁর অসাম্প্রদায়িক মতাদর্শকে প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন তার উপর গুরুত্বারোপ করা হবে এবং তাঁর ভাষণে যে অসাম্প্রদায়িকতার বাণী প্রতিফলিত হয়েছে তা উৎঘাটনের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

৩. বঙ্গবন্ধুর ভাষণে অসাম্প্রদায়িকতা

বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু একই সূত্রে গাথা। ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সৃষ্টির মূলমন্ত্র অসাম্প্রদায়িকতা, যার একই সাথে ধারক এবং বাহক বঙ্গবন্ধু। বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদান ও আত্মত্যাগ যেমন তাঁকে বঙ্গবন্ধুতে পরিণত করেছে তেমনি তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা একদিকে বাঙালি সত্তার যেমন পূর্ণতা দিয়েছে তেমনি বঙ্গবন্ধুকে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি দিয়েছে। আলোচ্য অংশে বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ এবং বিবৃতিকে অধ্যয়ন করে তাঁর এই অসাম্প্রদায়িক দর্শনকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হবে।

৩.১. অসাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পিছনের বঙ্গবন্ধুর যে আদর্শিক ভিত্তি চালকের ভূমিকা পালন করেছে তা হলো অসাম্প্রদায়িকতা, অপর দিকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থাপতি বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি শুরু হয়েছিল মুসলিম লীগের হাত ধরে, এমনকি সাম্প্রদায়িকতার ফল পাকিস্তান আন্দোলনেও তিনি ছিলেন। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, তিনি কিভাবে অসাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে আর্বিভূত হলেন এবং বাংলার আপামর জনগোষ্ঠী আবার তা গ্রহণ করলেন। প্রথমত তাঁর প্রাথমিক সামাজিকীকরণ হয়েছিল মুসলিম পরিবারে, স্বাভাবিকভাবেই এটা ধরে নেওয়া হয় প্রাথমিক সামাজিকীকরণের প্রচ্ছন্ন ছাপ পরবর্তী জীবনে লেপ্টে থাকে, যদি না কোন ব্যক্তির মধ্যে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন আসে। তাছাড়া সামাজিকীকরণ একটি সমগ্র জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, যেখানে মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পারিপার্শ্বিতার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান এবং এর সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায়, তাঁর জন্ম এমন পরিবারে যার সাথে বহুদিন পূর্ব থেকেই ইসলামিক ভাবধারা এবং সংস্কৃতির মিল বন্ধন ছিল, যা তাঁর আত্মজীবনীতেও উল্লেখ রয়েছে:

> টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশের নাম কিছুটা এতদঞ্চলে পরিচিত। শেখ পরিবারকে একটা মধ্যবিত্ত পরিবার বলা যেতে পারে। বাড়ির বৃদ্ধ ও দেশের গণ্যমান্য প্রবীণ লোকদের কাছ থেকে এই বংশের কিছু কিছু ঘটনা জানা যায়। আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশে। শেখ বোরহানউদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে। ...ইংরেজরা মুসলমানদের ভালো চোখে দেখত না। প্রথম ঘটনা, রাণী রাসমণি হঠাৎ জমিদার হয়ে শেখদের সাথে লড়তে করতে শুরু করলেন, ইংরেজও তাকে সাহায্য করল। কলকাতার একটা সম্পত্তি ও উল্টোডাঙ্গার আড়ত শেখের সম্পত্তি ছিল। এই সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন শেখ অছিমুদ্দিন। ...একবার দুই পক্ষে খুব মারামারি হয়। এতে রাণী রাসমণির লোক পরাজিত হয়। শেখদের লোকেদের হাতে তমিজুদ্দিন আহত অবস্থায় ধরা পড়ে এবং শোনা যায় যে, পরে মৃত্যুবরণ করে। মামলা শুরু হয় শেখদের সকলেই গ্রেফতার হয়ে যায়। পরে বহু অর্থ খরচ করে হাইকোর্ট থেকে মুক্তি পায়। (রহমান ২০১৫: ২-৫)

এমন বংশীয় উপসংস্কৃতি (Sub-culture) তাঁর সামাজিকীকরণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে বলে ধরে নেওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তাঁর মধ্যে এর মাধ্যমেই ব্রিটিশ এবং জমিদারি প্রথা বিরোধী মনোভাবের জন্ম নেওয়াটা স্বাভাবিক। এখানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে,

> আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা সরু খাল চলে গেছে, যে খাল মধুমতী ও বাইগার নদীর সংযোগ রক্ষা করে এই খালের পাড়েই ছিল বড় কাচারি ঘর। আর এই কাচারি ঘরের পাশে মাস্টার পণ্ডিত ও মৌলভি সাহেবদের থাকার ঘর ছিল। এরা গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত এবং তাদের কাছে আমার আব্বা আরবি, বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক শিখতেন। (হাসিনা ২০১৯: ২৬)

বঙ্গবন্ধু একদিকে যেমন মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, পাশাপাশি তিনি পারিবারিকভাবে আরবি শিক্ষা ও শিক্ষকদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। যার ফলে মনোজগতে প্রথমে ব্রিটিশ বিরোধী, জমিদারী প্রথা বিরোধী মনোভাব বিকশিত হয়, পাশাপাশি দরিদ্র মুসলিম জনোগোষ্ঠীর দুর্দশা তাঁকে ব্যথিত করতো, যার ফলে তিনি হয়তো চাইতেন যে, জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করে অভাবগ্রস্থ মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতে পারে মুসলিম লীগের হাত ধরেই। তাছাড়া কৈশোরের সমাপ্তি লগ্নে রাজনীতির হাতেখড়ি হয়েছিল সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে। তাই প্রাথমিকভাবে তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু এর পাশপাশি তাঁর মধ্যে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারণা জন্ম নিচ্ছিল এবং তাঁর মধ্যে কখনোই সাম্প্রদায়িকতা লালনের নজির পাওয়া যায়নি। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে তিনি লিখেছেন:

> ১৯৩৮ সালের ঘটনা। শেরে বাংলা তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং সোহরাওয়ার্দী শ্রমমন্ত্রী। তাঁরা গোপালগঞ্জে আসবেন। বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে...আমি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করলাম দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে। পরে দেখা গেল, হিন্দু ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থেকে সরে পড়তে লাগল। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেও ছাত্র, সে আমাকে বলল, কংগ্রেস থেকে নিষেধ করেছে আমাদের যোগদান করতে। যাতে বিরূপ সম্বর্ধনা হয় তারও চেষ্টা করা হবে...আমি এখবর শুনে আশ্চর্য হলাম। কারণ আমার কাছে তখন হিন্দু মুসলমান বলে কোন জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। এক সাথে গান বাজনা, খেলাধুলা, বেড়ান-সবই চলত। (রহমান ২০১৫: ১০-১১)

আলোচ্য ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাবই প্রকাশ পায় বা এ কথা বলা আরও যৌক্তিক হবে যে তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার জন্মই হয়নি। আবার তিনি বলেছেন যখন তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতা শোনেন তখন তিনি চঞ্চল কয়ে ওঠেন। যা মুসলিম লীগের আদর্শের সাথে তাঁর দ্বান্দ্বিকতাই প্রকাশ পায়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিত রচিত হয়েছিল দেশ বিভাগের বহুকাল পূর্বেই। নৃতত্ত্ব, ভাষা বা ইতিহাস সকল দিক থেকেই এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা বাঙালি এবং তাদের ভাষা বাংলা যা সরল সত্য এবং বাস্তব ব্যাপার কিন্তু হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে এই সরল সত্যটি খুব কুণ্ঠার সাথেই প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ধর্মের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে এক বাঙালিই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে; হিন্দু বাঙালি এবং মুসলমান বাঙালি অথচ সবার ইতিহাস এক এবং অভিন্ন। এক সময় এই বিভক্ত অথচ উভয়ই এক নিজেদের কলহের কারণে এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে প্রশ্ন করেছিল, "আপনি কি বাঙালি না মুসলমান?" এক্ষেত্রে হিন্দুরা যেমন দায়ী ততোধিক মুসলমানরাও দায়ী। এই সুযোগ জিন্নাহ সাহেবরা অত্যন্ত অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করেছিল এবং সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই:

> এ যুগে অবাঙালি অধ্যুষিত পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সহ-অবস্থান করতে গিয়ে বাঙালি মুসলমানকে ভাবতে হচ্ছে যে, সে বাঙালি। স্বাধীনতা পূর্বকালের তুলনায় এ চেতনার প্রকৃতি পৃথক: তখন হিন্দুদের সাথে সহ-অবস্থান করতে গিয়ে তাকে ভাবতে হতো সে মুসলমান; স্বাধীনতার যুগে অবাঙালি পাকিস্তানিদের সঙ্গে সহ-অবস্থান করতে গিয়ে স্বার্থ-সংঘাতের তাড়নায় তাকে ভাবতে হচ্ছে সে বাঙালি। এ ভাবনার জলন্ত উদাহরণ হচ্ছে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। (হক ২০১৭: ১৭-১৮)

বঙ্গবন্ধু এই অনুভূতিকে সহজেই অনুধাবন করেছিলেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিলেন। প্রথমে তিনি পাকিস্তান আন্দোলন করলেও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মূলত বাংলা। এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে অন্নদাশঙ্কর রায় প্রশ্ন করেছিলেন:

> 'বাংলাদেশের আইডিয়াটা প্রথম কবে আপনার মাথায় এল।' 'শুনবেন?' তিনি [মুজিব] মুচকি হেসে বললেন, সেই ১৯৪৭ সালে। আমি সুহরাবর্দী [সোহরাওয়ার্দী] সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালির একদেশ। বাঙালিরা এক হলে কী না করতে পারত। সারা জগৎ জয় করতে পারত। They could conquer the world. বলতে বলতে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। তারপর বিমর্ষ হয়ে বললেন, 'দিল্লি থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন সুহরাবর্দী ও শরৎ বোস। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ রাজি নয় তাদের প্রস্তাবে। তারা হাল ছেড়ে দেন। আমিও দেখি যে আর কোনো উপায় নেই। ঢাকায় চলে এসে নতুন করে আরম্ভ করি। তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নিই। কিন্তু আমার স্বপ্ন সোনার বাংলা। সে স্বপ্ন কেমন করে পূর্ণ হবে এ আমার চিন্তা। হবার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। লোকগুলো যা কমিউনাল। বাংলাদেশ চাই বললে সন্দেহ করত। হঠাৎ একদিন রব উঠল, আমরা চাই বাংলা ভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষাভিত্তিক আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দিই দেশভিত্তিক আন্দোলনে। পরে এমন একদিন আসে যেদিন আমার দলের লোকদের জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশের নাম কী হবে? কেউ বলে, পাক বাংলা, কেউ বলে পূর্ব বাংলা। আমি বলি, না বাংলাদেশ। তারপর আমি স্লোগান দিই জয় বাংলা। তখন ওরা বিদ্রুপ করে বলে, জয় বাংলা না জয় মা কালী! কী অপমান! সে অপমান আমি সেদিন হজম করি। আসলে ওরা আমাকে বুঝতে পারেনি। জয় বাংলা বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জয় যা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। (মামুন ২০২০)

এখানের প্রতিটি বাক্য সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী, তিনি পাকিস্তান মেনে নিয়েছিলেন তাও বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করা জন্য। অন্যদিকে মুসলিম লীগে তিনি যাদের অনুসরণ করতেন বা যার হাত ধরে তাঁর মুসলিম লীগে প্রবেশ সোহরাওয়ার্দীসহ অন্যান্য নেতারা উদারপন্থী অংশের। এখানে উল্লেখ্য ভাষার প্রশ্নে অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতারাই পাকিস্তানিদের মত মনোভাব পোষণ করতেন, সেখানে বঙ্গবন্ধুই অন্যতম রাজনীতিক যিনি সদ্য কলকাতা ফেরত হলেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার লক্ষ্যে ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিল। এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠ এবং আদর্শিক নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও উর্দুর পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন:

> 'যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তদানুসারে উর্দ্দুই হইবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু তাঁকে কিছুকাল পর বিভ্রান্তি থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেছিলেন এবং পরে সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটান। (রফিক ২০১২: ৬৬-৬৭)

অপরদিকে মুসলিম লীগে কট্টরপন্থী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারকদের সাথে তিনি ছিলেন না। এমনকি ১৯৪৬ সালে কোলকাতাসহ বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান নিয়েছেন। ১৯৪৮ সালের ঢাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে তিনি অকৃত্রিমভাবে কাজ করেছেন সোহরাওয়ার্দীর সাথে। ১৯৪৯ সালে তিনি মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিলেন, যাকে তিনি পরবর্তী সময়ে শুধু আওয়ামী লীগে রূপ দিয়েছিলেন। সুতরাং বলা যায়, তাঁর রাজনীতির হাতেখড়ি মুসলিম লীগের মাধ্যমে হলেও তিনি প্রথম থেকেই অসাম্প্রদায়িক ছিলেন, যদিও তা মুসলিম লীগের আদর্শের বিরোধী এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক আদর্শের ধারক হিসেবে আর্বিভূত হন।

৩.২. অসাম্প্রদায়িকতার বহিঃপ্রকাশ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর বঙ্গবন্ধু সর্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন, যেখানে তাঁর আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে জাতি, ধর্ম এবং বর্ণ নয় বরং বাঙালিই প্রধান হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সাল থেকে আমৃত্যু এই দর্শনকে ধারণ করেছেন এবং বাঙালিকে এর ছায়াতলে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন। আলোচ্য অংশে বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশের উপর দৃষ্টিপাত করা হবে, যেখানে মূলত তাঁর প্রদত্ত ভাষণ এবং বিবৃতির উপর গুরুত্বরোপ করা হবে।

৩.২.১. পাকিস্তান আইন পরিষদে অসাম্প্রদায়িকতা

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ইতিপূর্বে গঠিত আইনসভাই পাকিস্তানের গণপরিষদের মর্যাদা লাভ করে। সে হিসেবে এ গণপরিষদের উপরই শাসনতন্ত্র রচনার ভার অর্পিত হলেও, পরিষদ তা করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ছিল। ১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও নানা অজুহাতে শাসকগোষ্ঠী তা বিলম্বিত করে, ফলে ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ শাসনাধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভা চলছিল। এখানে উল্লেখ্য নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের আশঙ্কা থেকেই নির্বাচনে শাসক গোষ্ঠী বিলম্ব করছিল।

> ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত কার্যকর ছিল। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৭টি আসন (৯টি মহিলা আসনসহ) মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য এবং ৭২ টি আসন অমুসলিম (৬টি মহিলা আসনসহ) সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ছিল। (রশিদ ২০০১: ১৮৫-১৮৬)

এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়, যেখানে তাদের নির্দিষ্ট কোন কর্মসূচি ছিল না বরং তারা যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে "ইসলাম বিপন্ন", "পাকিস্তান বিপন্ন", "কমিউনিষ্ট", "ভারতীয় চর" প্রভৃতি অপপ্রচারে লিপ্ত ছিল, অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট

অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক "বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান" সহ ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে অভূতপূর্ব জয় পায়। এ নির্বাচনের ভিত্তিতেই গণপরিষদ নতুনভাবে গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন এ নবগঠিত গণপরিষদের অন্যতম সদস্য। পাকিস্তানের জন্য একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু এই গণপরিষদ ও ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে আইনসভার সদস্য হিসেবে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন, তা মূলত তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। প্রত্যেকটি বক্তৃতায় তিনি ইসলামিক ভাবধারা ব্যবহার করে জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য শাসক দলের সদস্যদের অভিযুক্ত করেন। তিনি দৃঢ়চিত্তে ইসলাম ধর্মকে অপব্যবহার করার কথা ঘোষণা করেন ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের সভায়। উক্ত সভায় আনীত গভর্নরদের বেতন সম্পর্কিত সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবে কথা বলতে গিয়ে ধর্ম ব্যবহারের বিষয়টি তুলে ধরেন। উক্ত বক্তৃতায় তিনি তির্যকভাবে গভর্নরদের ৬,০০০ রূপী বেতনের সাথে ইসলামিক নীতির তুলনা করে একে জনগণের সাথে প্রতারণা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এছাড়া তিনি সমাজতান্ত্রিক চীনের অবিসংবাদিত নেতা মাও সে তুং এর বেতনের সাথে এর তুলনা করেন, তাঁর বক্তব্যানুসারে পাকিস্তান ইসলামের দোহাই দিয়ে গভর্নদের বেতন নির্ধারণ করে শুধু ধর্মের অপব্যবহারই করছে, যা একদিক থেকে ইসলামের নীতির সাথে সাংঘর্ষিক অন্যদিকে জনগণের অর্থের অপব্যবহারও বটে। তিনি পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে ধোঁকা দেওয়ার বিষয়টিও উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে:

> Why give bluff to the people of East Bengal? They (Member of United Front) have to go back to East Bengal and face the people to whom they have made this declaration. I can tell my friends that in long run truth will shine and they will be out. For a few days you can bluff the East Bengal, but not for long. (খান ২০১৮: ১৪)

তাঁর বক্তব্য অনুসারে, জনগণকে ধোঁকা দিয়ে কিছুদিন টিকলেও পরিণামে সত্যটাই বেরিয়ে আসবে। পূর্ব বঙ্গে ফিরে গিয়ে আইন সভার সদস্যগণ তাঁদের ঘর বাড়ি থেকেও বের হতে পারবে না, কারণ তারা যা করছে তা ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। তিনি এর সাথে সাথে গভর্নরদের বেতন সম্পর্কে বলতে গিয়ে পুনরায় বলেন:

> This is the position in an islamic country. Our Ambassadors get Rs. 9,000 a month. Sir, This is the salary of our Ambassador at Washington and in that rich country of America, President Eisenhower get less than that. Sir, you cannot understand the position. I will ask my friends not to islam any more. You have no right to talk of islam when you are going to pay Rs. 6,000 to your Governors. (খান ২০১৮: ১৬)

বঙ্গবন্ধু নাগরিক অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন এবং ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের পক্ষে পাকিস্তান আইন সভায়ও তিনি কথা বলেছেন। ১৯৫৬ সালের ২১ জানুয়ারি খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন, যার মধ্যে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতিসহ নির্বতন মূলক আইনেরও তিনি বিরোধিতা করেন। এই দিনের বক্তব্যের মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নাগরিকের সমান অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, যা খসড়া সংবিধানে ছিল না। তিনি বক্তব্যের শুরুতেই ইসলামিক প্রজাতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং সংখ্যালঘু যারা মুসলমান নয় তাদের এই সংবিধানে অবস্থান কি হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন:

> Sir, this draft constitution is the embodiment of down-right treachery and sheer bluff. It begins with the name of 'constitution for Islamic Republic of Pakistan.' Sir, we want to make an Islamic Republic of Pakistan. The name is already here. May I ask a question my Nizam-i-Islam friends, particularly and from the members of the United Front, whether a non-Muslim can preside over the constituent assembly to frame an Islamic constitution or not?... It is, I think and I feel, that my country has given a non-Muslim the responsibility for a little while over this sovereign body and to frame a constitution for an over seven crores of the people of Pakistan, but we have started in the name of Allah, but, Sir, when we are going to make an Islamic constitution I ask whether a non-Muslim who does not believe in *La ilaha Illal-Lah Muhammadur Rasulullah,* who does not believe in the last Prophet of Allah, can preside over such a constitution-making body as ours? (খান ২০১৮: ২৮)

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের মৌল চেতনা অসাম্প্রদায়িকতা, তাছাড়া ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ২১ দফার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই অনুমেয় যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধচারণই ছিল নির্বাচনী ইশতেহারের মূলমন্ত্র। একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তাই, তিনি কখনোই সংখ্যালঘু অমুসলিমদের অধিকারকে খর্ব করার পক্ষপাতি ছিলেন না, বরং তাদের অধিকার এবং সাংবিধানিকভাবে যদি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হয় তাহলে এই সংখ্যালঘু যারা ইসলামিক আদর্শে বিশ্বাসী নয় তাদের অবস্থান এবং অধিকার খর্ব হওয়ার সন্দিহান থেকেই তিনি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র নিয়ে কথা বলেন। দৃঢ়তার সাথে তিনি আবার ঘোষণা করেন:

> I think it is an insult to speak in this fashion, we all are Pakistanis. Call everybody, every citizen, a Pakistani, irrespective of whether he is a Muslim, Hindu, Sikh, Christian or a Buddhist. Pakistan is not for Pakistani. Pakistan has not been formed for the Muslims alone. My friend says: 'We want to make a constitution for all the Muslims of the world.' All right, then, why are you not making constitution for the 50 crores of Muslims of entire world? You have the monopoly because, we the Pakistanis are Muslims, but there are Muslims in India, Muslims in Indonesia, we have Muslims in Iraq, in Egypt and in Turkey and other places… they want to bluff the people of Pakistan in the name of Islam. They have exploited the masses of Pakistan for the last seven or eight years in the name of Islam, in the name of *Rasulullah.* (খান ২০১৮: ২৯)

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনায় ছিল বাংলার আপামর জনগণ কোন বিশেষ গোষ্ঠী নয়, এ কারণেই তিনি পাকিস্তানের সকল নাগরিককে পাকিস্তানি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সম্মত ছিলেন না। যেহেতু পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে এবং তা কোন নির্দিষ্ট স্থানের ভিত্তিতে বা জাতির ভিত্তিতে হয়নি, যা সময়ের বিবর্তে তাঁর কাছে এক ধরনের রাজনৈতিক ধোঁকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, তাই তিনি কোনক্রমেই সকল নাগরিককে পাকিস্তানি হিসেবে সাংবিধানিকভাবে অভিহিত করতে অসম্মত ছিলেন। তাছাড়া তিনি মনে করতেন, পাকিস্তানি হিসেবে স্বীকৃতি সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য যেমন মুসলিম, হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ সকলের জন্যই অবমাননাকর। অন্যদিকে, সকল মুসলমানদের জন্য একটি সংবিধান রচনার কথা উঠলে তিনি তার যৌক্তিক সমালোচনা করেন। সার্বিকভাবে যেহেতু ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে রচিত হচ্ছে না এবং সকলের প্রতিনিধিত্ব না থাকার কারণে তিনি এই সংবিধানকে জনগণের সাথে ধোঁকাবাজি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আবার সাংবিধানিকভাবে যখন যৌথ ভোটাধিকারের ব্যবস্থা বাতিল করা হয় তখন তিনি তার বিরুদ্ধাচারণ করে বলেন:

> In East Bengal Hindus and Muslims had jointly voted and Moulana Shihab was eleceted to this House. But they say that the system of joint electorate is non-Islamic. They have raised the question of *jaiz* and *na-jaiz* on this issue. Sir, this question of *jaiz* and *na-jaiz* is very dangerous because for the last eight years of the existence of Pakistan we have been voting in every election of Municipaity. District or Union Board, etc. Here also in the election of Municipal corporation of Karachi, the people voted jointly but nobody obected then or no Moulana raised the question of its charaterbeing un-Islamic. What has happened to the recent election to the interim West Pakistan Legislature? Why did they not raise a voice this election was non-Islamic? Sir, Mr. Khuhro was returned and saved because of the votes of Hindus. It is because of system of joint electorate that he got himself returned. (খান ২০১৮: ৩৬)

সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু সর্বতো সতর্ক এবং সজাগ ছিলেন, শুধু তাই নয় বরং যৌথ ভোট ব্যবস্থা যখন বাতিল নিয়ে ফতোয়া জারি করে এবং একে ইসলাম বহির্ভূত হিসেবে অভিহিত করার পাশাপাশি যৌথ ভোটাধিকার ব্যবস্থা যদি বলবৎ করা হয় তাহলে মুলসমানরা কাফির হয়ে যাবে। এমন প্রশ্নের উদ্রেক হলে, বঙ্গবন্ধু গণপরিষদে এর বিরুদ্ধে কথা বলেন। তাঁর মতে, পূর্ব বাংলার মানুষ ইউনিয়ন থেকে শুরু করে মিউনিসিপালিটি নির্বাচনে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে, এমনকি করাচিতেও যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে, আর যৌথ নির্বাচনে যদি মুসলমানরা কাফের হয়ে যায়, তাহলে ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সবাই কাফের হয়েছে, কারণ পূর্ব থেকেই তারা যৌথভাবে নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছে। বঙ্গবন্ধুর এমন উক্তির মূল কারণ মূলত সার্বজনীন ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, যাতে সংখ্যালঘু শ্রেণি কোনভাবে নির্যাতিত বা অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে সাংবিধানিকভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠা। আবার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধর্ম বা আদর্শ নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক রাখার পক্ষপাতি ছিলেন কিন্তু পাকিস্তান সংবিধানে যখন তা প্রাধান্য পাচ্ছিল না, তখন তিনি এর বিরোধিতা করেন এবং তা সংশোধনের জন্য ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সালের গণপরিষদের অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাবের পক্ষে তাঁর মত ব্যক্ত করেন:

> Sir, I support the ammendment and draw your attention to the fact that sometimes in internatioanl matters a country can make friendship with any other country of the world. Sir, if we catagorically say that we are Muslim state, then definitely we must make relations with other Muslim countries more cordial. Sir, might be if there is a war between Afghanistan and Pakistan or other non-Muslim countries might help us. I do not think that anywhere in any constitution of the world, it is written that the state shall eneavour to promote friendly relations with particular countries; no doubt we will do it, but why write in the constitution. For example, in the U. N. O. in Kashmir issue, there are so many non Muslim countries that are friendly to us, we have to play politics. There is the Muslim country of Indonesis which is friendly to India. Saudi Arabia is a kingdom: it is not a democratic country; no doubt we should be friendly with Saudi Arabia. There is Egypt and Iran. Naturally we should be on friendly terms with them; we should promote friendly relations with them all, but why write in the constitution. Today we may not be on good terms with India, but tomorrow we can be friendly with her. We can get more help from India than from any other country… This is politics, you have to play it. (খান ২০১৮: ৪৫-৪৬)

একটি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার সাংবিধানিক নীতি অনেকাংশে প্রভাবিত করে, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এই বিষয়টি মাথায় রেখেই "সকলের সাথে

বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়" কে পররাষ্ট্র নীতির মৌল কাঠামো নির্ধারণ করেছিলেন। বস্তুত বঙ্গবন্ধু কোন রাষ্ট্রের ধর্মীয় আবরণকে বিবেচনায় না নিয়ে বরং জাতীয় স্বার্থকে বরাবরই প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নেও তিনি এই মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন, কিন্তু তৎকালীন শাসকরা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টিকে সাংবিধানিক ভিত্তি দিতে চাইলে, তিনি তা সংশোধনের প্রস্তাব করেন। তাঁর মতানুসারে একটি রাষ্ট্রের ধর্ম দ্বারা তার সাথে সম্পর্ক কিরূপ হবে তা নির্ধারিত হতে পারে না এবং বিশ্বের কোন দেশ এমন নীতি গ্রহণ করে না বলেই তিনি এর বিরোধিতা করেন। এক্ষেত্রে তিনি দাবি করেন, এমন সময় আসতে পারে যখন আফগানিস্তানকে পাকিস্তানের আক্রমণ করতে হবে, কারণ তারা পাকিস্তানের ভূমিকে নিজের বলে দখল করতে চায়, তখন শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে। তাই তিনি রাষ্ট্রের ধর্মীয় অবয়ব নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক রাখার পক্ষপাতি, এমনকি তিনি দাবি করেন যে, যদিও ভারতের সাথে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক নেই কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এর পরিবর্তন হতে পারে। তাছাড়া কাশ্মীর ইস্যুকে নির্দেশ করেন যে, জাতিসংঘ কাশ্মীরকে সমর্থন করছে, যেখানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই মুসলিম নয়, কিন্তু শুধু মুসলমান রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক রাখার বিষয়টি যদি সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়, তাহলে ভবিষ্যতে জাতীয় স্বার্থ বিনষ্ট হতে পারে। সার্বিক বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসকদের ধর্মের ব্যবহারকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন, যা কালের পরিক্রমায় তাঁকে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে।

অন্যদিকে, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যেমন আন্দোলন করেছেন এবং আমরণ অনশন করেছেন, তেমনি তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ভাষা করার জন্য গণপরিষদে জোড় দাবি করেন। এখানে উল্লেখ্য, বাংলা ধর্ম, বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকলের ভাষা যার কোন ধর্মীয় রূপ নেই, কারণ এই বাংলায় যেমন একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী কথা বলে তেমনি খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এমন কি একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বিরাও কথা বলে, যে কারণেই ভাষা-আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃত। এই আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু একজন অকুতোভয় সৈনিক ছিলেন এবং গণপরিষদে তিনি পাকিস্তানিদের কু-মতলবের বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক বাংলা ভাষার পক্ষে কথা বলেন। ১৯৫৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আইন পরিষদের অধিবেশনে খসড়া সংবিধানের অর্ন্তগত ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, পূর্ববঙ্গে সরকারি ভাষা বলতে রাষ্ট্রীয় ভাষা বুঝি না। খসড়া সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ভাষা বলতে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল তার বিপক্ষে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেন:

> I would like to draw your attention to the clause of the draft constitution itself. It says: 'It should be the duty of the Federal and Provincial governments to take all possible measures for the development and growth of a National Language.' At another

> place they have again said that: 'The official languages of the Islamic Republic of Pakistan shall be Urdu and Bengali.' But you will notice. Sir, that in the present clause under consideration they say that all possible measures for the development and growth of a National Language will be taken by Federal and Provincial governments. I would specially like to draw your attention to the words 'a National Language' and, Sir, this seems to be very dangerous. Sir, the other day the foreign minister went to Dacca and he decleared in a press conference that the official language means state language…We in Bengal, by official language do not mean state languages…We must take all necessary steps immediately for the development and growth of these two (Bengali and Urdu) state languages. (খান ২০১৮: ৪৮-৪৯)

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করা নিয়ে পাকিস্তানিদের যে কু-মতলব ছিল, সে সম্পর্কে তিনি সর্তক সজাগ দৃষ্টি দিয়ে এর বিপক্ষে আইন সভায় খসড়া সংবিধানের সংশোধনের কথা বলেন। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে, একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি রাষ্ট্র ভাষা নিয়ে ধোঁকাবাজি বন্ধ করার কথা বলেন এবং ঘোষণা করেন, পূর্ববঙ্গের জনগণের দাবি এই যে, বাংলাও রাষ্ট্রীয় ভাষা হোক যার মাধ্যমে তিনি আবার অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দেন কারণ বাংলা কোন নির্দিষ্ট ধর্ম বা বর্ণের নয় বরং সকলের ভাষা।

সার্বিক বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত অসাম্প্রদায়িকতার চেতনাকে পাকিস্তান আইনসভায় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেখানে তিনি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের বিরোধিতা থেকে শুরু করে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, যৌথ ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণে ধর্মের প্রাধান্যকে অস্বীকার এবং অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি প্রদানের উপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে পুনরায় তাঁর আত্মপরিচয় জাতির সম্মুখে তুলে ধরেন।

৩.২.২. পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনে অসাম্প্রদায়িকতা

বঙ্গবন্ধু হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা বাঙালি সত্তার মূর্তপ্রতীক অসাম্প্রদায়িকতার ধারক এবং বাহক যার আত্মপ্রকাশ পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই শুধু নয় বরং শৈশব থেকেই ঘটেছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৮ সালেই তিনি ভাষা আন্দোলনের সাথে সক্রিয় হওয়ার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে এর রূপায়ণ শুরু করেন, যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ এই ২৩ বছর তাঁর নেতৃত্বে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমাগত বেগবান হয়েছে যার মূল ভিত্তি অসাম্প্রদায়িকতা। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মধ্য দিয়ে তিনি কলকাতা থেকে ঢাকা চলে আসলে সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে তিনি পূর্ববাংলায় অসাম্প্রদায়িকতা বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

ছিলেন। ১৯৫০ সালে ফরিদপুরের কারাগারে সহবন্দী (যার পৈতৃক নিবাসও গোপালগঞ্জ) চন্দ্রঘোষ বঙ্গবন্ধুকে বলেছেলেন, "মানুষকে মানুষ হিসেবে" দেখতে, যার প্রতি উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "চিন্তা করবেন না, আমি মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান বলে কিছু নেই। সকলেই মানুষ।" (রহমান ২০১৫: ১৯১) যার মাধ্যমে তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং এর বিপরীতমুখী নীতি পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে কখনো লক্ষ করা যায়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর গঠিত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা পায় তাঁর হাত ধরেই, কিন্তু চেতনার সাথে দ্বান্দ্বিক হওয়ায় তিনি এই দুটি সংগঠন থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাতিল করেন। প্রথমে ছাত্রলীগ থেকে ১৯৫৩ সালে এবং পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ থেকে ১৯৫৫ সালে যার মাধ্যমে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। আবার আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে পাকিস্তানের খসড়া সংবিধানের সংশোধনের নিমিত্তে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে তিনি ধর্ম এবং বর্ণের বিভেদ ভুলে সকলের জন্য সংবিধান রচনার কথা বলেছেন। তিনি দাঙ্গা বলতে শুধু হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নয় বরং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গারও বিরোধী ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লাহোরে ১৯৫৩ সালের কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার তীব্র নিন্দা করেন। আবার ১৯৫৪ সালে আদমজী পাট কলে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা যাতে বিস্তৃতি লাভ না করার নিমিত্তে তিনি জোর প্রচেষ্টা চালান। ১৯৬৪ সালে ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হলে পূর্ব বাংলায় তা যেন ছড়িয়ে না পরে তার নিমিত্তে তিনি "পূর্বপাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও" নামে প্রচারপত্র বিলি করেন দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠনের মাধ্যমে, যে কমিটি তাঁর নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে কাজ করে। ১৯৬৬ সালে প্রদত্ত ৬ দফার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং এর গুণাগুণ বিচারের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে তিনি বলেন,

> ৬ দফা শোষকের হাত হতে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার, ৬ দফা মুসলমান-হিন্দু, খ্রিষ্টান-বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙালি জাতির স্বকীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ ও নির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি, ৬ দফা বাঙালির আত্মমর্যাদার সম্মানজনক আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি। (খান ২০১৮: ১০৯)

এভাবেই তিনি ৬ দফা আন্দোলনকে অসাম্প্রদায়িক রূপ দান করেন। উক্ত ভাষণের সমাপ্তিতে তিনি বাংলার সকল নাগরিককে পাকিস্তানের বিপক্ষে জেগে ওঠার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি পুনরায় ঘোষণা করেন:

> বাংলার সকল অধিবাসী—সে সংখ্যাগুরুই হউক বা সংখ্যালঘুই হউক সকলকেই আজ দেশাত্মবোধ নিয়ে জেগে উঠতে হবে,—মরণপণ করে বাংলার মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে আজও যারা ঘুমিয়ে আছেন তাদেরকে এবার ডাক দিয়ে কেবল বলে যেতে চাই; জাগো, বাঙালি জাগো। তোমাদের জাগরণেই এদেশের বারো কোটি মানুষের মুক্তি। সামন্ত নেতৃত্ব লাঞ্ছিত পশ্চিম পাকিস্তানের

> আপামর মানুষও তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তোমরা তাদের নিরাশ করো না। জয় জনগণের জয়! জয় বাংলার জয়! (খান ২০১৮: ১১১)

এভাবেই তিনি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, অসাম্প্রদায়িকতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাঙালি সত্তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে। যেখানে থাকবে না ধর্মের দোহাই দিয়ে জনগণের সাথে ধোঁকাবাজি যা পাকিস্তানিরা করেছে সুদীর্ঘ সময় ধরে এবং বাংলাকে তারা নব্য কলোনি প্রতিষ্ঠা করেছে। আবার ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের প্রাক্কালে ৬ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি পুনরায় নির্বচানে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশের আহ্বান জানান।

> বাংলাদেশের ১৬২টি আসনের প্রত্যেকটি আসনে আপনারা আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। কারণ আপনাদের চাহিদামতো শাসনতন্ত্র পাশ করিয়ে আনতে হলে অনিচ্ছুক প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আমরা চাই নির্ভেজাল চাবিকাঠি। এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি আপনারা আমাকে জাতি, ধর্ম ও দল নির্বিশেষে দেন, তাহলে ওয়াদা দিচ্ছি, আপনাদের স্বার্থে অধিকার আদায় করে আনবোই। (খান ২০১৮: ১২৭-১২৮)

বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতি এবং সাহিত্যে স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং এর মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনী যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেছে সে সম্পর্কে তিনি সতর্ক ছিলেন। ১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর সাংস্কৃতিক ও চলচ্চিত্রবিষয়ক সাপ্তাহিকী *পূর্বাণী* কর্তৃক অনুষ্ঠিত সভায় তাঁর প্রদত্ত ভাষণে তিনি ভাষা, সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি শিল্পী, সাহিত্যিকদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ পূর্বক তিনি বলেন:

> ধর্ম ও সংস্কৃতির নামে আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ... আপনারা সবাই আমাদের ভাষা আন্দোলনের কথা জানেন। বাংলা ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্যে জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে। পাকিস্তান বেতার এবং টেলিভিশন এই ষড়যন্ত্রের দোসর। তারা রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল এবং আজও 'উঁচু মহলের এই ব্যাপারে জোর আপত্তি রয়েছে। জনগণ তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত সহ্য করবে না।' (খান ২০১৮: ১৩৩)

একটি দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি তার চেতনার রূপায়ণ করে, কিন্তু পাকিস্তান বাহিনী বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল আন্দোলনের সামনে তারা ক্ষণিকের জন্য ক্ষান্ত হলেও বঙ্গ সংস্কৃতির ধ্বংস সাধনে তারা প্রত্যহ লিপ্ত ছিল। এ কারণেই রেডিও টেলিভিশনে তার বাংলা সংস্কৃতির মুখপাত্র এবং বহিঃপ্রকাশসমূহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর এই ভাষণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার কথা পুনর্ব্যক্ত করে পুনরায় তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার জানান দেন। আবার ৭ মার্চের ভাষণে তিনি একদিকে যেমন স্বাধীনতার কথা বলেন এবং পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কথাও বলেন। তিনি নির্দেশ প্রদান করেন সকল বাঙালিকে যাতে শত্রু বাহিনীরা এদেশের হাজার বছরে ঐতিহ্য অসাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট না করতে পারে। তিনি এই ঐতিহাসিক ভাষণে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন:

> শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। (রশিদ ২০১৮: ১০২)

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা করেছেন, যা তিনি রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে নয় বরং আত্মচেতনার তাগিদে। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তা দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রতিটি বাঙালি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে, যার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যেকটি স্লোগানে, "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর", 'পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা', "জয় বাংলা"। এই সব স্লোগান বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যেকটি ভাষণের সমাপ্তিকালে উচ্চারিত "জয় বাংলা" ধ্বনি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একত্রিত করতে পেরেছিল এবং পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ, যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

৩.৩. রাষ্ট্রীয় পরিসরে অসাম্প্রদায়িকতার রূপায়ণ

পাকিস্তান রাষ্ট্রে অসাম্প্রদায়িতাকে ধারণ করেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার সংগ্রামে ডাক দিয়েছিলেন, যা ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পর তাঁর নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় এবং এখানে তিনি আজন্ম লালিত অসাম্প্রদায়িকতার প্রতিফলন ঘটান, আলোচ্য অংশে রাষ্ট্রীয় পরিসরে অসাম্প্রদায়িকতার রূপায়ণ নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

বঙ্গবন্ধু শুধু পাকিস্তান আন্দোলনেই নয় বরং বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই অসাম্প্রদায়িকতাকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলেন। ১০ এপ্রিল ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে জাতির জনক কর্তৃক উত্থাপিত স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাবে ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে:

> আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এর সঙ্গে সঙ্গে চারটি স্তম্ভকে স্মরণ করতে চাই, যে স্তম্ভকে সামনে রেখে আমাদের দেশের সংবিধান তৈরি করতে হবে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা। আমরা গণতন্ত্র দিতে চাই এবং গণতন্ত্র দিতেই আজ আমরা এই পরিষদে বসেছি।... আজ এখানে বসে চারটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে আমাদের ভাবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এমন সংবিধান রচনা করতে হবে, যাতে তারা দুনিয়ার সভ্য দেশের মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। (খান ২০১৮: ১৯৫)

শুধু ঘোষণা নয়, বরং এর বাস্তবায়ন হয়েছে ১৯৭২ সালের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে। তিনি বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের সাথে অঙ্গীভূত অসাম্প্রদায়িকতাকে রাষ্ট্রীয় রূপায়ণ করেন এভাবেই। ১৯৭২ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণে

জাতির আদর্শ সম্পর্কে তাঁর মত ব্যক্ত করেন। যেখানে তিনি ৬ দফাকে নির্দেশ করে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে চারটি স্তম্ভের কথা বলেন:

> এখন আমাদের একটা স্লোগান। আগে ছিল ৬ দফা, এখন বলি চারটা স্তম্ভ। আমার বাংলার সভ্যতা, আমরা বাঙালি জাতি—এনিয়ে হল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাংলার বুকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ থাকবে। এ হলো আমার এক নম্বর স্তম্ভ। দ্বিতীয় স্তম্ভ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। এ সমাজতন্ত্র আমি দুনিয়া থেকে ভাড়া করে আনতে চাই না, এ সমাজতন্ত্র হবে বাংলার মাটির সমাজতন্ত্র। এ সমাজতন্ত্র বাংলার মানুষের সমাজতন্ত্র, তার অর্থ হল শোষণহীন সমাজ, সম্পদের সুষম বন্টন। ...কিন্তু সমাজতন্ত্র যেখানে আছে সেদেশে গণতন্ত্র নাই। দুনিয়ায় আমি বাংলার মাটি থেকে দেখাতে চাই যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমি সমাজতন্ত্র কায়েম করবো। ...চতুর্থত: বাংলাদেশ হবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্ম নিরপেক্ষ মানে ধর্ম হীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। খ্রিষ্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্ম হীনতা নাই, ধর্ম নিরপেক্ষতা আছে। এর একটা মানে আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার, আল-বদর পয়দা করা বাংলার বুকে চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না। এ হল চার দফা, চার স্তম্ভ। (খান ২০১৮: ২৩৬)

বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভের দ্বারা মূলত অসাম্প্রদায়িকতাকেই নির্দেশ করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা সমাজে যে বিভেদ এবং সাংঘর্ষিক পরিবেশের সূচনা করে তা সম্পর্কে অবগত থেকেই তিনি রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন, যার অপর নাম অসাম্প্রদায়িকতা। তিনি সব রকমের ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধত্ব ও কূপমণ্ডূকতামুক্ত ছিলেন, কিন্তু একই সাথে ধর্মপরায়ণ ছিলেন, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না বলে অসাম্প্রদায়িকতার দর্শনকে রাষ্ট্রীয় রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

> ভবিষ্যতে যাতে কেউ ধর্মকে ব্যবহার করতে না পারে সে জন্য সাংবিধানিকভাবে, ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দল বা সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন '৭২ এর সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে। (রশিদ ২০১৮: ৪২)

রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অসাম্প্রদায়িকতার রূপায়ণের মাধ্যমেই তিনি এর পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন নি বরং পরবর্তী প্রত্যেকটি ভাষণে তিনি এর পক্ষে জোর প্রচারণা চালান এবং নির্বাচনে যাতে কেউ সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় না নেয় সেজন্যও তিনি আওয়ামী লীগের কর্মী এবং সমর্থকদের নির্দেশ দান করেন। সাম্প্রদায়িকতার ধারকদের ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সালে টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন:

> একটা কথা পরিষ্কার বলে যাই। একদল লোক সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের চেষ্টা করছে। বাংলার মাটিতে আর সাম্প্রদায়িকতার দানা বাঁধতে উঠতে দেওয়া হবে না। আপনারা আমার সঙ্গে আছেন? ...আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন? আপনারা বাঙালি এ কথা ভুলবেন না। আপনারা বাঙালি, আমরা বাঙালি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা

> যদি এর বিরুদ্ধে কোনোদিন কোন কাজ করতে চান তাদের মনে রাখা উচিত শাসনতন্ত্রে এই চারটি স্তম্ভ দেশের লোক মেনে নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে কথা বলা বেআইনি। আইন সকলের জন্য সমান। (খান ২০১৮: ৩৪৯)

স্বাধীনতার পর পুনরায় সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে বঙ্গবন্ধু এভাবেই হুঙ্কার তুলেন এবং সাম্প্রদায়িকতাকে বেআইনি ঘোষণা করে সাম্প্রদায়িকদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আবার তিনি সাম্প্রদায়িকতার স্রষ্টা এবং ধারকদের চরিত্রায়ণও করেছেন। সাম্প্রদায়িকদের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর মত ছিল সুস্পষ্ট:

> রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে, যারা সাম্প্রদায়িক তারা হীন, নীচ, তাদের অন্তর ছোট। যে মানুষকে ভালোবাসে সে কোনদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। আপনারা এখানে যারা মুসলমান আছেন তারা জানেন যে, খোদা যিনি আছেন তিনি রাব্বুল আলামীন—রাব্বুল মুসলেমিন নন। হিন্দু হোক, খ্রিষ্টান হোক, মুসলমান হোক, সমস্ত মানুষ তার কাছে সমান। সেজন্য এক মুখে সোস্যালিজম ও প্রগতির কথা এবং আর এক মুখে সাম্প্রদায়িকতা চলতে পারে না। একটা হচ্ছে পূর্ব আর একটা হচ্ছে পশ্চিম। যারা এই বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা করতে চায় তাদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে যেও। ... তোমাদের জীবন থাকতে যেন কেউ বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে না পারে। (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪)

বঙ্গবন্ধু নেতা কর্মীদের এভাবেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উজ্জীবিত করেছেন আমৃত্যু এবং সমগ্র জীবনব্যাপী অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা করে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আপন জন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। সার্বিকভাবে বলা যায়, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলন এবং স্বাধীনতার আন্দোলন শুধু নয় বরং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তিনি সাংবিধানিকভাবে আজন্ম লালিত অসাম্প্রদায়িক দর্শনকে রাষ্ট্রীয় আদর্শিক রূপ দিয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির পর তিনি এর পরিসমাপ্ত ঘোষণা না করে বরং আমৃত্যু এর পক্ষে জনগণকে উজ্জীবিত করেছেন এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রেরণার উৎস হয়ে আছেন।

৪. সার্বিক মূল্যায়ন

রাজনীতির গতিময়তার ধারায় রাজনীতিবিদরা আপন স্থান দখল করে নেয় তাদের কর্ম এবং মতাদর্শের দ্বারা এবং এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে অধিকাংশ সময়ই তাদের অনুসৃত ভাষণ এবং বিবৃতির মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুও এর বিপরীত নয়, কারণ তাঁর আদর্শিক ভিত্তি তথা মতাদর্শ প্রকাশ পেয়েছে অধিকাংশ সময়ই তাঁর প্রদত্ত ভাষণ এবং বিবৃতির মাধ্যমে। আলোচ্য প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত নির্বাচিত ভাষণ এবং বিবৃতিকে অধ্যয়ন করে তাঁর আজন্ম লালিত আদর্শ অসাম্প্রদায়িকতাকে উৎঘাটন করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, বঙ্গবন্ধুর মুসলমান পরিবার এবং সমাজে প্রাথমিক সামাজিকীকরণ হওয়ার কারণে এবং সোহরাওয়ার্দীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম লীগের সাথে সম্পৃক্ত হলেও তিনি কখনোই সাম্প্রদায়িকতাকে ধারণ বা লালন করেননি বরং ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গা শুরু হলে তার বিরুদ্ধচারণসহ সম্প্রীতি রক্ষার নিমিত্তে তিনি কাজ কাজ করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক ভাষা-আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন, এমনকি সোহরাওয়ার্দীকেও বাংলা ভাষা বিরোধী অবস্থান থেকে বাংলার পক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার বাহক মুসলিম লীগ থেকে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং পরবর্তিতে তাঁর উদ্যোগেই মুসলিম শব্দটি বাতিল করে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে জন্য একে উন্মুক্ত করার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে অংশ নিয়ে নির্বাচিত হন এবং পাকিস্তান আইন সভায় গণপরিষদের সদস্য হিসেবে পাকিস্তানি শাসকদের রাজনীতিতে ধর্মের দোহাই এবং বাঙালিদের সাথে ধোঁকাবাজির বিরুদ্ধচারণ করেন এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জোর দাবি জানান, যেখানে তিনি রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ইসলামিক ভিত্তি প্রদানের বিরোধী; জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার; বৈদেশিক নীতিতে শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক নয়, বরং সকল রাষ্ট্রের সাথে সম্প্রীতির সম্পর্ক রাখার পক্ষে কথা বলেন; ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্মীয় বিভাজনকে প্রাধান্য না দিয়ে বরং যৌথ ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রণয়নের পক্ষে কথা বলেন এবং অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জোর দাবি জানান। আবার ১৯৫৩ সালে কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা, ১৯৫৪ সালে আদমজী পাট কলে বাঙালি-অবাঙালিদের মধ্যে দাঙ্গার বিরোধিতা করে সকলের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য কাজ করেন। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা থেকে শুরু করে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান '৭০-এর নির্বাচনে, এমনকি ১৯৭১ সালের প্রাক্কালে প্রদত্ত সকল ভাষণ এবং বিবৃতিতে তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন, এক্ষেত্রে ৭ মার্চের ভাষণ এক অনন্য দলিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি অসাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রীয় স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আমৃত্যু এই বঙ্গভূখণ্ডে যাতে সাম্প্রদায়িকতা দানা বাঁধতে না পারে সে লক্ষ্যে ভাষণ এবং বিবৃতির মাধ্যমে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছিলেন। সার্বিক বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু এমন একজন আদর্শিক নেতা যিনি তাঁর আজন্ম লালিত অসাম্প্রদায়িক চেতনার দ্বারা সকল বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করে হাজার বছরের নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ করে দিয়ে বিশ্ব দরবারে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন, যা আজ সকলের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস।

তথ্যসূত্র

আবদুল হক (২০১৭), *বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি স., ঢাকা।

আহমদ রফিক (২০১২), *ভাষা আন্দোলন ও নেতাকর্মীদের ভূমিকা*, প্রথম স., গণপ্রকাশনী, ঢাকা।

জয়া চ্যাটার্জি (২০১৪), *বাঙলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭*, তৃতীয় স., দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

প্রশান্ত ত্রিপুরা (২০১৫), *বহুজাতির বাংলাদেশ: স্বরূপ অন্বেষণ ও অস্বীকৃতির ইতিহাস*, প্রথম স., সংবেদ, ঢাকা।

বদরুদ্দিন উমর (২০১৫), *সাম্প্রদায়িকতা*, মাওলা ব্রাদার্স, নবম স., ঢাকা।

মহিউদ্দিন আহমেদ খান (সম্পা.) (২০১৮). *বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ১০০ ভাষণ*, প্রথম স., মুক্তদেশ, ঢাকা।

মুনতাসির মামুন (২০২০), *অহিংস অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মা ও বঙ্গবন্ধু*, দৈনিক যুগান্তর, ১৭ মার্চ ২০২০ Available at:https://www.jugantor.com/todays-paper/b100/289997 অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলন-মহাত্মা-ও-বঙ্গবন্ধু (Accessed: 9 December 2020)।

মুহাম্মদ আবদুল হাই (সম্পা.) (২০১৯), *বাঙালির ধর্মচিন্তা*, তৃতীয় স., সূচীপত্র, ঢাকা।

মুহাম্মদ আব্দুল হাই (১৯৬৯), *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা*, প্রথম স., ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১৫), *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পঞ্চম স., দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

শেখ হাসিনা (২০১৯), *শেখ মুজিব আমার পিতা*, নবম স., আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হারুন অর রশিদ (২০০১), *বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, প্রথম স., নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

হারুন অর রশিদ (২০১৮), *৭ই মার্চের ভাষণ—কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ: বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*, প্রথম স., বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

B.-E. Borgstrom (1982), *Power Structure and Political Speech, Man*, 17(2), pp. 313–327. doi: https://doi.org/10.2307/2801816.

J. Nehru (1989), *The Discovery of India*. Centenary. Oxford: Oxford University Press. doi: 10.2307/3018950.

OLD (2021), *Communalism, Oxford Learner's Dictionaries*. Available at: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/communalism (Accessed: 22 February 2021).

S. Das (1991), *Communal Riots in Bengal, 1905-1947*. First ed. Delhi: Oxford University Press. doi: 10.2307/2166298.

S. Das (2014), *Communalism, Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh*. Available at: http://en.banglapedia.org/index.php?title=Communalism (Accessed: 23 January 2021).

রুদ্রমঙ্গল
মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা ॥ ১৪২৭-১৪২৮ ॥ ২০২০-২০২১ ॥ ISSN 2415-4695
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধুর জবানিতে "শহীদ সাহেব": যুগলবন্দির অনন্য নজির

শামসুজ্জামান মিলকী*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক, বাঙালি জাতির পিতা। পঞ্চান্ন বছরের জীবৎকালে বাঙলা-বাঙালির মুক্তির জন্য তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর মানসজগতে সম্মিলন ঘটেছে দেশপ্রেম-মানবতাবাদ-অসাম্প্রদায়িক চেতনার। 'নেতা' হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় নয়, তিনি রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন শোষণ-মুক্তিসংগ্রামের একজন কর্মী হিসেবে, ভারতবর্ষ তথা জন্মভূমির স্বাধীনতা অর্জনের দৃপ্ত শপথ নিয়ে। ঠিক ঐ সময়ে কিশোর মুজিব যার ব্যক্তিত্ব-মেধা-প্রজ্ঞার বিচ্ছুরণে নিজেকে শাণিত-আলোকিত করেছিলেন তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধুর জবানিতে 'শহীদ সাহেব'। কলকাতার ছাত্রজীবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ট সাহচর্য পেয়েছিলেন—এই সম্পর্ককে রাজনৈতিক 'গুরু-শিষ্য' বলে অভিহিত করা যায়। ১৯৪৭-র দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে 'পাকিস্তান' ও 'ভারত' নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পূর্ব-বাঙলা স্বাধীন হয়েও পাকিস্তানের অধীনে 'পূর্বপাকিস্তান' নামে পরাধীনই থেকে যায়। উদার-গণতন্ত্রপন্থী শহীদ সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আমৃত্যু অসাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের লেখার-সূত্রে সোহরাওয়ার্দী-মুজিব যুগলবন্দির অনন্য সম্পর্ক তুলে ধরাই বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

১.

"সম্পর্ক" শব্দের আভিধানিক অর্থ আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, সম্বন্ধ, সংযোগ, সংসর্গ, সংস্রব বা যোগাযোগ—এই বহুবিধ অর্থের পারস্পরিকতার মাত্রা ভিন্ন হলেও পারস্পরিকতা যথার্থই অপরিহার্য। শাস্ত্রে অসৎ-দুর্জনের সংসর্গ পরিত্যাজ্য হয়েছে সম্পর্কের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই। মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে একে-অন্যের সঙ্গে নানা সূতোয় সম্পর্কের মালা গাঁথে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃত ব্যক্তির জাগতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় এক তরফাভাবে, কেননা মৃতের উত্তরাধিকারী-স্বজন-বন্ধু তাকে সম্পর্কে বেঁধে রাখে—স্মৃতির মণিকোঠায় কিংবা

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা

বিস্মৃতির অতলে, কখনো অজান্তে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) তাঁর জীবদ্দশায় যে অগণিত মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর ৪৬ বছর পরে এই সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, কেননা বাঙালি "জাতির পিতা" হিসেবে তিনি কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে যুক্ত রয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক মানসগঠনে যাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশি তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)। "গণতন্ত্রের মানসপুত্র" খ্যাত এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে বহু উত্থান-পতন রয়েছে, সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে তিনি মানবতারই জয়গান গেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই অগ্রজ রাজনীতিবিদকে যেভাবে দেখেছেন তারই মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (২০১২) ও *কারাগারের রোজনামচা* (২০১৭) গ্রন্থে। মূলত প্রবন্ধ-শিরোনামে জবানি বলতে এই দুটি গ্রন্থকেই বোঝানো হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রন্থ দুটোতেই বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিনাম হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামই সবচেয়ে বেশিবার লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তে শহীদ সাহেবের নাম চারশত বারেরও অধিক উল্লেখ করেছেন, সর্বনামে এই সংখ্যা অগণিত সংখ্যক। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে শেখ মুজিব যে শহীদ সাহেবের কথা বলেছেন (ঘটনাক্রম ১৯৫৫ পর্যন্ত বিবৃত), সে শহীদ সাহেবের সঙ্গ তিনি পেয়েছেন, অন্যদিকে *কারাগারের রোজনামচায়* বঙ্গবন্ধু যে শহীদ সাহেবের কথা উল্লেখ করেছেন সেই শহীদ সাহেব তখন তাঁর মনোজগতে ক্রিয়াশীল আদর্শিক এক ব্যক্তিত্ব। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে (১৯৬৪) তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (১৯১১-১৯৬৯) সম্পাদিত *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার "সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা" প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় বহু রাজনীতিবিদ-কবি-সাহিত্যিক-বিদ্বজন সোহরাওয়ার্দী স্মরণে লিখেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানও তাঁর রাজনীতির গুরুকে নিয়ে লিখেছিলেন *নেতাকে যেমন দেখিয়াছি* প্রবন্ধ। পরবর্তীকালে ইত্তেফাক পরিবার সোহরাওয়ার্দী বিশেষ সংখ্যাকে সৈয়দ তোশারফ আলীর সম্পাদনায় *গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী* (১৯৯৮) শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। প্রসঙ্গত, সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখিত এই প্রবন্ধ আকর প্রবন্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় সোহরাওয়ার্দী-মুজিবের সামগ্রিক সম্পর্ক মূল্যায়ন নয়, শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত বয়ান ও স্মৃতিচারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই যুগলবন্দির "গুরু-শিষ্য" সম্পর্ক মূল্যায়নের প্রয়াস থাকবে।

২.১

অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে শহীদ সাহেবকে বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবনের রাজনৈতিক গুরু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পারিবারিক পরিচিতি সুবিদিত। তাঁর পিতা স্যার জাহেদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি ভাষা-সাহিত্যে এম. এ. (১৯১৩) পাস করেন । পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইংরেজিতে এম. এ. ডিগ্রি নেন। লন্ডনের গ্রেস ইন থেকে ব্যারিস্টারি (১৯১৮) পাস

করে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতিতে আগমন খেলাফত আন্দোলনে (১৯২০) অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এরপর খিদিরপুর শিল্প এলাকা থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখতে বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) চুক্তি স্বাক্ষরে ভূমিকা রাখেন। ১৯৩৬ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম লীগ গঠিত হলে তিনি জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হন এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সেক্রেটারি হন। ১৯৩৭-এ মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির বঙ্গীয় কোয়ালিশন সরকারের বাণিজ্য ও শ্রম দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র প্রথম পৃষ্ঠাতেই রাজনৈতিক জীবনের গুরুর কথা স্মরণ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর "শহীদ সাহেব" এর কথা লিখেছেন:

> ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ছোট্ট কোঠায় বসে বসে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথা। কেমন করে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হল। কেমন করে তাঁর সান্নিধ্য আমি পেয়েছিলাম। কিভাবে তিনি আমাকে কাজ করতে শিখিয়েছিলেন এবং কেমন করে তাঁর স্নেহ আমি পেয়েছিলাম। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ১)

শেখ মুজিবের আরেকটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা যায়, যা একজন রাজনৈতিক নেতার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: "[...] রাজনৈতিক মঞ্চে সম্ভবতঃ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি—যিনি রাজপ্রাসাদ হইতে গরীবের কুটির পর্যন্ত সর্বত্র নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিতেন।" (শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৪: ব্যাক-ফ্ল্যাপ) "গুরু" সম্পর্কে এই মূল্যায়নকে নিজের জীবনে শেখ মুজিবই সবচেয়ে বেশি চর্চা করে গেছেন এবং নিজেকে সর্বস্তরের মানুষের আস্থার কেন্দ্রে স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় ১৯৩৮ সালে, তিনি তখন কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী। সময়ের হিসেব মতো শেখ মুজিবের বয়স তখন ১৮ বছর, কৈশোরে চোখের সমস্যার কারণে পড়ালেখা বিঘ্নিত না হলে তখন কলেজে পড়ার কথা মুজিবের। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে এসেছিলেন, তরুণ মুজিব ছিলেন সেই কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির সেচ্ছাসেবক বাহিনির প্রধান। মিশন স্কুলের হোস্টেলের ছাদের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দীর নজর কাড়েন মুজিব। কিশোর মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে সেই ঘটনা সুবিদিত। প্রথম সাক্ষাৎ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর উচ্ছ্বাসের আঁচ পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। ১৯৩৮ থেকে ১৯৬২ এই চব্বিশ বছরে সোহরাওয়ার্দী-মুজিব সম্পর্ক ছিলো অটুট, স্নেহ-ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর খবরে সংবাদমাধ্যম থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি আনুষ্ঠানিক শোকবার্তা দেয়ার মতো মানসিক অবস্থায় ছিলেন না, শুধু বলেছিলেন:

> শুধু আমার রাজনৈতিক জীবন নহে, আমার সকল কিছু জুড়িয়া বিরাজমান ছিলেন আমার নেতা সোহরাওয়ার্দী। আজ তিনি নাই। এই না-থাকা আমার নিকট কতটুকু তাহা বুঝাইবার শক্তিও আমার নাই। (আলী ১৯৯৮: ৪২২)

বঙ্গবন্ধুর লেখনিতে গোপালগঞ্জে শহীদ সাহেবের সাহচর্যের সেই ঘটনাটা এখানে প্রণিধানযোগ্য:

> শহীদ সাহেব গেলেন মিশন স্কুল দেখতে। আমি মিশন স্কুলের ছাত্র। তাই তাঁকে সম্বর্ধনা দিলাম। তিনি স্কুল পরিদর্শন করে হাঁটতে হাঁটতে লঞ্চের দিকে চললেন, আমিও সাথে সাথে চললাম। তিনি ভাঙা ভাঙা বাংলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর আমি উত্তর দিচ্ছিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নাম আর বাড়ি কোথায়। [...] তিনি আমাকে ডেকে নিলেন খুব কাছে, আদর করলেন এবং বললেন, 'তোমাদের এখানে মুসলিম লীগ করা হয় নাই?' বললাম, 'কোনো প্রতিষ্ঠান করা হয় নাই, মুসলিম ছাত্রলীগও নাই।' তিনি আর কিছুই বললেন না, শুধু নোটবুক বের করে তিনি আমার নাম ও ঠিকানা লিখে নিলেন। কিছুদিন পরে আমি একটা চিঠি পেলাম, তাতে তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং লিখেছেন কলকাতা গেলে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ১১)

বঙ্গবন্ধু সেদিন তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবনকে দূরদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন কি-না বলতে না পারলেও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর যোগ্যতম রাজনৈতিক উত্তরসূরি-সহযোদ্ধাকে তাঁর প্রজ্ঞার আলোয় চিনতে পেরেছিলেন। এই সম্পর্কের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস প্রসঙ্গে ১৬ জুন ১৯৬৬ জেলে বসে শেখ মুজিব লিখছেন, "২৫ বছর এক নেতার নেতৃত্ব মেনে এসেছি দুইজন। অনেকেই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে বেইমানী করেছেন। আমরা দুইজন একদিনের জন্যেও তাঁর কাছ থেকে দূরে যাই নাই।" (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১৭: ৯৬) বক্তব্যে উল্লিখিত অপরজন হলেন *ইত্তেফাক* পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া।

গোপালগঞ্জে দেখা হওয়ার পর থেকে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তরুণ মুজিবের চিঠিপত্রে যোগাযোগ চলছিলো। মুজিব তখনো প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সক্রিয় হননি। ১৯৩৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করেন, গোপালগঞ্জে মুসলিমলীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফর রহমান তাঁর ছেলেকে রাজনীতিতে জড়াতে নিষেধ করেননি, শুধু পড়ালেখাটা যেন বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে বলতেন। গুরুর প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও সম্মতিতে গোপালগঞ্জে মুসলিম লীগ গঠন করা হলো। বঙ্গবন্ধু হলেন মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক—তিনি "আস্তে আস্তে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ" করলেন। এর দু'বছর পর ১৯৪১ সালে বঙ্গবন্ধু ম্যাট্রিক পাস করেন। তার আগ থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন, আংশ নিচ্ছেন ইংরেজ শোষণ থেকে মুক্তির সংগ্রামে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু আমাদের জানাচ্ছেন: "সভা করি, বক্তৃতা করি। [...] শুধু মুসলিম আর ছাত্রলীগ। পাকিস্তান আনতেই হবে, নতুবা মুসলমানদের বাঁচার আর উপায় নাই।" (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ১৫) এরই মধ্যে কলকাতায় যাওয়া-আসা করে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর যোগাযোগ ও পরিচিতি আরো দৃঢ় হয়েছে, সম্পর্ক হয়েছে গভীরতর। শহীদ সাহেবের কাছে গোপালগঞ্জে মুসলিম বলতে

বঙ্গবন্ধুই পরিচিত হয়ে ওঠলেন। পরীক্ষা পাস করে শেখ মুজিব কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়েই তাঁর নির্দেশে বালুরঘাট ও নাটোরে দুটি উপনির্বাচনে সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করলেন। বঙ্গবন্ধু কলকাতায় অবস্থানকালীন ছাত্রজীবন ছিলো "গুরু-শিষ্যে"র সম্পর্ক ও পারস্পরিকতার, জানা-বোঝার "সুবর্ণ-সময়"। শহীদ সোহরাওয়ার্দী চরিত্রের সকল ভালো গুণগুলো বঙ্গবন্ধু রপ্ত করেছিলেন তখনই। অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রথমপাঠ শেখ মুজিব তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। মুসলিম লীগকে গণতান্ত্রিক সংগঠনের পরিণত করার ক্ষেত্রে সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা অপরিসীম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) চলাকালে ১৯৪৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সদস্য হন, তখন আবুল হাশিম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সোহরাওয়ার্দীর ছত্রছায়ায় মুসলিমলীগে একটি উদারপন্থী-প্রগতিবাদী গ্রুপ গড়ে ওঠে, এদের আকাঙ্ক্ষা ছিল বাংলায় কোনো জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি না-করে পাকিস্তান কায়েম করা এবং মুসলিম লীগকে সাধারণ মানুষের সংগঠনে পরিণত করা। বঙ্গবন্ধু এ-সম্পর্কে বলছেন:

> শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে আমরা বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মুসলিমলীগকে জনগণের লীগে পরিণত করতে চাই, জনগণের প্রতিষ্ঠান করতে চাই। মুসলিমলীগ তখন পর্যন্ত জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই। জমিদার, জোতদার, খান বাহাদুর ও নবাবদের প্রতিষ্ঠান ছিল। কাউকেও লীগে আসতে দিত না। জেলায় জেলায় খান বাহাদুরের লোকেরাই লীগকে পকেটে করে রেখেছিল। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ১৭)

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব—শিষ্যের জনগণ সম্পৃক্ততা যাচাইও বলা যায় এই ঘটনাকে। রাজনৈতিক নেতাকে স্মরণ করে শেখ মুজিব আমাদের জানাচ্ছেন:

> ১৯৫৪ সালে আমার পল্লীভবন হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে জনাব সোহরাওয়ার্দী এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। জনসভার শেষে আমরা পদব্রজে আমাদের বাড়ি যাই। তখন পথিমধ্যে আমাদিগকে একটি খাল অতিক্রম করিতে হয়। তখন উহা শুষ্ক ছিল। শহীদ সাহেব আমাকে খালটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, খালটিতে পানি না থাকায় মানুষকে অনেক দুর্ভোগ পোহাইতে হয়।
>
> ১৯৫৭ সালে আমি যখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য, তখন একদিন হঠাৎ শহীদ সাহেব আমাকে বলিলেন, মুজিব ১৯৫৪ সালে তোমার বাড়ির কাছে আমি যে শুকনা খালটি দেখিয়াছি, তাহার তুমি কতদূর ঠিক করিয়াছ? তুমি এখন ক্ষমতাসীন। মানুষকি এখনো পানির অভাবে কষ্ট পাইতেছে?
>
> আমি সানন্দে তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি সেই খালটি পুনঃখননের ব্যবস্থা করাইয়াছি। ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। ইহা হইতে বোঝা যায়, তাঁহার স্মরণশক্তি কত প্রখর ছিলো এবং মানুষের কথা তিনি কত ভাবিতেন। (শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৪: ৩১২-৩১৩)

২.২

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকটে বঙ্গবন্ধু ইতিবাচক রাজনীতির শিক্ষা নিয়েছেন। সোহরাওয়ার্দীর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বঙ্গবন্ধুকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিলো।

দেশবিভাগ (১৯৪৭)-কে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসনে সোহরাওয়ার্দীর সহযাত্রী ছিলেন ছাত্রনেতা শেখ মুজিব। শহীদ সোহরাওয়ার্দী রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে, মওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৭৮-১৯৩১) ও মওলানা শওকত আলীর (১৮৭৩-১৯৩৮) খিলাফত আন্দোলন সংশ্লিষ্ট হয়ে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্টতা তাঁকে মানবতাবাদী করে তোলে। যদিও আগে থেকেই শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে শ্রমিক সমাজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করতেন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প থেকে মুসলমানদের রক্ষার মূল দায়িত্ব শহীদ সোহরাওয়ার্দীরই ছিলো। ইসলামিয়া কলেজ পড়ুয়া শেখ মুজিব তখন গুরুর সঙ্গে এ-কাজে যুক্ত হন।

> আমার আর সিলেটের মোয়াজ্জেম চৌধুরীর (এখন কনভেনশন মুসলিম লীগের এমএনএ) উপর ভার পড়েছে রাতে পার্ক সার্কাস ও বালিগঞ্জের মাঝে একটা মুসলমান বস্তি আছে— প্রত্যেক রাতেই হিন্দুরা সেখানে আক্রমণ করে— তাদের পাহারা দেওয়ার জন্য। [...] আমরা রওনা করে তাড়াতাড়ি ছুটতে লাগলাম, কোন গাড়ি নাই। আমাদের পায়ে হেঁটেই পৌছাতে হবে। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৬৭)

বঙ্গবন্ধু একইসঙ্গে আমাদের জানাচ্ছেন:

> একটা কথা সত্য, অনেক হিন্দু মুসলমানদের রক্ষা করতে যেয়ে বিপদে পড়েছে। জীবনও হারিয়েছে। আবার অনেক মুসলমান হিন্দু পাড়াপড়শীকে রক্ষা করতে যেয়ে জীবন দিয়েছে। আমি নিজেই এর প্রমাণ পেয়েছি। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৬৭)

বিহারের দাঙ্গা-প্রতিরোধকল্পে শেখ মুজিব প্রায় দেড়মাস সেখানে অবস্থান করে অসুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হন। আসানসোল, বর্ধমান, রাণীগঞ্জ, ময়রা, মাধাইগঞ্জের "মোহাজির" ক্যাম্পগুলোতে রাতদিন কাজ করতে করতে স্বেচ্ছাসেবক শেখ মুজিব জ্বরে আক্রান্ত হন। ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা, মোহাজিরদের সুবিধা-অসুবিধা বুঝে কাজ করতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন ছাত্রনেতা শেখ মুজিব। কলকাতায় অসুস্থ হয়ে ফিরে আসলে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিলো তাঁকে। এ-প্রসঙ্গেও সোহরাওয়ার্দীর অপত্য মমত্ব তিনি পেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু এ-বিষয়ে লিখছেন:

> দেড় মাস পরে আমি কলকাতায় হাজির হলাম অসুস্থ শরীর নিয়ে। বেকার হোস্টেলে এগেন আমি আরও অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার জ্বর মোটেও ছাড়ছিলো না। শহীদ সাহেব খবর পেয়ে এত কাজের ভিতরেও আমার এত সামান্য কর্মীর কথা ভুলেন নাই। ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে আমার জন্য সিট ঠিক করে খবর পাঠিয়ে দিলেন। পনের দিন হাসপাতালে ছিলাম [...] (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৭১)

এই হলো শিষ্যের প্রতি গুরুর প্রকৃত ভালোবাসা, নেতার দায়িত্ববোধ। এমন মানুষের স্নেহধন্য শেখ মুজিব পরবর্তীকালে জাতির কর্ণধার হবেন এটাই তো স্বাভাবিক। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পটভূমিকায় শেখ মুজিব চিনেছিলেন অনন্য এক সোহরাওয়ার্দীকে। অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী হয়েও ষড়যন্ত্রের কূটচালে

সোহরাওয়ার্দী মসুলিমলীগের নেতা নির্বাচিত হতে পারেননি। অথচ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা ও অর্থের অবৈধ পথ বেছে নিলেই তিনি জয়লাভ করতে পারতেন। কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দী কখনোই 'ব্যাকডোর পলিটিক্স' করতেন না এবং যারা করতো তাদের সংস্রব এড়িয়ে চলতেন। নির্বাচনকালীন একটা ঘটনার বরাত দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাদের জানাচ্ছেন:

> যেদিন নির্বাচন হবে তার পূর্বের দিন রাত দুইটার সময়—আমি তখন শহীদ সাহেবের বাড়িতে, শহীদ সাহেব বারান্দায় শুয়ে আছেন। ডা. মালেক এসে বললেন, 'আমাদের অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না, কিছু টাকা খরচ করলে বোধহয় অবস্থা পরিবর্তন করা যেত।' শহীদ সাহেব মালেক সাহেবকে বললেন, 'মালেক, পাকিস্তান হয়েছে, এর পাক ভূমিকে নাপাক করতে চাই না। টাকা আমি কাউকেও দেব না, এই অসাধু পন্থা অবলম্বন করে আমি নেতা হতে চাই না। আমার কাজ আমি করেছি।' [...] সেদিন থেকে শহীদ সাহেবকে আমি আরো ভালোবাসতে শুরু করলাম। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৭৭)

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট থেকে পাওয়া এই শিক্ষা বঙ্গবন্ধুর চরিত্রেও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ছিলো। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি, ক্ষমতার লোভে দেশের মানুষকে জিম্মি করেননি। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমি বাংলার মানুষের মুক্তি চাই' সোহরাওয়ার্দীর কাছে পাওয়া শিক্ষারই বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। নেতার যৌক্তিক কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন থাকার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু সচেতন ছিলেন, এ-কারণে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে যারা অকারণে বা ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে অপছন্দ করতেন শেখ মুজিব তাদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশতেন না। তিনি দৃঢ়ভাবে বলতেন, "আমি গোপন রাজনীতি পছন্দ করি না আর বিশ্বাসও করি না।" আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) সোহরাওয়ার্দীর সমর্থনে প্রাদেশিক মুসলিমলীগের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন, তিনি যখন বিভাগোত্তর বাংলার নেতা হিসেবে শহীদ সাহেবকে নির্বাচনে অন্তরালে থেকে বিরোধিতা করেন, তখন থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। ১৯৪৭ সালে আবুল হাশিম বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন এর ১৫ বছর পরে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে শেখ মুজিব লিখেছিলেন, "শহীদ সাহেবের সাথে তাঁর ব্যবহার সমর্থন করি না। একে আমি বিশ্বাসঘাতকতা বলতাম।" (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৭৯) আবুল হাশিম ১৯৬২ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদান করে রাজনীতিতে আদর্শবিচ্যুত হয়েছিলেন। দেশবিভাগ কায়েম হয়ে গেলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শেষ হচ্ছিলো না। ধর্মীয় পরিচয়ে সোহরাওয়ার্দীর পাকিস্তানের যেকোনো অংশে চলে যাওয়ারই কথা, কিন্তু তিনি ভারতবাসী মুসলমানদের রক্ষার নিমিত্তে কলকাতায় রয়ে গেলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এ-প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু আমাদের জানিয়েছেন সোহরাওয়ার্দীর অগ্রণী ভূমিকার কথা। দীর্ঘ সাত বছর কলকাতাবাসের পর প্রিয় নেতা সোহরাওয়ার্দীকে ছেড়ে পূর্ব-বাংলায় চলে আসার দিনের এক আবেগময় বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। "গুরু-শিষ্য" যুগলবন্দির আসন্ন প্রত্যক্ষ বিচ্ছেদের কালে সেদিন

শেখ মুজিবের অন্তরে যে আলোকশিখা প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠেছিলো তা তাঁর জীবনের দিশারি হয়ে দেদীপ্যমান ছিলো আমৃত্যু-আজীবন:

> শহীদ সাহেবের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তাঁকে রেখে চলে আসতে আমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার মন বলছিল, কতদিন মহাত্মাজী শহীদ সাহেবকে রক্ষা করতে পারবেন? কয়েকবার তাঁর উপর আক্রমণ হয়েছে। [...] তিনি কোনোমতে রক্ষা পেয়েছিলেন। শহীদ সাহেবকে বললাম, 'চলুন স্যার পাকিস্তানে, এখানে থেকে কী করবেন?' বললেন, 'যেতে তো হবেই, তবে এখন এই হতভাগা মুসলমানদের জন্য কিছু একটা না করে যাই কি করে? দেখ না সমস্ত ভারতবর্ষে কি অবস্থা, চারিদিকে শুধু দাঙ্গা আর দাঙ্গা। সমস্ত নেতা চলে গেছে, আমি চলে গেলে এদের আর উপায় নাই।' (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৮২)

শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেদিন তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী শেখ মুজিবকে বলেছিলেন পূর্ব-বাংলার মানুষকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ধারণ করে দেশগঠনে মনোনিবেশ করতে, কারণ সোহরাওয়ার্দী হয়তো তাঁর মানসচক্ষে দেখেছিলেন তাঁর এই যোগ্যশিষ্য-সহকর্মী একদিন বাংলার মুক্তি আন্দোলনের পথ দেখাবে। সোহরাওয়ার্দীর সেদিনের কথা স্মরণ করে বঙ্গবন্ধু লেখেন:

> দেশে গিয়ে, সাম্প্রদায়িক গোলমাল যাতে না হয় তার চেষ্টা কর। [...] চেষ্টা কর যাতে হিন্দুরা চলে না আসে। ওরা এদিকে এলেই গোলমাল করবে, তাতে মুসলমানরা বাধ্য হয়ে পূর্ব-বাংলায় ছুটবে। যদি পশ্চিমবাংলা, বিহার ও আসামের মুসলমান একবার পূর্ব-বাংলার দিকে রওয়ানা হয়, তবে পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ববাংলা রক্ষা করা কষ্টকর হবে। [...] পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্যই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে দিও না। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৮২)

২.৩

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নয়, মওলানা ভাসানীও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাঁকে প্রাধান্য দিতেন। যদিও মওলানা ভাসানীর কিছু কর্মকাণ্ড শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্য বিব্রতকর ও অপমানজনকও ছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর এই মনোভাব বিষয়ে *কারাগারের রোজনামচা*-তে লিখেছেন। লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, "যো আওয়ামী লীগ করেগা, উসকো শের হাম কুচাল দে গা", যদিও তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে নিজেকে পরিচয় দিতেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর লিয়াকত আলী খানের উদ্ধত্য মাত্রাহীন হয়ে গিয়েছিলো। আওয়ামীলীগ প্রসঙ্গে তাঁর বক্রোক্তি এবং সরকারি বাহিনি ও ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অত্যাচারের মাত্রাও বেড়ে গিয়েছিলো। মওলানা ভাসানী তখন শেখ মুজিবকে বলেছিলেন:

> তুমি লাহোর যাও, কারণ সোহরাওয়ার্দী সাহেব লাহোরে আছেন। তাঁর ও মিয়া ইফতিখারউদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ কর। তাঁদের বল পূর্ব বাংলার অবস্থা। একটা নিখিল পাকিস্তান পার্টি হওয়া দরকার। পীর মানকী শরীফের সাথে আলোচনা করে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে সারা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারলে ভাল হয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছাড়া আর কেউ এর নেতৃত্ব দিতে পারবেন না। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ১৩৫)

শেখ মুজিবের প্রতি মওলানা ভাসানীর এমন নির্দেশনা সোহরাওয়ার্দী চরিত্রের এক বিশেষ দিককে উন্মোচিত করে। বিভাগোত্তরকালে দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা পদে পদে প্রমাণিত হয়। পূর্ব-বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের নব্য উপনিবেশে রূপান্তরিত হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ও নীতি-নির্ধারক হলেও ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের বাইরে শরৎ বসুর সঙ্গে মিলিতভাবে সার্বভৌম বাংলা গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। (চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৩: ১১৫) বঙ্গবন্ধুর সে বার লাহোরে অবস্থান ও পূর্ব-বাংলায় ফেরার বিমান টিকিট, পথখরচা—সবকিছু শহীদ সাহেব নিজে দিয়েছিলেন। অথচ তখন তাঁর অর্থকষ্ট চলছে, মামলা না পেলে তিনি অসহায় অবস্থায় ছিলেন। বঙ্গবন্ধু লাহোর থেকে ফেরার দিনে তাঁর স্বগতোক্তিতে যা বলেছেন তা এখানে অবশ্য-উল্লেখ্য:

> সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে ছেড়ে আসতে আমার খুব কষ্টই হচ্ছিল, কারণ জীবনের বহুদিন তাঁর সাথে সাথে ঘুরেছি। [...] যাঁর একটা ইঙ্গিতে হাজার হাজার লোক জীবন দিতে দ্বিধাবোধ করত না, আজ তাঁর কিছুই নাই। মামলা না করলে তাঁর খাওয়ার পয়সা জুটছে না, কত অসহায় তিনি। [...] তবে একটা ভরসা নিয়ে চলেছি, নেতার নেতৃত্ব আবার পাব। পূর্ব বাংলায় আমরা রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করতে পারব এবং মুসলিম লীগের স্থান পূর্ব বাংলায় থাকবে না, যদি একবার তিনি আমাদের সাহায্য করেন। তাঁর সাংগঠনিক শক্তি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব জাতি আবার পাবে। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ১৪৩-১৪৪)

এখানে একটি বিষয়ে অবতারণা দরকার বলে মনে হয়। পূর্বপাকিস্তান তথা পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে সোহরাওয়ার্দীর অবস্থান বিতর্কিত বলে মনে করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর আত্মজীবনীতে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে এক রাজনৈতিক একান্ত আলোচনার সূত্রে এ-সম্পর্কে লিখেছেন। বঙ্গবন্ধুর সেই বক্তব্য অনুসারে সোহরাওয়ার্দী বাংলা ভাষা বিরোধী কি-না তা চিনে নেয়ার একটা চমৎকার সূত্র পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু লিখছেন:

> আর একটা অনুরোধ করলাম, তাঁকে লিখে দিতে হবে যে, উর্দু ও বাংলা দুইটাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে তিনি সমর্থন করেন। কারণ অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। মুসলিম লীগ ও তথাকথিত প্রগতিবাদীরা প্রপাগান্ডা করছেন তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই লিখে দিব, এটা তো আমার নীতি ও বিশ্বাস।' তিনি লিখে দিলেন। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২১৬)

বঙ্গবন্ধুর জবানিতে পাওয়া সোহরাওয়ার্দীর এই বক্তব্যে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে তাঁর মনোভাবের স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব টুঙ্গিপাড়া থেকে এমএলএ নির্বাচিত হন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মন্ত্রীত্ব তিনি স্বাভাবিকভাবেই পাবেন মনে করা যায়। কিন্তু তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেদিন শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিমাপ করতে এ-বিষয়ে গোপনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেদিনের জবাব পেয়ে সোহরাওয়ার্দীর বুক ভরে উঠারই কথা। বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী হওয়ার চেয়ে দলগঠনের বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন–এটাই ছিলো শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে পাওয়া বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ। শেষপর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকারে বঙ্গবন্ধুকে পরিস্থিতিগত কারণে মন্ত্রী হতে হয়েছিলো। গুরু-শিষ্যের একান্ত আলাপচারিতা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব লিখছেন:

> আমি যখন আমার বাড়ি টুঙ্গিপাড়া থেকে নির্বাচনের পরে ফিরে আসি, শহীদ সাহেব আমাকে একাকী ডেকে বললেন, 'তুমি মন্ত্রীত্ব নেবা কি না?' আমি বললাম, 'আমি মন্ত্রীত্ব চাই না। পার্টির অনেক কাজ আছে, বহু প্রার্থী আছে দেখে শুনে তাদের করে দেন।' শহীদ সাহেব আর কিছুই আমাকে বলেন নাই। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২৫৯)

সোহরাওয়ার্দীর প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর ভালো চাইতেন সবসময়, যেন তাঁর সম্মান রক্ষিত হয়। কিন্তু তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারে আইনমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করলে জেলে অন্তরীণ শেখ মুজিব প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়েছিলেন। যুক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী কেন পূর্ব-বাংলার আইনমন্ত্রী হবেন? তার দিনকয়েক আগে সোহরাওয়ার্দী চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেছেন। জেলের অনেকেই শেখ মুজিবকে বলেছিলেন শহীদ সাহেবকে টেলিগ্রাম করতে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু টেলিগ্রাম করেননি শুধু তাঁর এই অসম্মাননীয় পদ গ্রহণের জন্য। পিতার প্রতি সন্তানের অপ্রকাশিত ক্ষোভ যেমন সন্তানকে দুঃখে জর্জরিত করে, জেলে বসে বঙ্গবন্ধুও সেদিন এক পিতাসম ব্যক্তিত্বের ভুল সিদ্ধান্তে নিজে নিজেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু জানাচ্ছেন তাঁর আত্মঅভিমানের কথা:

> আমি নিজে কিছুতেই তাঁর আইনমন্ত্রী হওয়া সমর্থন করতে পারলাম না। এমনকি মনে মনে ক্ষেপে গিয়াছিলাম। অনেকে আমাকে অনুরোধ করেছিল, শহীদ সাহেব রোগমুক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন দেশে, তাঁকে টেলিগ্রাম করতে। আমি বলে দিলাম, 'না, কোন টেলিগ্রাম করব না, আমার প্রয়োজন নাই।' (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২৮৩)

৩.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে স্মরণ করেছেন গভীর শ্রদ্ধায়। এমনকি সোহরাওয়ার্দী-বিরোধী হিসেবে তিনি মওলানা ভাসানীর প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। এটি মওলানা ভাসানীর প্রতি তাঁর অবজ্ঞা বা আক্রোশ নয়, বরং নেতার প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধারই অঞ্জলি। "সোহরাওয়ার্দী নিধন যজ্ঞ" হিসেবে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু মওলানা ভাসানীর তরফ থেকে ইস্কান্দার মীর্জার সঙ্গে গোপন যোগাযোগের তথ্য দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আইয়ুব খানের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর গোপন কিছু যোগসূত্রেরও উল্লেখ করেছেন। সোহরাওয়ার্দীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকেই বঙ্গবন্ধু সত্যের পূজারী হয়েছিলেন। রাজনীতির মিথ্যা-বিষোদগার আর প্ররোচনায় কখনো সংযুক্ত হতেন না। কারাগারে বসে তিনি লিখছেন:

> মওলানা সাহেবের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা খুব বেশি। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জনপ্রিয়তা তিনি সহ্য করতে পারেন নাই এবং তার মধ্যে এত ঈষা দেখা দেয় যে, গোপনে ইস্কান্দার মীর্জার সাথে হাত মেলাতেও তাঁর বিবেকে বাঁধে নাই। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ১৭১)

বঙ্গবন্ধুকে যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টের গোপন আস্তানায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনি গাড়িতে যাবার সময় মনে মনে সালাম জানিয়ে স্বগতোক্তি করেন: "চিরনিদ্রায় শুয়ে আছ, একবারও কি মনে পড়ে না হতভাগা দেশবাসীর কথা" (কারাগারের রোজনামচা ২০১৭: ২৫৫), শেখ মুজিবের এই

আত্মজিজ্ঞাসায় হয়তো তাঁরই অন্তরাত্মায় ভেসে ওঠেছে সোহরাওয়ার্দীর কথা। কেননা বঙ্গবন্ধু শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মহাপ্রয়াণে সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছিলেন। ১৯৬৯-র ৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় পূর্ব-বাংলাকে "বাংলাদেশ" নামকরণ করেন। সেদিন বঙ্গবন্ধু বলেন:

> একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে বাংলা কথাটির সবশেষ চিহ্নটুকু চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ...একমাত্র বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের মধ্যে বাংলা কথাটির অস্তিত্ব খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। ...জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি আজ হইতে পাকিস্তানের পূবাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশ। (কারগারের রোজনামচা ২০১৭: ২৭৪)

সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রথম মৃত্যুবাষিকীতে *ইত্তেফাকের* বিশেষ সংখ্যায় বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতাকে জানিয়েছেন অমলিন শ্রদ্ধা। "নেতাকে যেমন দেখেছি" শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধু বারোটি উপশিরোনামে সোহরাওয়ার্দীর চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক অবদানের কথা স্মরণ করেছেন। ভূমিকাংশেই শেখ মুজিব যা লিখলেন, তা মহানুভব নেতার প্রতি তাঁর গভীরতর পর্যবেক্ষণের সারাৎসার:

> জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে এত বেশি বিরল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল যে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে কয়েক খণ্ড পুস্তক রচনার প্রয়োজন। সুদীঘ প্রায় এক চতুথাংশ শতাব্দীকাল তাঁহার সংস্পর্শে থাকার ফলে আমার মনের কোণে তাঁহার যে ছবিটি অঙ্কিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা কোন সাধারণ মানুষের নহে, একজন প্রায় অতিমানবের। (শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৯৮: ৩০৩)

জনগণের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক এই প্রকৃত জননেতাকে দেশবিভাগের পর মোহাম্মদ আলী জিন্না পাঁচটি লোভনীয় প্রস্তাব দেন, যার কোনোটাই তিনি গ্রহণ করেননি। ঐ সময় ভারতে বিপন্ন মুসলমানদের রক্ষা তথা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতে থেকে যান। দলের নেতাকর্মীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান থেকে শুরু করে দল পরিচালনার অর্থ সংগ্রহের ভার পুরোটাই তাঁর উপরে ছিলো। একইসঙ্গে তিনি গোপনীয়ভাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অসহায় মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। এজন্য তাঁর একটি "কালো খাতা" (তালিকাভুক্তদের নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য) ছিলো, বঙ্গবন্ধু একদিন এই কালো খাতাটি দেখে ফেলেন। এ-প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

> আমি ঘটনাক্রমে একদিন নেতার ৪০, থিয়েটার রোডস্থ বাসভবনে একটি কালো খাতা দেখিয়া ফেলিলাম। ঐ খাতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি পেনশনভোগী লোকের তালিকা ছিলো। তাহাদের তিনি সবমোট ৩০০০ টাকা পেনশন দিতেন। তালিকাভুক্ত এই লোকদের মধ্যে ছিলো জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পুরাতন চাকর-বাকর, নাপিত, শ্রমিক কর্মী, কিছু সংখ্যক প্রবীণ লেখক ও রাজনৈতিক কর্মী। (শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৯৮: ৩০৭)

অথচ দেশবিভাগের পর গান্ধীজি মারা গেলে ভারত সরকার তাঁর নামে বেআইনিভাবে অতিরিক্ত কর ধার্য করে, তিনি সমস্ত কর পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায়

পাকিস্তানে চলে যেতে বাধ্য হন। কোর্টে মামলা না পেলে তাঁর দিনানিপাত কষ্টকর হতো। আত্মজীবনীতেও বঙ্গবন্ধু তাঁকে লাহোরে দুপুরে খাবারের পরিবর্তে চা আর পাউরুটি-বিস্কুট খেতে দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। একজন মহত্তম মানুষের এই পরিস্থিতি পৃথিবীতে বিরল নয়, বঙ্গবন্ধুও ব্যক্তিগত জীবনে বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্থ হননি কখনো। এই শিক্ষা তাঁর পরিবার ও গুরুর থেকে শেখা বলা যায়।

৪.

নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা ও শ্রদ্ধাশীল থাকা বঙ্গবন্ধু চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমানের একটি কথাকে তিনি মনে রেখেছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেরে বাংলার দলীয় মতাদর্শে পার্থক্য দেখা দিলে শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর সমর্থনে ছিলেন। তখন তাঁর পিতা বলেছিলেন হক সাহেব মানী লোক, রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে মুজিব যেন কখনোই হক সাহেবকে অসম্মান না করেন। শেখ মুজিব তা কখনোই করেননি। তবে সোহরাওয়ার্দীকে বঙ্গভূমির নেতা হিসেবে যারা মেনে নেয়নি বা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে তাদের বিষয়ে আক্ষেপ করে বলেছেন: "বাঙালিরা শহীদ সাহেবকে প্রথমে চিনতে পারে নাই। যখন চিনতে পারল তখন আর সময় ছিল না।" (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৪৮)। খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৩৭-র নির্বাচনে পটুয়াখালী থেকে পরাজিত হন, এতে তার রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটার কথা, কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় তাঁর বিকল্প আসনে পুনর্নির্বাচনের মাধ্যমে নাজিমুদ্দীনকে এমএলএ নির্বাচিত করলেন। পরবর্তীকালে খাজা নাজিমুদ্দীন ও তার অনুসারীরা সোহরাওয়ার্দীর প্রাপ্য সম্মানটুকুও দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। শেখ মুজিব তাঁর নেতা সম্পর্কে বলেছেন:

> শহীদ সাহেব ছিলেন উদার, নীচতা ছিল না, দল মত দেখতেন না, কোটারি করতে জানতেন না, গ্রুপ করারও চেষ্টা করতেন না। উপযুক্ত হলেই তাকে পছন্দ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন। কারণ তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অসীম। তাঁর সাধুতা, নীতি, কর্মশক্তি ও দক্ষতা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে চাইতেন। এজন্য তাকে বারবার অপমানিত ও পরাজয়বরণ করতে হয়েছে। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৪৭)

বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন, তবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কখনো দ্বিমত হলে তা প্রকাশ করতেন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন। ১৯৪৪ সালে মুসলিম ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আনোয়ার হোসেন ও নূরুদ্দিন আহমেদের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। ছাত্রনেতা শেখ মুজিব নূরুদ্দিনের সমর্থনে ছিলেন কারণ আনোয়ার হোসেন দলের মধ্যে "কোটারি" করতেন ও কর্মীদের উপযুক্ত পদ বা সম্মান দিতে চাইতেন না। তবে শেখ মুজিব, নূরুদ্দিন, আনোয়ার এরা সবাই শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুগত ছিলেন। এ-কারণে শহীদ সাহেব এদের ডেকে বলেছিলেন আনোয়ারকে একটা পদ দিতে। কিন্তু শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তখন গুরু-শিষ্য কথা কাটাকাটি হয়, বঙ্গবন্ধু অকপটে আমাদের জানাচ্ছেন এই দ্বৈরথ-দ্বন্দ্বের কথা:

> তিনি আনোয়ার সাহেবকে একটা পদ দিতে বলেন, আমি বললাম কখনোই হতে পারে না। সে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোটারি করেছে, ভাল কর্মীদের জায়গা দেয় না। কোনো হিসাব-নিকাশও কোনোদিন দাখিল করে না। শহীদ সাহেব আমাকে হঠাৎ বলে বসলেন, "Who are you? You are nobody." আমি বললাম "If I am nobody, then why you have invited me? You have no right to insult me. I will prove that I am somebody. Thank you sir. I will never come to you again." এ-কথা বলে চিৎকার করতে করতে বৈঠক ছেড়ে বের হয়ে এলাম। আমার সাথে নূরুদ্দিন, একরাম, নূরুল আলমও উঠে দাঁড়াল [...] আমি যখন বিখ্যাত ৪০ নম্বর থিয়েটার রোড থেকে রাগ হয়ে বেরিয়ে আসছিলাম শহীদ সাহেব হুদা ভাইকে বললেন, "ওকে ধরে আনো।" [...] আমাকে হুদা ভাই ধরে আনলেন। বন্ধুবান্ধবরা বলল, "শহীদ সাহেব ডাকছেন, বেয়াদবি কর না, ফিরে এস।" উপরে এলাম। শহীদ সাহেব বললেন, "যাও তোমরা ইলেকশন কর, দেখ নিজেদের মধ্যে গোলমাল কর না।" আমাকে আদর করে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, "তুমি বোকা, আমি তো আর কাউকেই একথা বলি নাই, তোমাকে বেশি আদর ও স্নেহ করি বলে তোমাকেই বলেছি।" আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তিনি যে আমাকে সত্যিই ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার দিন পর্যন্ত।' (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ২৯)

দেশবিভাগ হয়ে যাবার পর *মিল্লাত* পত্রিকার যে নিজস্ব প্রেস ছিলো তা বিক্রি বিক্রি করার উদ্যোগ নেন আবুল হাশিম। ইতোমধ্যে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গেও তিনি সম্পর্কের অবনমন ঘটিয়েছেন। স্বভাবতই শেখ মুজিব, নূরুদ্দিন আহমেদ, নূরুল আমিন, কাজী ইদ্রিস এরা হাশিম সাহেবকে তখন ততটা পছন্দ করেন না। এই প্রেস বিক্রি নিয়ে শেখ মুজিব হাশিম সাহেবের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। কথা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু এই ঘটনা সোহরাওয়ার্দীকে জানালে তিনি শেখ মুজিবের উপর রুষ্ট হন। যে আবুল হাশিম সোহরাওয়ার্দীকে রাজনৈতিকভাবে অপমানজনক পরিস্থিতিতে ফেলেছেন সেই আবুল হাশিমকে শেখ মুজিব অপমান করলে তাঁর খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু শহীদ সাহেবের মনোবৃত্তি প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেছেন: "তিনি আমার উপর রাগ করলেন, কেন আমি খারাপ ব্যবহার করলাম হাশিম সাহেবের সাথে! কত বড় উদার ছিলেন শহীদ সাহেব।" (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৮০) দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি, দায়িত্বের প্রতি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যে 'কমিটমেন্ট' ছিলো তা পালনে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। বিভাগোত্তরকালে ভারতের মুসলমানদের জন্য নতুন দেশে গেলেন না, অথচ ভারত তাঁকে পরে এক ধরনের অপমান করে পাকিস্তান পাঠিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চরম খাদ্যসঙ্কট তথা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন তিনি শ্রম ও গণসরবরাহ মন্ত্রী হিসেবে সাধারণ মানুষের খাবার সংস্থানের জন্য রিলিফ-লঙ্গরখানা চালু করে পরিস্থিতি কিছুটা আয়ত্তে আনেন। দিনরাত পরিশ্রম আর তদারকিতে নিয়োজিত এই মানুষটির অন্তরে ছিলো "কমিটমেন্ট"। বঙ্গবন্ধু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> শহীদ সাহেব কলকাতা ক্লাবের সদস্য ছিলেন। রাতে একবার দুই এক ঘন্টার জন্য কলকাতায় থাকলে ক্লাবে যেতেন, কিন্তু যেদিন তিনি সিভিল সাপ্লাইয়ের মন্ত্রী হন, তারপর থেকে এক মুহূর্তও সময় পান নাই কলকাতা ক্লাবে যেতে। রাত বারটা পর্যন্ত তিনি অফিস করতেন। আমি ও নূরুদ্দিন রাত বারটার পরেই শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করতে এবং রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতাম। কারণ, দিনেরবেলায় তিনি সময় পেতেন না। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৩৩)

দলীয় কর্মীদের প্রতি সোহরাওয়ার্দীর সহানুভূতিশীল ও অভিভাবকসুলভ মনোভাব সুবিদিত। দেশবিভাগ-পূর্ব ও পরবর্তীকালে কর্মীরা তাঁর কাছে যতটা সহায়তা পেয়েছে তা অন্য কারো থেকেই পায়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এ গুণের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। ১৯৫৮-তে সামরিক শাসন জারি হলে সোহরাওয়ার্দী ব্যতীত অন্য কোনো নেতা দলীয় কর্মীদের প্রয়োজনের কথা শুনতে চাইতেন না। ১৯৪৩ সালে দিল্লিতে "অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ"-এর সম্মেলনে যোগ দিতে যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। ১৯৪৬-এ পুনর্বার ভারতবর্ষের মুসলিমলীগপন্থী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কনভেশনে যোগ দিতে দিল্লি যান। কলকাতা থেকে "স্পেশাল ট্রেনে"র ব্যবস্থা করলেন সোহরাওয়ার্দী। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো অন্যভাবে। হাওড়া স্টেশনে যেসকল কর্মী-সমর্থক বিদায় জানাতে এসেছিলো তারা সবাই "স্পেশাল ট্রেন" দেখে ট্রেনে উঠে পড়ে। কিন্তু দিল্লি থেকে ফেরার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা পূর্ব থেকে নেয়া ছিলো না। বিষয়টি নিয়ে বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দীর সাথে আলোচনা করলে তিনি সমস্যার সম্মুখীন সকলের জন্য ফেরার ব্যবস্থা করলেন। এ-প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর লিখছেন:

> আমি ও আরো কয়েকজন সহকর্মী শহীদ সাহেবের শরণাপন্ন হলাম এবং ছাত্রদের অসুবিধার কথা বললাম। শহীদ সাহেব বললেন, 'কেন, একজন তো টাকা নিয়ে গেছে, এদের ভাড়া দেবার কথা বলে। তোমার সাথে আলোচনা করে টাকা দিতে বলেছি।' [...] তিনি ছাত্র নন, তার নাম আজ আর আমি বলতে চাই না। শহীদ সাহেব আবারও কিছু টাকা দিলেন। হিসাব করে প্রত্যেককে পঁচিশ টাকা করে, এতেই হয়ে যাবে। খন্দকার নূরুল আলম ও আমি সকলকে পঁচিশ টাকা করে দিয়ে রসিদ নিয়ে নিলাম, প্রত্যেকের কাছ থেকে। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৫৫)

দলীয় যেকোনো অনুষ্ঠান, সম্মেলন, এমনকি নির্বাচনেও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজের উপার্জিত টাকা খরচ করতেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেও আমরা দেখি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতে, অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সংগঠিত করতে নিজের মেধা-শ্রম-অর্থ অকুণ্ঠচিত্তে ব্যয় করতে।

৫.

সোহরাওয়ার্দী-মুজিব সম্পর্কের গভীরতা অন্বেষণই এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট। এজন্য ঐতিহাসিক ছয়দফার পরিশিষ্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর প্রতি যে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক:

> সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্বপাকিস্তানীর ভালোবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যেকোনো ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মতো নগন্য ব্যক্তির মূল্যই-বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবীর জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। (ছয়দফার পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য, কারাগারের রোজনামচা ২০১৭: ৩২০)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজের জবানিতে বলেছেন, তাঁর নেতা-গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আমৃত্যু তাঁকে স্নেহ করেছেন, রাজনৈতিক নির্দেশনা দিয়েছেন। দীর্ঘ বিশ বছরব্যাপী তাঁদের এই সম্পর্ক কোনোদিন কোনো ঘূণপোকা ফাটল ধরাতে পারেনি। স্নেহ ও শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আস্থা, আদর্শ ও নৈতিকতা, অধিকার ও সংগ্রাম, পূর্ববাংলা ও শোষণমুক্তির দাবির যৌথ সমন্বয়ে এই দুই মহৎ পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক যুগ যুগ ধরে যুগলবন্দির অনন্য নজির হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র

আজরিন আফরিন (২০২০), *বঙ্গবন্ধু ও সোহরাওয়ার্দী*, তাম্রলিপি, ঢাকা।

আবুল কালাম আজাদ (২০১৯), *ভারত স্বাধীন হল*, দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা।

আবদুল খালেক (২০১৭), *সোহরাওয়ার্দী-মুজিব সম্পর্ক* (১৯৩৮-১৯৪৯), *দৈনিক সোনার দেশ*, রাজশাহী।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (২০২০), *হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গুরু*, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ঢাকা।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৩), *দেশবিভাগ: পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা।

শামসুজ্জামান খান (২০১৮), *লেখক বঙ্গবন্ধু*, 'অন্য আলো', দৈনিক প্রথম আলো (১৬ মার্চ ২০১৮), ঢাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১৭), *কারাগারের রোজনামচা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১২), *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৬৪), *নেতাকে যেমন দেখিয়াছি*, *গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*, সৈয়দ তোশারফ আলী (সম্পা.) পু-মু ১৯৯৮, সিটি পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।

সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম (সম্পা.) (১৯৯৭), *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ তোশারফ আলী (১৯৯৮), *গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*, সিটি পাবলিশিং হাউজ, (সম্পা.) ঢাকা।

রুদ্রমঙ্গল
মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা ॥ ১৪২৭-১৪২৮ ॥ ২০২০-২০২১ ॥ ISSN 2415-4695
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

পিতার প্রতিশ্রুত ভূমি ও আমার সোনার বাংলা

সোয়াইব আহমেদ (সোয়াইব জিবরান)*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: মানব সম্প্রদায়ের প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বাধীন ভূখণ্ড লাভের বাসনা-আদিতম যৌথ অবচেতনার একটি স্বপ্ন। কেননা স্বাধীন একটি অঞ্চলের তৃণভূমির অধিকারই দিতে পারে জীবন যাপনের নিশ্চয়তা—খাদ্য থেকে বসবাসের, প্রজমান্তরের। মানুষের সে স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে আছে লোকগল্প, প্রাচীন মিথ আর পুরাণের ভেতর, ধর্মীয় বিশ্বাসের ভেতর। প্রতিটি শিশুর মনেও সে ভূখণ্ডটি অধিকারে রাখার বীজ রোপিত হয় শৈশবেই যা, প্রকৃতপক্ষে তার মাতৃভূমি; বংশের আদি পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া "প্রতিশ্রুত ভূমি"। যে "প্রতিশ্রুত ভূমি"র ধারণা ওল্ড টেস্টামেন্টের গলপেলেও লেখা হয়েছে হাজার হাজার বছর অগে।

বাঙালি জাতিরও রয়েছে একটি কল্পিত ভূমির স্বপ্ন যা তাদের ভাষায় "সোনার বাংলা"। সে স্বপ্নের সোনার বাংলা পাওয়ার স্বপ্ন তাদের বহু কালের। কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকায় সে বঙ্গভূমি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের সে স্বপ্নবুনন ও বাস্তবায়ন বার বার ব্যাহত হয়েছে। তারা শাসিত হয়েছে নানা জাতি-গোষ্ঠীর শাসকদের দ্বারা। প্রাচীন বঙ্গালদের সে ভূমি মধ্যযুগে মুসলিম শাসনে "সুবেহ্ বাঙ্গালা" নামে একত্রিত হলেও ইংরেজ শাসনামলে ভাগ হয়ে হয়েছে—পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্ব বঙ্গ ও আসাম। পবরর্তীতে ধর্মের ভিত্তিতে পূর্ব বঙ্গ পরিবর্তিত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে এবং তা পাকিস্তানি শাসনাধীনে চলে গিয়েছে। ১৯৫২ সালে পূর্বভাগের বাঙালিরা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন সর্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের দিকে অগ্রসর হয়। বহু রক্ত ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে সে কল্পিত সোনার বাংলার একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো পাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু তখনই যথারীতি এর বাইরে রয়ে যায় পশ্চিম বাংলা। পৃথিবীর আরও নানা প্রান্তে বাংলা ভাষাভাষীদের বাসস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে আরও আরও বাংলা। আর বাংলাদেশ নামক গড়ে ওঠা দেশটিও সম্মুখিন হতে থাকে নানা প্রতিকূলতার।

হাজার বছর পেরিয়ে আজও কি বাঙালিরা তাদের সে স্বপ্নের সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছে? ইতিহাস ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রবন্ধে সেসকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হবে।

* অধ্যাপক (বাংলা), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

ভূমিকা

মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। পৃথিবীতে আগমনের পর মানুষের প্রথম লড়াই-ই ছিল খাদ্য ও বাসস্থানের। সে বাসস্থান শুধুমাত্র গুহায় রাত্রিযাপনের জন্য নয়, বরং নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের অধিকার লাভের। কেননা সে অঞ্চলের তৃণভূমির অধিকারই দিতে পারে জীবন যাপনের নিশ্চয়তা—খাদ্য থেকে বসবাসের, প্রজমান্তরের। ভাষা আবিষ্কারের পর মুক্তির ধারণা যদিও আরও বৃদ্ধি লাভ করেছে—তথাপি স্বাধীন একটি ভূখণ্ড লাভের স্বপ্ন মানুষের আদি স্বপ্নগুলোর একটি। মানুষের সে স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে আছে প্রাচীন মিথ আর পুরাণের ভেতর, লোকগল্প আর ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে।

পৃথিবীর অন্যতম জাতমহাকাব্য মহাভারতের যুদ্ধ তো রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠারই লড়াই। ওল্ড টেস্টামেন্টে আমরা দেখতে পাই ইহুদি জাতির প্রভু তাদের একটি "পবিত্র ভূমি" প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন (পবিত্র বাইবেল ১৯৮৬: ১৫)। কেনান অঞ্চলের ধর্মবিশ্বাসসমূহের আদি পিতা আব্রাহামকে দেওয়া সে "প্রতিশ্রুত ভূমি" তারা সহজে পায়নি। এ জন্য তাদের হাজার হাজার বৎসর লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। নিজস্ব একটি ভূমির অধিকার অর্জন ও রক্ষার দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস পৃথিবীতে আরও অসংখ্য রয়েছে। নিকটতম সময়ে ভিয়েতনামের দীর্ঘদিনের যুদ্ধ উদাহরণ হয়ে আছে।

মানব সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব একটি স্বাধীন ভূমিখণ্ডের স্বপ্ন থাকে। সে স্বপ্ন তারা সর্বদা মনে লালন করে। কখনও সে স্বপ্নের ভূমির অধিকার লাভ না করতে পারলে বা সে ভূমি থেকে উৎখাত হলে অন্য ভূখণ্ডে গিয়েও সে স্বপ্নের ভূখণ্ডটি বুকে লালন করে। প্রতিটি মানবশিশুর মনে একটি মাতৃভূমি থাকে, যা তার কাছে তার বংশের আদি পিতারকাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ভূমির অধিকারবোধ—"প্রতিশ্রুত ভূমি"।

কিন্তু বাঙালি জাতির নিজস্ব স্বাধীন ভূখণ্ড লাভের ইতিহাস সবচেয়ে বিস্ময়কর। বাঙালি জাতি মাত্র নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধ করে তাদের স্বপ্নের একটি স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। কিন্তু এ অবিশ্বাস্য অর্জনের পেছনে একজন মানুষ বিনিয়োগ করেছিলেন তাঁর সমগ্রজীবন। তিনি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পেয়েছে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু সে রাষ্ট্রটিই কি সেই কল্পিত সোনার বাংলা? যে সোনার বাংলার স্বপ্ন তারা বহুকাল ধরে দেখে আসছে!

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট—গঙ্গাঋডি, বঙ, বঙ্গ, বাঙ্গাল

পৃথিবীতে মানব বসতিগুলো প্রধানত গড়ে উঠেছিল জলের ধারে—সমুদ্র বা নদীর তীরে। প্রাচীন ভারত যেমন গড়ে উঠেছিল সিন্ধু নদীর তীরে তেমনি বাংলা অঞ্চল গড়ে উঠেছিল গঙ্গাকে কেন্দ্র করে। গঙ্গা ছিল এ অঞ্চলের প্রধান নদী। যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বসতিকে প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে গঙ্গাঋডি বলে। গ্রিক পণ্ডিত টলেমি রচিত ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থে গঙ্গার মোহনায় গড়ে ওঠা বদ্বীপ রাজ্য গঙ্গারিডের কথা

উল্লেখ আছে। পর্যটক মেগাস্থিনিসের *ইন্ডিকা* গ্রন্থে সে রাষ্ট্রের গঠন বর্ণনা করা হয়েছে। অজ্ঞাতনামা এক গ্রিক নাবিকের ৮০ খ্রিস্টাব্দে রচিত "পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়া সি" গ্রন্থে সে রাজ্যে ক্যাল্টিস নামক স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকার কথা লিখেছেন। রোমান লেখক প্লিনি গঙ্গাঋডি রাজ্যের ভেতর দিয়ে গঙ্গার বয়ে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। অনুমান করা হয় এ গঙ্গাঋডি রাজ্যই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গ জনপদ। গঙ্গার প্রধান আরও দুটি ধারা পদ্মা মেঘনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বাংলার পূর্ব অঞ্চলের জনপদগুলো।

বঙ্গীয় বদ্বীপ অঞ্চলের গঠন প্রকৃতিকে লক্ষ করে অনেকে এখানকার বসতিকে অর্বাচীন মনে করে থাকেন। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক খননে চার হাজার বছরের পুরোনো তাম্র যুগের সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যে সময় দ্রাবিড়, অস্ট্রো-এশীয় ও তিব্বত-বর্মী নর সম্প্রদায়ের মানুষ সম্ভবত বসবাস করতো। অনুমান করা হয় বং বা বাংলা শব্দটিও এসেছে দ্রাবিড় ভাষী বং নামক জনগোষ্ঠী থেকে। ড. অতুল সুরের মতে বায়ংসী অর্থাৎ পাখি এ জনগোষ্ঠীর মিথপ্রতীক ছিল।

এ জনপদও জনপদের মানুষদের প্রাচীন ভারতীয় আর্য গ্রন্থগুলোতে খুব সম্মানজনকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। নদী কেন্দ্রিক এ জনপদগুলো গড়ে উঠেছিল নীচু ভূমির উপর। অধিকাংশ এলাকা ছিল জলাভূমি। মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল শিকার, প্রধানত মৎস্য শিকার। প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে তাদের "নিষাদ জাতি" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা বেটে, খাটো, ঠোঁট মোটা ও কিচির মিচির ভাষায় কথা বলে। "মনু সংহিতা"য় এ সকল দেশকে ম্লেচ্ছদেশ (গোপাল হালদার ১৩৮০: ৫) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি নীহাররঞ্জন রায়ও তাঁর বিখ্যাত বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব) গ্রন্থে লিখেছেন, "ভারততীর্থের অন্যতম প্রান্তিক দেশ বঙ্গভূমি" (গোপাল হালদার ১৩৮০: ৫)। ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলাম বাংলা অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্পর্কে "বাংলা পিডিয়া"য় পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন:

> বৈদিক স্তবগান-সূক্তিতে বাংলা অঞ্চলের কোনো উল্লেখ নেই। বৈদিকদের সর্বপূর্ব জায়গা বিহার। ঐতরীয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, পূর্ব আর্যবর্তের আরো পূর্বে থাকে দস্যুরা। দস্যুদের কথা অস্তিত্ব ঘোষণা দিয়ে ঐতরীয়তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুন্দ্র জাতি এবং তাদের রাজধানী 'পুন্ড্রনগর'-এর কথা। বর্তমান মহাস্থান গড়ই সেই দস্যুদের রাজধানী। ঐতরীয় ব্রাহ্মণে না থাকলেও সমকালীন ঐতরীয় আরণ্যক-এ বঙ্গ জাতির উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়। ঐতরীয় রায় দিয়েছে, দস্যুরা পথভ্রষ্ট পাপী কেননা তাঁরা কোনো সত্য গ্রন্থের অনুসারী নয়। (বাংলাপিডিয়া ২০১২: এশিয়াটিক সোসাইটি)

এই প্রান্তিক দেশেই গড়ে উঠেছিল বাঙালিদের পূর্ব পুরুষদের বসতি। আর্য শাস্ত্রমতে তারা ছিল ছিল ব্রাত্যজন, মন্ত্রহীন।

বাঙালি জাতির গঠন ইতিহাস

"বাঙালি এক সংকর জনগোষ্ঠী।" (নীহাররঞ্জন রায় ১৪১১: ২৪) নৃ-বিজ্ঞানের মতে "বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা সম্ভবত ছিলেন অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অস্ট্রো-এশিয়াটিক

জাতির মানুষ।" (নীহাররঞ্জন রায় ১৪১১: ২৩) এদেরকেই পৌরাণিক গ্রন্থগুলোতে "নিষাদ" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। "এ জনগোষ্ঠী ছাড়াও এখানে বসবাস করতেন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ। দ্রাবিড়ভাষী এ জনগোষ্ঠী আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার বৎসর পূর্বেও এ অঞ্চলে বসবাস করত।" (বাংলাপিডিয়া ২০১২: এশিয়াটিক সোসাইটি)

এ জনগোষ্ঠীই গড়ে তুলেছিলেন গঙ্গাঋডি জনপদ, যে জনপদের কথা গ্রিক লেখক মেগাস্থিনিস বা রোমান লেখক প্লিনি উল্লেখ করেছেন:

> অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও দ্রাবিড় ভাষীরা ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর বাঙলায় বহু পূর্বকাল থেকে নানা সময়ে এসেছিলেন মঙ্গোলীয় বা ভোট চীনা গোষ্ঠীর নানা জাতি-উপজাতি—যেমন গারো, বড়ো, কোচ মেছ, কাছারি, টিপরাই, চাকমা প্রভৃতি। সম্ভবত এঁদেরই বলা হত 'কিরাত জাতি'। এঁরা ভোট-চীনা গোষ্ঠীর নানা ভাষা-উপভাষা বলতেন। (বাংলাপিডিয়া ২০১২: এশিয়াটিক সোসাইটি)

এই সংকর জনগোষ্ঠীর মানুষদের সাথে যুক্ত হন আর্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা। বাঙালি জাতির পরিচয় দিতে গিয়ে "বাংলা পিডিয়া"য় সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন:

> বাঙালি জাতি পরিচয়ের ঐতিহাসিক যুগ শুরু হয় গুপ্তযুগ (৩২০ খ্রি.-৬৫০ খ্রি.) থেকে এবং এ যুগেই প্রথম ক্ষুদ্র রাজ্যপুঞ্জগুলিকে নিয়ে গঠিত হয় বিশাল রাজ্য। যেমন গুপ্তদের সাম্রাজ্যিক ছত্রছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষুদ্র রাজ্যের বদলে বৃহৎ রাজ্য যেমন পূর্ব ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের বঙ্গরাজ্য ও উত্তরাঞ্চলের গৌড় রাজ্য। বৃহৎ বঙ্গের প্রথম এবং ঐতিহাসিকভাবে সুনির্দিষ্ট এবং শক্তিশালী শাসক। শশাঙ্ক (খ্রিস্টপূর্ব আনু ৬০০ খ্রি.-৬২৫ খ্রি.) তাঁর দক্ষ শাসনের মাধ্যমে বাংলা ও বাঙালিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন থেকেই বাঙালি জাতিসত্ত্বার যাত্রা শুরু এবং পাল ও সেন আমলে এসে সে সত্ত্বা আরো বিকশিত হয়ে বাঙালি জাতির শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করে। সে ভিত্তির ওপরই স্থাপিত হয় বাংলার সুলতানি রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রের নাম দেয়া হয় বাঙ্গালাহ বা বাংলা এবং বাংলা রাষ্ট্রের অধিবাসীরা পরিচিত হয় বাঙালিয়া বা বাঙালি নামে (মনুসংহিতা [সম্পা.] মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪১২: ২৫)।

স্বাধীন বাংলার শেষ নবাব ছিলেন সিরাজুদ্দৌলা। ১৭৫৭ সালে তাঁর পতনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে মূলত সূচনা হয় ইংরেজ শাসনের। বাংলা অঞ্চলের নাম দেওয়া হয় বেঙ্গল।

ঐতিহাসিক এ প্রেক্ষাপট থেকে দেখা যাচ্ছে এ অঞ্চলের মানুষ ও জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় কখনও ধর্মীয় ভেদ বিচারে, কখনও বৃত্তির ভিত্তিতে, কখনও ভূমির বিচারে আবার কখনও ভাষার বিচারে নির্ধারিত হয়েছে। "মনুসংহিতা" কিংবা "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" এ অঞ্চলের মানুষকে যে ম্লেচ্ছ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল তা ছিল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। আবার নিষাদ বা শিকারী জাতি হিসেবে চিহ্নিত করার কারণ ছিল এ অঞ্চলের মানুষের বৃত্তি। সুলতানী আমলে এসে এ অঞ্চলকে সুবেহ বাংলা নাম করার ভিত্তি ছিল ভাষা ও অঞ্চল। ইংরেজ শাসনামলে বেঙ্গল নামকরণের ভিত্তি যে ভাষা ছিল তা বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং এ জাতির জাতিগত পরিচয় ভাষা নাকি অন্য কিছু হবে তা সমসময়ই একটি পরিবর্তনশীল বিষয় ছিল। বর্তমানে বাঙালি জাতি বলতে প্রধানত ভাষাভিত্তিক

জাতিসত্তাকে বোঝানো হয়। ভাষাভিত্তিক এই জাতিগঠনের আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে বাংলা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে অল্পকিছু পরিচয় প্রদান করা যেতে পারে।

"বাংলা ভাষার এ পর্যন্ত প্রাচীনতম নিদর্শন হল চর্যাপদ। বাংলা ভাষার আদি রূপ হিসেবে চর্যাগীতিকার ভাষাকে গ্রহণ করা হয়েছে।" (চর্যাগীতিকা, [সম্পা.] সৈয়দ আলী হাসান ১৯৮৪: ২৫)

> চর্যাপদের ভাষা মিশ্রভাষা। বাংলা ভাষা গঠন পর্যায়ের। চর্যাপদের রচনাকাল আনুমানিক খৃস্টীয় ৮০০-১২০০ সালের মধ্যে। ভাষাবিদদের মতে বাংলা ভাষাও ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে এ সময়ের মধ্যে নির্মিত হয়েছে। অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় ইন্দো-আর্য ভাষাসমূহের মতো বাংলাও সংস্কৃত ও মগধী প্রাকৃত থেকে ১০০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দে বিকশিত হয়। (বাংলাপিডিয়া ২০১২: এশিয়াটিক সোসাইটি)

বাংলা পিডিয়ায় পবিত্র সরকার ও মহাম্মদ দানীউল হক লিখেছেন:

> মাগধি প্রাকৃতের (খ্রি.পূ ৬০০-খ্রি ৬০০) পরবর্তী স্তর মাগধি অপভ্রংশ এবং তৎপরবর্তী স্তর অবহট্‌ঠের মধ্য দিয়ে ৯০০-১০০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্বাধীন নব্যভারতীয় আর্যভাষারূপে বাংলার উদ্ভব হয়। (বাংলাপিডিয়া ২০১২: এশিয়াটিক সোসাইটি)

বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ

বাঙালি জাতিসত্তা মূলত গড়ে উঠেছে ভাষাকে কেন্দ্র করে। ভাষাভিত্তিক এ জাতীয়তাবাদের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। কিন্তু "নিঃসন্দেহে, বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রথম সুসংহত স্ফুরণ।" (বাংলাপিডিয়া ২০১২: এশিয়াটিক সোসাইটি) এই স্ফুরণের রয়েছে সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপট।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের ধারণা বিকশিত হয় মূলত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনসূত্রে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ তার একটি বড় মাইলফলক। ১৭৬৫ সালে বাংলার দিওয়ানী লাভের পর বৃটিশরা এ অঞ্চলে শাসনক্ষমতা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। বাংলা অঞ্চলে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম দিকের একটি বড় বিদ্রোহ হল ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে সংঘটিত ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। খাজনা নিয়ে সংগঠিত এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন জমি থেকে উৎখাত হওয়া কৃষকরাও। ফলে এ আন্দোলন একটি গণবিদ্রোহের রূপ পেয়েছিল। বৃটিশ সরকার এ আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করে। কিন্তু প্রায় একই সময় ভারতে গড়ে ওঠে ধর্মভিত্তিক ওয়াহাবী আন্দোলন। এ আন্দোলন জোরদার হলে ইংরেজরা এটিকে একদম সাম্প্রদায়িক রূপ দেয় এবং মুসলিম শিখদের মধ্যে বিরোধ তৈরি করে। এতে করে এ আন্দোলন এক সময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ওয়াহাবী আন্দোলনের পর পরই ১৮৩০-৩২ সালে শুরু হয় বায়তদের অধিকার আন্দালন। এরপর দক্ষিণ মধ্য বঙ্গে শুরু হয় ফরায়েজি আন্দোলন। এ আন্দোলনও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। এ অবস্থার ভেতর ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে নতুন সংকটের সৃষ্টি হয়। উল্লিখিত প্রতিটি

আন্দোলনের সাথে ধর্মীয় সংশ্লেষ থাকলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে আন্দোলন হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়। কেননা বাংলার অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু আর রায়তরা ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের। বৃটিশ সরকার অন্যায়ভাবে কর আদায় ও জোর প্রয়োগের ক্ষমতা জমিদার শ্রেণিকে দিয়েছিল। ফলে গরীব মুসলিম প্রজাদের সাথে হিন্দু জমিদারদের বিরোধ তৈরি হতে থাকে। ফলে এ সময়ে সংগঠিত আন্দোলনগুলোর যেমন ধর্মীয় সংশ্লেষ ছিল তেমনি এর সাম্প্রদায়িক অভিমুখ বাস্তব কারণেও সৃষ্টি হয়েছিল।

সন্দেহ নেই বাংলা অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম হয় মূলত উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে। ইউরোপীয় বিদ্যার সাথে সংযুক্ত হয়ে বাঙালি জাতি অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে। সব কিছুকে প্রশ্ন করতে, নতুন করে ভাবতে শেখে। শুরু হয় নানা সংস্কার আন্দোলন। শিক্ষা, সমাজব্যবস্থায় তৈরি হয় নানা আলোড়ন। সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, সভা সমাবেশ তর্ক বিতর্কেরও জন্ম হয়। এ অবস্থায় জাতীয়তাবাদী চেতনারও উন্মেষ ঘটে। এই নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। আর সর্বতোভাবে ছিল ঠাকুর পরিবার। এ নবজাগরণের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন 'আনন্দমঠ' উপন্যাস। যে উপন্যাসে উচ্চারিত হয় দেশাত্ববোধক বন্দে মাতরম্ স্লোগান। বলা বাহুল্য, এ দেশাত্ববোধের সাম্প্রদায়িক একটি সংশ্লেষও ছিল।

ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে। বঙ্গবঙ্গ প্রস্তাবে বাংলায় প্রবল প্রতিবাদের সূচনা হয়। বাংলা ভাষাভিত্তিক এক বাংলার আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। কলিকাতার পথে পথে রাখিবন্ধন করেন। এই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন তার সেই বিখ্যাত গান আমার 'সোনার বাংলা।' ১৯০৫ সালের ২৫ আগস্ট কলিকাতার টাউন হলে গানটি গাওয়া হয়। সে বৎসরই ৭ সেপ্টেম্বর "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরসহ গানটি মুদ্রিত হয়। একই সাথে গানটি বিখ্যাত "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। এই গানটিতেই প্রথম আমরা একটি শ্যামল-সবুজ সোনার বাংলার ধারণা পাই। যে গানটি সে সময়ের বাঙালি জাতির অঘোষিত জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল। প্রবল প্রতিবাদের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করা হয়। কিন্তু বাঙালি ভাষাভিত্তিক অখণ্ড সোনার বাংলা সে সময়ও লাভ করতে পারেনি। ভাষাভিত্তিক সে রাষ্ট্রটি বহুপরে প্রতিষ্ঠিত হয় খণ্ডিতভাবে। কিন্তু সোনার বাংলার স্বপ্নখচিত এ গানটি পরে সত্যিকার অর্থেই সে দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়!

ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির রাষ্ট্রগঠন

১৯৪৭ সালে ভাষা নয়, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলা ভাগ হয়েছিল। গঠিত হয়েছিল দুটি রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। পূর্ব বাংলা সংযুক্ত হয়েছিল পাকিস্তান নামক এক কিম্ভুত রাষ্ট্রের সাথে। আর বাংলাভাষি পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামসহ বিপুল সংখ্যক মানুষেরা রয়ে গিয়েছিলেন ভারতের সাথে। রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড সোনার বাংলা এভাবেই খণ্ডিত

হয়েছিল। এর ভেতর দিয়ে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা এমন এক অদ্ভুত রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়েছিল যে রাষ্ট্রের দু'খণ্ডের ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল হাজার মাইলের বেশি। একমাত্র ধর্মীয় মিল ছাড়া এ রাষ্ট্রের দুখণ্ডের মানুষের মধ্যে আর কোনো মিল ছিল না। ফলে রাষ্ট্রটি গঠনের কিছুদিনের মধ্যেই ভাষার প্রশ্নেই বিরোধ দেখা দেয়। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী প্রস্তাব করে উর্দুই হবে সে রাষ্ট্রের একমাত্র ভাষা। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার অল্পকাল পরেই:

> পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ফোরামে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের উদ্যোগে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টা চলে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসভার আয়োজন করে। সভার পরও মিছিল-প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। এ মাসেরই শেষদিকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। (ভাষা-আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি [সম্পা.] আতিউর রহমান ২০০০: ২২)

অচিরেই এ আন্দোলন দানা বাধতে থাকে। শুরুতে আন্দোলনের সাথে তমদ্দুন মজলিশ থাকলেও দ্রুতই এর সাথে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহ সম্পৃক্ত হতে থাকে। ফলে এটি একটি গণআন্দোলনের রূপ পেতে থাকে। বিশেষত ছাত্ররা এর নেতৃত্বে এগিয়ে আসে। ছাত্রদের মধ্যে এ সময়ের ছাত্রনেতাদের একজনের নাম আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি কাড়ে—তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মযহারুল ইসলামকে উদ্ধৃত করে ড. সুনীলকান্তি দে *গোয়েন্দা নজরে শেখ মুজিবুর দৈনন্দিন জীবন* গ্রন্থে লিখেছেন:

> ১১ মার্চ ১৯৪৮, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের দাবীতে মিছিলের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সচিবালয়ের সামনে থেকে কয়েকজন সঙ্গীসহ তিনি গ্রেফতার হন। ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে ১৫ মার্চ তিনি মুক্তিলাভ করেন। (দে ২০০৯: ৯)

ভাষা আন্দোলনের তুঙ্গ মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরে বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন:

> আমাদের এক জায়গায় রাখা হয়েছিল জেলের ভিতর। যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিল, তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। তিনতলা দালান। দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচদিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হত না। 'রাষ্টভাষা বাংলা চাই', 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই,' পুলিশি জুলুম চলবে না'— নানা ধরনের স্লোগান। এই সময় শাসমুল হক সাহেবকে বললাম, 'হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।' (শেখ মুজিবুর রহমান ২০১২: ৯৩-৯৫)

বঙ্গবন্ধুর প্রত্যয় সত্য ছিল। বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসকরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। বিনিময়ে দিতে হয়েছিল সালাম বরকত রফিক জব্বারসহ অনেকের প্রাণ। ধর্মের ভিত্তিতে যে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল এই ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়েই তা থেকে বাঙালি মুখ ফিরিয়ে নেয়।

পরবর্তী ১৯ বৎসর বাঙালিরা মূলত ভাষাভিত্তিক একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের দিকে অগ্রসর হয়। মূলত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই সে অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দেন। ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ নামক সে স্বাধীন রাষ্ট্রটি গঠিত হয় এবং অসাম্প্রদায়িকতা রাষ্ট্রের একটি মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়। বলাবাহুল্য সে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাংলা ভাষী, বাঙালি ছাড়াও বসবাসরত সকল ভাষা ও জাতির অধিকারও স্বীকৃত হয়।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের মাত্র তিন বৎসরের মাথায় বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। পরবর্তী প্রায় দুই দশক বাংলাদেশ মূলত পাকিস্তানী চেতনার দিকে পশ্চাৎ গমন করে। বাঙালি জাতিসত্তা ও বাংলাদেশ ভাষা নাকি ধর্মীয় পরিচয়ে পরিচিত হবে সে দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়। দেশের স্থপতি ও জাতির জনকের আদর্শের রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ আবারও ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। কিন্তু বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয়ের পুরোনো দ্বন্দ্ব আবার ফিরে আসে। বাঙালিদের বাংলদেশ নামক ভূখণ্ডের মানুষ এই সময়ে স্পষ্টতই দুইভাগে বিভক্ত। একপক্ষ নিজেদের ভাষা ও স্থানীয় সংস্কৃতিগত বাঙালি সত্তার পরিচয়ে পরিচিত হতে আর অন্যপক্ষ ধর্মীয় পরিচয়ে পরিচিত হতে মরিয়া। এই দুই পক্ষের মধ্যে চলছে সাংস্কৃতিক লড়াই। আছে বাঙালি ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বিতর্ক। এমনকি একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে কেন্দ্র করে শাহবাগ চত্বরে গড়ে ওঠা গণজাগরণের প্রতিপক্ষে গড়ে ওঠে শাপলাচত্বর পক্ষ। সে পক্ষ পরবর্তীতে বাঙালি জাতিসত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয়, সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বাধা প্রদান করতে থাকে। এ তালিকায় পয়লা বৈশাখ পালন করা থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণে বাধা প্রদান কর্মসূচি রয়েছে। বাংলাদেশে মূলত বর্তমানে এই দুই প্রবল প্রতিপক্ষ পরস্পর বিবদমান।

তাহলে বাঙালিদের কল্পিত সে বাংলা ভাষা ও বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্যস্নাত সোনার বাংলা কি এখনও একটি অমীমাংসিত বিষয়—সে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আর স্বাধীন বাংলাদেশের বাইরে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র বিপুল সংখ্যক বাঙালি যারা প্রত্যেকেই নিজস্ব একটি সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেন। নিজেদের বসবাস করা এলাকার নামকরণ করেন দ্বিতীয় বাংলা, তৃতীয় বাংলা! সে সোনার বাংলা তবে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। সে বাংলাগুলোর ভবিষ্যৎ কী? পশ্চিমবঙ্গ ইতোমধ্যে হিন্দি আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি পরিবারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম আর বাংলা ভাষার চর্চা করছেন না। তাহলে কি বাংলা ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় শুধু একটি ভূখণ্ডেই টিকে থাকবে?

ভাষা শুধুমাত্র একটি যোগাযোগ মাধ্যম নয়। এর আছে নানা মাত্রা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিচয়। সে পরিচয়গুলো শক্তিশালী হয়ে উঠলে ভাষার পরিচয়ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

উপসংহার

প্রাচীন যুগের চর্যাপদের কবি বাঙালি হয়ে যাওয়া নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। মধ্যযুগের কবি তাঁর সন্তান যেন দুধেভাতে থাকে সে বর দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এক সোনার বাংলার ছবি এঁকেছিলেন যার বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভারতচন্দ্রের দুধে ভাতের প্রার্থনার রাষ্ট্র, রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা এশিয়া মহাদেশের উদীয়মান বাঘ (Emerging Tiger) উপমায় উপমিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। এ উন্নয়নই স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বাস্তবের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে পারে।

তথ্যসূত্র

আব্রাহামের বিবরণ (১৯৮৬), আদিপুস্তক, *পবিত্র বাইবেল*, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা।

গোপাল হালদার (১৩৮০), *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম খণ্ড)*, কলিকাতা।

নীহাররঞ্জন রায় (১৪১১), *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*, কলিকাতা।

পবিত্র সরকার, মহাম্মদ দানীউল হক (২০১২), 'বাংলা ভাষা', *বাংলাপিডিয়া*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

বশির আল হেলাল (২০১২), ভাষা আন্দোলন, *বাংলাপিডিয়া*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪১২), (সম্পা.) *মনুসংহিতা*, কলিকাতা।

রেহমান সোবহান (২০০০), *ভাষা আন্দোলনের আর্থসামাজিক পটভূমি*, (আতিউর রহমান সম্পাদিত), ঢাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১২), *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম (২০১২), বাঙালি জাতি, *বাংলাপিডিয়া*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৮৪), ভূমিকা, চর্যাগীতিকা, ঢাকা।

ড. সুনীল কান্তি দে (২০০৯), *বায়ান্নে গোয়েন্দা নজরে শেখ মুজিবের দৈনন্দিন জীবন*, ঢাকা।

রুদ্র-মঙ্গল: গবেষণা-প্রবন্ধ পাঠানোর নিয়মাবলি

১. প্রবন্ধ ৩,৫০০ থেকে ৭,০০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে। প্রবন্ধের শুরুতে গবেষণার লক্ষ্য, জিজ্ঞাসা ও প্রাপ্তি সম্পর্কিত অনধিক ১৫০ শব্দের সারসংক্ষেপ (abstract)। যুক্ত করতে হবে।

২. বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি অনুসরণ করতে হবে। তবে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।

৩. উদ্ধৃতি ২৫ শব্দের বেশি হলে আলাদা অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙক্তিবিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৪. কবিতা-ছোটগল্প-উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি সৃষ্টিশীল রচনার উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতির পাশে তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হবে। তথ্যসূত্র উল্লেখের কৌশল: (শামসুর রাহমান দুঃসময়ের মুখোমুখি', ২০০৬: ৫০)।

৫. সাধারণ উদ্ধৃতি ও প্যারাফ্রেজিং-এর ক্ষেত্রে একইভাবে উদ্ধৃতি বা গৃহীত বক্তব্যের পাশে তথ্যসূত্র নির্দেশ করার কৌশল: (বুদ্ধদেব বসু ১৯৮১ : ১১৬)

৬. প্রবন্ধের শেষে রচনাপঞ্জি সংযোজিত হবে। বাংলা তালিকার পর ইংরেজি তালিকা উপস্থাপন করতে হবে। লেখকের নামের বর্ণানুক্রমে রচনাপঞ্জি লিখতে হবে। বিদেশি নামের শেষ নাম আগে বসবে, পরে বসবে প্রথম নাম। প্রবন্ধ-নিবন্ধরচনার নাম উদ্ধৃতি চিহ্ন (' ') দ্বারা আবদ্ধ করতে হবে। বই, পত্রপত্রিকা, সাময়িকীর নাম বাঁকা অক্ষরে (*Italic*) লিখতে হবে। পত্র-পত্রিকার কিংবা সাময়িকীর বর্ষ, সংখ্যা, মাস, তারিখ, সম্পাদকের নাম উল্লেখ করতে হবে। যেমন :

- কাজী নজরুল ইসলাম (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ২০০৭), *নজরুল রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- মোহীত উল আলম (১৪২১), *'কবি নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা'*, *গাহি সাম্যের গান*, (সম্পাদক: মো. মাহবুব হোসেন), নজরুল জয়ন্তী সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৪২১, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
- রফিকুল ইসলাম (২০০২), *কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সৃজন*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১১), *'উন্মুক্ত পথের যাত্রী'*, *কালের খেয়া সমকালের শুক্রবারের সাময়িকী*, (সম্পাদক: গোলাম সারওয়ার), ২০ মে, ঢাকা।

৭. কম্পিউটার কম্পোজকৃত দুই কপি পাণ্ডুলিপি ১টি সিডিসহ জমা দিতে হবে। A4 সাইজ কাগজে SutonnyMJ ফন্টের ১৪ points-এ প্রবন্ধের অক্ষর বিন্যাস হবে। প্রবন্ধের Line Space এবং Para Space হবে যথাক্রমে 1.5 ও Auto। লেখা E-mail-ও পাঠানো যাবে।

E-mail ঠিকানা: humprince@yahoo.com, হার্ডকপি পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, রুদ্র-মঙ্গল এবং বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪।

৮. গবেষককে তার নাম, পদবি ও প্রতিষ্ঠান পৃথক কাগজে সংযুক্ত করতে হবে।

৯. রুদ্র-মঙ্গল গবেষণা-পত্রিকার জন্য উচ্চতর শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষণা কর্মকর্তা, পিএইচ.ডি. কিংবা এম.ফিল পর্যায়ের গবেষকদের লেখা গ্রহণযোগ্য হবে। মাস্টার্স কিংবা অনার্স পর্যায়ে সম্পন্ন গবেষণাপত্রের আলোকে লিখিত লেখা বিবেচনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজ প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা পত্র সংযুক্ত করতে হবে।

১০. রুদ্র-মঙ্গল গবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-বিষয়ক সকল দায়-দায়িত্ব গবেষক বহন করবেন।

১১. অসম্পূর্ণ, অপরিচ্ছন্ন ও অধিক সংশোধনযোগ্য লেখা বাতিল হবে।